মাসুদ রানা

মরণ কামড়

দুইখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন



মাসুদ রানা

মরণকামড়

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

মরণকামড়-১

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৮৬

এক

বহু রঙা নিওন সাইনের আলোয় ঝলমল করছে ম্যাডিসন এভিনিউ। যানবাহনের বিরতিহীন প্রবাহ থেকে আলাদা হয়ে বেরিয়ে এল ইস্পাত-নীল একটা রোলস রয়েস—মৃদু দোল খেয়ে, প্রায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে পড়ল আশিতলা বিল্ডিংটার সামনে।

আরও একটা গাড়ি থামল, দেড়শো গজ পিছনে। এটা একটা পুরানো বুইক। চুল-দাড়ি-গোঁফে মুখ ঢাকা শিখ ড্রাইভার একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রোলস রয়েসের দিকে।

রোলস রয়েস থেকে বেরিয়ে প্যাসেঞ্জার সীটের দরজা খুলে দিল শোফার, তার বাম বগলের নিচটা একটু ফুলে আছে। দু'জন লোক নামল। একজনের বয়স হবে পঞ্চান্ন, ঘাড়ে-গর্দানে সমান, সারা শরীরে চর্বি থলথল করছে। টেনেটুনে ফিট পাঁচেক লম্বা হবে সে। অপরজন প্রায় ছ'ফিট লম্বা, সরু মুখ, ভুঁড়িটা ছোট, কিন্তু বেঢপ। তার বয়স হবে ষাটের মত, হাতে একটা চকচকে কালো ব্রীফকেস। দু'জনের পরনেই হালকা নীল স্যুট, সাদা টাই, মাথায় কালো হ্যাট।

প্রশস্ত হলঘরে ঢুকে এলিভেটরের সামনে থামল ওরা। পাশেই একটা বোর্ড, তাতে সাদা প্লাস্টিক হরফে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম লেখা। একটা নামের ওপর চোখ আটকে গেল—রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি : নিউ ইয়র্ক ব্রাঞ্চ, নিউ ইয়র্ক। ফোর্থ ফ্লোর।

এলিভেটরে চড়ে পাঁচতলায় উঠল ওরা, রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি লেখা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল। দরজা খোলা, কিন্তু আউটার অফিসে কাউকে দেখা গেল না। অনেক অনুরোধ-উপরোধ করে জি.এম.-এর সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে ওরা, জি.এম. ওদেরকে টেলিফোনেই জানিয়ে দিয়েছেন, অফিসে তিনি একা থাকবেন। জি.এম. কোন নামের সংক্ষেপ, না কি অক্ষর দুটো দিয়ে জেনারেল ম্যানেজার বোঝায়, এখনও জানা হয়নি ওদের।

আউটার অফিসে ঢুকে ওদের একজন গলা খাঁকারি দিল। ভেতরের চেম্বার থেকে তীক্ষ্ণ একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'কাম ইন!'

চেম্বারে ঢুকল ওরা। ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিশাল রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রয়েছেন ছোটখাট, অস্বাভাবিক রোগা এক ভদ্রলোক। বড়সড় চেয়ার, মাত্র সিকিভাগ দখল করে আছেন তিনি। ডেস্কের আড়ালে বলে দেখা যাচ্ছে না, তবে বোঝা যায় ভদ্রলোকের পা ঝুলে আছে শূন্যে, কার্পেট ছোঁয়নি। তাঁর নাকটা টিকালো, ছোট্ট গোল মুখ, চোখ দুটো ভাসা ভাসা, দৃষ্টিতে অদ্ভুত সারল্য। খয়েরি একটা স্যুট পরনে, লাল টাই। ডেস্কের ওপর সোনালি হাতল

লাগানো একটা ছড়ি, আর একটা হ্যাট।

প্রথমজন, ঘাড়ে-গর্দানে সমান, নিজেদের পরিচয় দিল, 'আমি হুবার্ট, মাইকেল হুবার্ট—নিউ ইয়র্ক জুয়েলারী মালিক সমিতির প্রেসিডেন্ট। আর ইনি,' পাশের লম্বা জনকে দেখাল, 'মি. ডেরিক ওয়াটকিনসন—সমিতির জেনারেল সেক্রেটারি। মি.…?'

'জি.এম., তোমাদের ফেইথফুল খাদেম। ডেঁড়িয়ে কেন, মশিয়েগণ,' জি.এম. অর্থাৎ গিলটি মিয়া হাত নাড়ল, 'একটা করে সীট লিয়ে ডাউন হয়ে যাও।'

পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসল ওরা। ব্রীফকেসটা চেয়ার দুটোর মাঝখানে থাকল।

'টি?'

ওরা দু'জনেই মাথা নাড়ল।

ডান হাত মুঠো করে মুখের সামনে ধরে কিছু পান করার ভঙ্গি করল গিলটি মিয়া, তারপর চোখ ঢুলু ঢুলু করে মাতালের মত মাথা দোলাল বার কয়েক, যেন মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গেছে। চেহারা স্বাভাবিক করে নিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল ওদের দিকে।

দু'জনেই একযোগে বলে উঠল, 'নো, থ্যাঙ্কস।'

একটা সময় ছিল, ভাষা নিয়ে ভীষণ ভুগতে হয়েছে গিলটি মিয়াকে। বিদেশী কোন ভাষা সে জানত না, এমনকি শুদ্ধ বাংলাও বলতে পারত না। কিন্তু ঠেকায় পড়ে, এবং নিজ গুণে এই সমস্যার সহজ একটা সমাধান বের করে নিয়েছে সে। আজও সে ভাল বাংলা বলতে পারে না। বিদেশী কোন ভাষাতেও তার দখল নেই। অথচ পৃথিবীর যে-কোন লোকের সাথে, তার ভাষা যাই হোক না কেন, মনের ভাব আদান প্রদানে ওর কোন অসুবিধে হয় না। দুনিয়ার বহু দেশে গেছে গিলটি মিয়া, কমবেশি কিছু দিন করে থেকেছে। সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষা থেকে কিছু প্রচলিত শব্দ মুখস্থ করে নিয়েছে সে। এভাবে বাংলা, উর্দু, হিন্দী, আরবী, ফার্সি, ইংরেজী, জার্মান, রুশ, স্প্যানিশ এবং ফ্রেঞ্চ সহ আরও কিছু ভাষার সংমিশ্রণে অদ্ভুত জগাখিচুড়ি নিজস্ব একটা ভাষা তৈরি করে নিয়েছে সে। তার এই নিজস্ব ভাষায় কথা বলার সময় শুধু যে ঠোঁট জোড়া নড়ে তাই নয়, সেই সাথে কথা বলে চোখ, ভাব প্রকাশ করে হাত, নড়ে বা দুলে উঠে অনেক কিছু খোলসা করে দেয় মাথা, মুখভঙ্গি থেকে অনেক দুর্বোধ্য বক্তব্য পানির মত পরিষ্কার হয়ে যায়। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, তার এই ভাষা লোকে কিভাবে যেন বুঝেও নেয়। গিলটি মিয়া এই ভাষার নামকরণও করেছে—ইন্টারন্যাশনাল জবান। শুধু বিদেশীদের সাথে এই ভাষায় কথা বলে সে। বাংলাদেশীরা তার মুখের বাংলা তবু হয়তো বুঝে নেবে, কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল জবান কিছুই বুঝবে না। তাই আমরা বাংলায় অনুবাদ করে দিচ্ছি।

'অল্প কতায় বলো, সমস্যাটা কি?' জিজ্ঞেস করল গিলটি মিয়া।

সমিতির প্রেসিডেন্ট কোলের ওপর রেখে ব্রীফকেসটা খুলল। ভেতর থেকে একটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে ডেস্কের ওপর, গিলটি মিয়ার সামনে রাখল সে। 'এ-

ধরনের কিছু ইদানীং আপনার চোখে পড়েছে কি?'

'লে হালুয়া!' বলে স্বর্ণমুদ্রাটা হাতে নিল গিলটি মিয়া। 'এ যে দেকচি সোনার মোহর!'

এরপর একের পর এক অনেকগুলো স্বর্ণমুদ্রা বের হলো ব্রীফকেস থেকে। ডেস্কের ওপর একটা করে রাখল মাইকেল হুবার্ট, আর সেই সাথে মুদ্রার পরিচয় জানিয়ে দিল, 'ডাবল অ্যাকসেলেন্ট, স্প্যানিশ, ফার্দিনান্দ অ্যান্ড ইসাবেলা, পনেরোশো দশ খ্রিস্টাব্দ; একু অ সোলেল, ফরাসী, নবম চার্লস, পনেরোশো চুয়াত্তর; ডাবল একু দ'ওর, ফরাসী, চতুর্থ হেনরি, ষোলোশো; রাইডার, ডাচ, চার্লস দ' এগমন্ড, পনেরোশো আটত্রিশ; কোয়াড্রুপল, জেনোয়া, ষোলোশো সতেরো; ডাবল লুইস, অ লা মেশে কুঁর্তে, ফরাসী চতুর্দশ লুই, ষোলোশো চুয়াল্লিশ; তারপর আরও আছে...'

চোখ বুজে রয়েছে গিলটি মিয়া, ধ্যানমগ্ন। ট্রাফিক পুলিসের মত হাত তুলে মাইকেল হুবার্টকে থামিয়ে দিল সে। 'অনেক? লাক লাক?' চোখ মেলল সে, চকচক করছে তারা দুটো।

'বোধহয় লাখ লাখই হবে...।'

'কোতায়?' শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল গিলটি মিয়ার।

'বলুন কোথায় নয়!' বিষণ্ন, হতাশ, এবং উদ্বিগ্ন দেখাল মাইকেল হুবার্টকে। 'হোটেল, রেস্তোরাঁ, ক্যাসিনো, ব্যাংক, সেকরার দোকান—বিশেষ করে সেকরার দোকানগুলোয় পাওয়া যাচ্ছে এগুলো।'

'আসচে কোতা থেকে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল গিলটি মিয়া।

'সেটা জানলে তো কোন সমস্যাই ছিল না, এফ.বি.আই.-ই কেসের মীমাংসা করে ফেলত।'

'ও, বুজেচি, এব.বি.আই. ফেল মেরেচে দেকে একানে এয়েচো। তা তোমাদের মুসিবতটা কি বলো শুনি।'

এরপর কথা বলল সমিতির জেনারেল সেক্রেটারি, ডেরিক ওয়াটকিনসন, 'মুদ্রাগুলো প্রায় প্রত্যেকটা এক ভরি ওজনের। এগুলোর অ্যান্টিক মূল্য অনেক বেশি হলেও, সোনার বাজার দরের চেয়ে অনেক কম দামে লোকের হাতে আসছে, ফলে অর্থনীতিতে অদ্ভুত একটা অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে। একই বাজারে সোনার দুই দাম চলতে পারে না, অথচ তাই চলছে। এরকম আরও কিছুদিন চললে গোটা দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়বে। এখনই ব্যবসা-বাণিজ্যের বারোটা...'

'হুঁ।'

'এরকম হাজার হাজার মুদ্রা ছাড়া হয়েছে বাজারে, ফলে আমরা যারা সোনার ব্যবসায়ী তারাই সবচেয়ে বেশি মার খাচ্ছি। বেচাকেনা কমতে কমতে প্রায় বন্ধ হবার দশা।'

আবার ধ্যানমগ্ন হলো গিলটি মিয়া, তারপর জানতে চাইল, 'এব.বি.আই. এগুলো নিষিদ্ধ ঘোষণা করচে না কেন?'

'তা করলে যে লোকটা ওগুলো বাজারে ছাড়ছে...'

'বুজেচি, আর বলতে হবে না। সে ব্যাটা তকন মোহরগুলো গলিয়ে ফেলে বার তোয়ের করবে, যাতে আলাদাভাবে কেউ চিনতে না পারে।' চোখ মেলে মুদ্রাগুলো আরেকবার দেখল গিলটি মিয়া। 'একটা জিনিস দেকেচেন?'

'কি?'

'মোহরগুলো সবই ষোলোশো পঞ্চাশের আগে তোয়ের করা হয়েচে। বোজাই যাচ্চে, লুঠের মাল। আগেকার দিনের কোন ডাকাতের গুপ্তধন, তাতে কোন শালার হাত পড়েচে।'

মি. হুবার্ট এবং ওয়াটকিনসন দৃষ্টি বিনিময় করল। জি.এম.-এর মন্তব্য শুনে তার ওপর ওদের আস্থা এসে গেছে। মি. হুবার্ট বলল, 'মি. জি.এম., আপনি আমাদের বাঁচান। আপনাদের অনেক প্রশংসা শুনে এসেছি আমরা। আপনি যদি···।'

ভুরু কুঁচকে গিলটি মিয়া বলল, 'কেসটা খুব জটিল।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'জান কেরোসিন করে দেবে। ঠিক আচে, এত করে যকন বলচেন, লেবো আপনাদের কেস। আচ্চা, এব.বি.আই. কিচুই কি জানতে পারেনি? কিংবা বলতে পারেন, এগুনো শহরের কোতায় কোতায় সবচেয়ে বেশি বেচাকেনা চলচে?'

'ওয়েস্ট এন্ডে,' সাথে সাথে জবাব দিল মি. হুবার্ট। 'মানে, হারলেমে। যত গুণ্ডা-বদমাশ, চোর-বাটপারদের আড্ডা ওখানে। এফ.বি.আই., শুনতে পাই, বেশ কিছু তথ্য জানতে পেরেছে। কিন্তু আমাদের তারা কিছুই বলতে চায় না। আবার এ-ও কানে আসে, এ-সবের পিছনে ভয়ঙ্কর এক লোক রয়েছে, তার বিরুদ্ধে কিছু করার নাকি সাহসই পাচ্ছে না ওরা।' পকেট থেকে চেক বই বের করল সে। 'আপনাদের ফি···।'

'পরে,' ধ্যানমগ্ন গিলটি মিয়া বলল। 'একটা সোনার চাক্কি রেকে সিদে বাড়ি চলে যান।'

'তা কবে থেকে কাজে হাত দেবেন, মি. জি.এম.?' জানতে চাইল মি. হুবার্ট।

'দিয়েচি।' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল গিলটি মিয়া। 'সাত দিন পর টেলিফোনে খবর লেবেন।'

'জী?'

তর্জনী দিয়ে নিজের মাথায় একটা টোকা দিল গিলটি মিয়া। 'একানে কাজ শুরু হয়ে গেচে,' বলে আবার চোখ বুজল সে।

মিনিটখানেক চুপচাপ বসে থাকার পর দৃষ্টি বিনিময় করল ওরা। একটা বাদে বাকি স্বর্ণমুদ্রাগুলো ব্রীফকেসে ভরে নিয়ে মি. হুবার্ট নিচু গলায় বলল, 'ভদ্রলোককে ডিসটার্ব করা উচিত হবে না। চলুন, আমরা বরং ফিরি।' নিঃশব্দে, সাবধানে, চেয়ার ছাড়ল ওরা। বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

মনে হলো, নেহাতই দুর্ঘটনা। কিন্তু আসলে কি তাই?

পরদিন সকালেই গিলটি মিয়ার কাছ থেকে কেসটা সম্পর্কে সব জেনে নিয়ে তদন্তে বেরোল নঈম। গিলটি মিয়াই যেতে চেয়েছিল, কিন্তু এজেন্টরা কেউ তাকে হারলেমের মত বিপজ্জনক জায়গায় পাঠাতে রাজি হয়নি। আদব-কায়দা, ইংরেজী

ভাষা, আর ফাইল ওঅর্কে দুরন্ত হবার জন্যে নিউ ইয়র্কে পাঠানো হয়েছে তাকে। ছ'মাসের ট্রেনিং, তার মধ্যে চার মাস পেরিয়ে গেছে। ইদানীং ওকে ছোটখাট তদন্তেও পাঠানো হয় বটে, কিন্তু সে শুধু অন্যান্য এজেন্টরা যখন সময় দিতে পারে না তখন।

ওয়েস্ট এন্ডের এক রেস্তোরাঁ থেকে আরেক রেস্তোরাঁয়, এক ক্যাসিনো থেকে আরেক ক্যাসিনোয়, এভাবে ঘুরতে ঘুরতে দুপুর পার করে দিল নঈম, কিন্তু স্বর্ণমুদ্রা-রহস্য সম্পর্কে নতুন কোন তথ্যই যোগাড় করতে পারল না। যারা টাকার বিনিময়ে তথ্য যোগান দেয় তাদের সাথে কথা বলেও কোন লাভ হলো না, প্রসঙ্গটা তুলতেই ব্যস্তসমস্ত ভাব দেখিয়ে কেটে পড়ল তারা। একটা রেস্তোরাঁয় খেতে ঢুকল নঈম। খাবারে কি ছিল কে জানে, রাস্তায় বেরোবার পর এমন অসুস্থ বোধ করল, ট্যাক্সি নিয়ে সোজা হাসপাতালে চলে আসতে হলো। পরীক্ষা করে ডাক্তাররা বলল, 'সম্ভবত ফুড পয়জনিং।'

দ্বিতীয় দিন তদন্তে বেরোল জুয়েল। হাতে তার অনেক কাজ, কাজেই সময় বের করে বেশ অনেক রাতে ওয়েস্ট এন্ডে আসতে পারল সে। এলাকায় ঢোকার পরপরই টের পেল, তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে। নজর ছিল পিছনে, কিন্তু বিপদ এল ওপর থেকে। লাইটপোস্টের মাথা থেকে একটা ইলেকট্রিক তার ছিঁড়ে পড়ল কাঁধে। ভাগ্যিস লোকজন ছিল কাছে পিঠে, উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে গা থেকে তার ছাড়িয়ে দিল তারা। মর্মান্তিক কিছু ঘটল না বটে, কিন্তু আহত জুয়েলকে হাসপাতালে যেতে হলো।

দুর্ঘটনা?

মাঝখানের দু'দিন ওয়েস্ট এন্ডে গেল না কেউ। বাকি এজেন্টরা অন্য সব কাজে চরকির মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, এদিকে খেয়াল দেয়ার সময় নেই। পাঁচ দিনের দিন এল সবচেয়ে বড় আঘাত।

সেদিন সকালেই ঠিক করল শিরিন, আজ সন্ধ্যায় ওয়েস্ট এন্ডে যাবে সে। দুপুরবেলা অফিস থেকে ফোন করল দু'জন ইনফরমারকে, জানিয়ে রাখল হারলেমের অমুক রেস্তোরাঁয় তাদের সাথে দেখা করবে সে।

বাড়ি থেকে বেরোবার জন্যে সাতটায় তৈরি হতে বসল শিরিন। কাপড়চোপড় পরে মেকআপ নিল। বেরোবে, এই সময় শুরু হলো জ্বালা। প্রথমে নাকে-মুখে চুলকানির ভাব, প্রতি মুহূর্তে সেটা বাড়তে লাগল, তারপর মনে হলো যেন গোটা মুখে আগুন ধরে গেছে তার। বাথরুমে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়াল শিরিন, এরই মধ্যে তীব্র যন্ত্রণায় ফোঁপাতে শুরু করেছে সে। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে হার্টফেল করার অবস্থা হলো তার। পুড়ে গেলে যেমন হয়, সে রকম কালো কালো ছাপ পড়েছে সারা মুখে। আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল গলা দিয়ে, ছুটল টেলিফোনের দিকে। হাসপাতালে রিঙ করেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে।

জ্ঞান ফেরার পর কিভাবে কি ঘটেছে সব পুলিসকে বলল শিরিন। তার ফ্ল্যাটে এসে ক্রীমের একটা কৌটো খুঁজল পুলিস, কিন্তু মেকআপের আর সব সরঞ্জাম পাওয়া গেলেও, নির্দিষ্ট ক্রীমের কৌটোটা পাওয়া গেল না। পরীক্ষায় জানা গেল,

ক্রীমের সাথে এক ধরনের রাসায়নিক বিষ মেশানো হয়েছিল, সেটা মাখার ফলেই শিরিনকে তার মুখের চামড়া হারাতে হয়েছে।

রানা এজেন্সির সব শাখার মত নিউ ইয়র্ক শাখাকেও প্রতিদিনের রিপোর্ট হেডকোয়ার্টার ঢাকায় পাঠাতে হয়। নিউ ইয়র্ক থেকে এই কাজটা এখন গিলটি মিয়া করছে। সেদিন রাতে টেলেক্স যোগে ঢাকায় রিপোর্ট পাঠাবার সময় মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে, যা থাকে কপালে, কাল সে-ই যাবে ওয়েস্ট এন্ডে।

কিন্তু শিরিনকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হলো বলে, পরদিন অর্থাৎ আজ, রাতের আগে সময় করতে পারল না গিলটি মিয়া। ঢাকা থেকে কাল রাতেই নির্দেশ এসেছে, শিরিনকে আমেরিকার সেরা প্লাস্টিক সার্জেনের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

পরনে সদ্য ভাঁজ খোলা স্যুট, হাতে সোনালি হাতল লাগানো ছড়ি, মাথায় বোলার হ্যাট, চমৎকার মানিয়েছে গিলটি মিয়াকে। বিদেশে এসে পুরোদস্তুর সাহেব বনে গেছে সে। ওয়েস্ট এন্ডে পা দেয়া মানে বাঘের ঘরে ঢোকা, জানে সে। তৈরিও হয়ে আছে, বিপদ দেখলেই ঝেড়ে দৌড় দেবে। কিন্তু চেহারা আর আচরণ দেখে তার মনের অবস্থা টের পাবার কোন উপায় নেই। এলাকায় পা দিয়েই একটা বার-এ ঢুকে খানিকটা হুইস্কি খেয়ে নিয়েছে, তারপর থেকে এ-রাস্তা সে-রাস্তায় ঘুর ঘুর করার সময় আপন মনে গাইছে, 'ম্যায়নে আজ পি লিয়া তো কিয়া…।' ভাবটা যেন, মহা ফুর্তিতে আছে সে।

ঘণ্টা দুয়েক ঘোরাঘুরির পর গিলটি মিয়ার মনে হলো, তার পিছনে ফেউ লাগেনি। নঈম, জুয়েল আর শিরিনের কথা ভাবল সে। এ থেকে কি পেরমান হয়? লিচ্চয় দুশমনরা আমাকে ভয় পাচচে, ঘাঁটাতে সাহস করচে না!

সাহস বেড়ে গেল গিলটি মিয়ার। ঠিক করল তদন্ত শুরু করবে।

ছড়ির ডগা দিয়ে সুইং ডোর ঠেলে একটা বার-এ ঢুকল সে। গরম বাতাস, সিগারেটের ধোঁয়া, আর কল-কোলাহল ধাক্কা মারল নাকে-মুখে। বারে তিল ধারণের জায়গা নেই। নিগ্রোর সংখ্যাই বেশি, তবে বিদেশী বেশ কিছু লোকও দেখা গেল। ভারতীয় দু'একজন শিখ, আর পাকিস্তানী এক-আধজন পাঞ্জাবীও রয়েছে। কোন টেবিল খালি নেই দেখে সরাসরি বার কাউন্টারের দিকে এগোল গিলটি মিয়া। নতুন আগন্তুকের দিকে কেউ কেউ তাকাল, তারপর আবার মন দিল খানাপিনায়।

কাউন্টারের সামনে দাঁড়াল গিলটি মিয়া, বারম্যানকে বলল, 'হুইস্কি।'

ঝটপট এক আউন্স হুইস্কি পরিবেশন করল বারম্যান।

গ্লাসটা বারম্যানের দিকে ঠেলে দিল গিলটি মিয়া। 'এটা তোমার জন্যে।'

অবাক হলো বারম্যান, কিন্তু মনে মনে খুশিও হলো। 'অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলে এক চুমুকে হুইস্কিটুকু গিলে ফেলল সে।

পকেট থেকে স্বর্ণমুদ্রাটা বের করে কাউন্টারের ওপর ঠকাস করে ফেলল গিলটি মিয়া, আওয়াজটা যাতে বারের সবাই শুনতে পায়। 'ভাল করে দেকো তো, এরকম আগে ককনো চোকে পড়েচে?'

কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে স্বর্ণমুদ্রাটা দেখল বারম্যান, সাথে সাথে ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার চেহারা। বোবা দৃষ্টিতে গিলটি মিয়ার দিকে তাকাল সে, দ্রুত এদিক

ওদিক মাথা ঝাঁকাল।

বারের বহু লোক ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।

খুক খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল গিলটি মিয়া। 'এ-ধরনের মোহর কিনতে চাই আমি। রাত বারোটায় জেসি'স বারে থাকব।' বলে আর দাঁড়াল না, পিন-পতন স্তব্ধতাকে পিছনে রেখে হন হন করে বেরিয়ে এল বার থেকে।

আরেকটা বারে গিয়ে ঢুকল গিলটি মিয়া। স্বর্ণমুদ্রাটা পকেট থেকে বের করতেই প্রায় ছিটকে দূরে সরে গেল বারম্যান, ওর দিকে পিছন ফিরে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অগত্যা টেবিলে বসা লোকদের দিকে ফিরল ও, বলল, 'ভায়েরা আমার, এ-ধরনের মোহর কেউ যদি বেচতে চাও, রাত বারোটায় জেসি'স বারে আচি আমি।' অনেকেই চোখ তুলে ওর মোহরটা দেখল, কিন্তু একটি কথা বলল না কেউ।

তৃতীয় বার-এ তিন-চারজন লোক টেবিল ছেড়ে উঠে এল, গিলটি মিয়ার কথা তখনও শেষ হয়নি। স্রেফ পাঁজাকোলা করে তুলে বারের বাইরে, রাস্তায় ফেলে দিয়ে গেল ওকে।

কিন্তু গিলটি মিয়া সহজে দমবার পাত্র নয়। এরপরও কয়েকজন লোকের সাথে কথা বলল ও। তবে আগের চেয়ে সাবধান হয়ে গেছে। কথা বলল নিচু গলায়, ফিসফিস করে। দোকানদাররা দ্রুত হাত নেড়ে বিদায় করে দিল ওকে। আর রেস্তোরাঁর বেয়ারা বা ম্যানেজাররা স্রেফ মৌন ব্রত অবলম্বন করল, তারা এমনকি ওর স্বর্ণমুদ্রাটা দেখতেও রাজি নয়।

এবার জেসি'স বারের দিকে হাঁটা ধরল গিলটি মিয়া, বারোটা বাজতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি।

কনকনে শীতের রাত, তিন রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে দ্রুত চারদিকে চোখ বুলাল গিলটি মিয়া। চওড়া একটা গলির ভেতর গোটা তিনেক গাড়ি দেখা গেল, শেষ মাথায় জেসি'স বারের নিওন সাইন জ্বলছে। আলোছায়ার ভেতর কিছুই নড়ছে না। 'বিসমিল্লাহ,' বলে গলির ভেতর ঢুকে পড়ল ও।

প্রথম গাড়িটাকে পাশ কাটাল, নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে এল দু'জন লোক। একজনের হাতে একটা সাইকেলের চেইন, অপরজনের হাতে নাইলন কর্ডের একটা ফাঁস। এদের সামনে আরও দু'জনকে দেখা গেল, এইমাত্র দ্বিতীয় গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। শেষ গাড়িটা পেরিয়ে এল গিলটি মিয়া, ওর পিছনে এখন ছয়জন বডি-বিল্ডারের একটা নিঃশব্দ মিছিল।

বারে ঢুকতে যাবে, ভেতর থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এল এক মাতাল, গায়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ধাক্কাটা কোন রকমে সামলে নিল গিলটি মিয়া, কিন্তু তারপরই যেন আকাশ ভেঙে পড়ল ওর ওপর।

মাতাল লোকটা দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল ওর পেটে, গলার ভেতর থেকে কোঁক করে আওয়াজ বেরিয়ে এল। ছিটকে পিছিয়ে এল সে তিন কদম। সাতজনের দলটা ঘিরে ফেলল ওকে। ব্যথা হজম করে হাসল ও, বলল, 'তোমরা বোধায় ভুল...।'

কোমরে লাথি খেয়ে ছিটকে পড়ল গিলটি মিয়া। একজন ওর পেটের ওপর দু'পা দিয়ে দাঁড়াল। পরমুহূর্তে তিন মণ ওজনের লাথি মারল কানের পাশে। লাগছে, কিন্তু গিলটি মিয়ার মুখের হাসি এখনও প্রায় অম্লান। পেট থেকে নেমে লোকটা ওর টাই মুচড়ে ধরে এক টানে দাঁড় করাল, তারপর প্রচণ্ড এক থাবড়া মারল নাকচোখ বরাবর। আরেক লোক সপাং করে সাইকেলের চেইন মারল ওর গর্দান সই করে। পরমুহূর্তে আরেকটা বাড়ি পড়ল মুখে। ঘাড়ের ওপর মাথাটা টলমল করে উঠল, রক্তে ভেসে গেল ফুলে ওঠা মুখ আর কপাল। দু'জন লোক ধরে দাঁড় করিয়ে রাখল ওকে, বাকি সবাই এলোপাতাড়ি কিল, ঘুসি, কনুই আর লাথি মারতে লাগল।

মার খাওয়ার অভ্যেস আছে গিলটি মিয়ার, কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। নিজের ভুল হঠাৎ করেই বুঝতে পারল ও। ওর হাবভাব দেখে গুণ্ডারা বুঝতে পারছে, এ-সবে ওর কিছুই হচ্ছে না, সেজন্যেই বোধহয় থামছে না ওরা। নাকি, একেবারে মেরে ফেলতে চায়?

বিকৃত হয়ে উঠল চেহারা। পাকা দারোগার মত এদের মার, হাড় ভাঙছে না, শুধু ফুলে ফুলে উঠছে আহত জায়গাগুলো। একটা কথা ভেবে আরও কিছুক্ষণ নিজেকে সামলে রাখল গিলটি মিয়া। লোকগুলো হয়তো এখানেই ওকে ফেলে রেখে চলে যাবে, তার আগে ওদের কিছু নমুনা রেখে দেয়া দরকার। হাত-সাফাই অনেকদিন হলো ছেড়ে দিয়েছে সে, কিন্তু কৌশলটা ভোলেনি। বাবারে, মারে বলে চিৎকার করতে করতে নিখুঁত ভাবে কাজটা সারল ও।

কিন্তু থামছে না লোকগুলো। এক সময় আর চিৎকার করার শক্তি থাকল না। রাস্তার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ও। সাইকেলের চেইন দিয়ে মেরেই চলেছে একজন। কাপড়ের ভেতর পিঠ আর পাঁজরে ফুলে উঠল চেইনের চাকা চাকা দাগ। বিড়বিড় করে প্রলাপ বকছে গিলটি মিয়া, কিন্তু ওদের নিষ্ঠুর হাসির শব্দে কথাগুলো চাপা পড়ে যাচ্ছে। একবার শুধু শোনা গেল, 'দোহাই, জানে মেরো না…।'

ওদের মধ্যে থেকে পশতু ভাষায় কথা বলল একজন, 'ঝামেলা শেষ করো এবার!' একজন শিখ এগিয়ে এল, হাতে নাইলনের কর্ড। ফাঁসটা গিলটি মিয়ার গলায় পরাল সে। কয়েক ভাঁজ হয়ে রাস্তার ওপর শুয়ে আছে গিলটি মিয়া। আশ্চর্য, এখনও জ্ঞান হারায়নি ও। ফাঁসটা গিলটি মিয়ার গলা কামড়ে রয়েছে, কর্ডের প্রান্ত দুটো ধরে হ্যাঁচকা একটা টান দিলেই আধ হাত জিভ বেরিয়ে আসবে। মুখ খুলে বাতাস টানার ব্যর্থ চেষ্টা করল ও। ককিয়ে বলল, 'পানি।' ট্রাউজারের চেইন খুলে ওর মুখের সামনে দাঁড়াল একজন, ছর-ছর শব্দে প্রস্রাব করল। গরম পানিতে মুখের ভেতরটা ভরে গেল। কিন্তু ঢোক গিলতে পারল না গিলটি মিয়া। বুঝল, শেষ মুহূর্ত উপস্থিত, এতদিনে সত্যিই মৃত্যু হচ্ছে ওর। কেন জানি রানার চেহারাটা মনে পড়ল। মনে মনে বলল, 'মাপ করে দেবেন, স্যার। আপনাকে একা রেকেই চললাম।'

কর্ড ধরে টান দিতে গেল অপর লোকটা, এই সময় ওদের সামনে একটা ছায়া পড়ল। ঝট্ করে মুখ তুলে তাকাল ওরা। গুরুত্ব দেয়ার কোন প্রয়োজন দেখল না। দীর্ঘদেহী এক নিগ্রো যুবক। লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে।

ঝুঁকে গিলটি মিয়াকে দেখল লোকটা। আধবোজা চোখ তুলে তাকাল গিলটি মিয়া।

সকৌতুকে আগন্তুক যুবকের দিকে তাকিয়ে আছে গুণ্ডারা। ধীরে ধীরে সিধে হলো যুবক। বিদ্যুৎবেগে কনুই চালাল সে, প্রচণ্ড আঘাতে দু'পাশের দু'জন আছড়ে পড়ল রাস্তায়।

লোকগুলোকে ঘিরে যেন একটা খেপা মৌমাছি উড়ে বেড়াতে শুরু করল। কারও চোখের ভেতর ঢুকে গেল তার একটা আঙুলের দেড় ইঞ্চি, কারও নাক থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল, কারও পাঁজর ভেঙে তিন ইঞ্চি দেবে গেল ভেতর দিকে। শিখ লোকটার খুলি আর চিবুকের চামড়া-মাংস সহ উঠে এল চুল-দাড়ি, মাড়ি থেকে উপড়ে ছিটকে পড়ল গোটা তিনেক দাঁত। একজনের হাত ভাঙল, একজনের খুলি ফাটল। কেউ হাতজোড় করে মাফ চাইল, কেউ খিঁচে দৌড় দিতে গিয়ে সামনে তাকেই দেখতে পেয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

তিন মিনিট পর ক্ষান্ত হলো যুবক। আহত যারা, তাদের কারও নড়ার শক্তি নেই। দু'জন জ্ঞান হারিয়েছে। পালিয়েছে একজন।

রক্তাক্ত গিলটি মিয়া মাথা তুলতে গিয়েও পারল না। এত মার খেয়েও কাঁদেনি ও, কিন্তু এখন কৃতজ্ঞতায় দু'চোখ ঝাপসা হয়ে এল পানিতে। 'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ, মি.…।'

'চুপ!' নিখাদ বাংলায় ধমক লাগাল আগন্তুক। 'একদম চুপ!' গিলটি মিয়াকে দু'হাতে ধরে কাঁধে তুলে নিল মাসুদ রানা। 'আগে এই নরক থেকে পালাই চলো!'

এতক্ষণে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল গিলটি মিয়া।

দুই

তীরবেগে ছুটছে ট্যাক্সি।

নতুন মডেলের গাড়িগুলো দৃষ্টি কেড়ে নেয়, ড্রাইভিং সীটে বেশিরভাগই মেয়েরা। রাস্তার দু'পাশে কংক্রিটের ওপর কাঁচ মোড়া সার সার বিল্ডিং, প্রতিটি বিল্ডিঙের গায়ে গিজ গিজ করছে রঙচঙে সাইনবোর্ড। ম্যানহাটনে ঢুকল ট্যাক্সি, দালান-কোঠার মাথাগুলো এখানে মেঘ ছুঁয়েছে। পাঁচতারা হোটেল হিলটনের সামনে থামল ড্রাইভার, পঞ্চম এভিনিউ আর পঞ্চান্নতম স্ট্রীটের কোণে। ধাপ ক'টা তরতর করে পেরিয়ে এসে আরোহীর হাত থেকে ব্রীফকেসটা চেয়ে নিল পোর্টার।

মানিব্যাগ বের করে ড্রাইভারকে ভাড়া দিল রানা। হঠাৎ কংক্রিটের সাথে চাকার তীব্র ঘর্ষণের শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে ফিফথ্ এভিনিউয়ের দিকে তাকাল ও।

কালো একটা মার্সিডিজ। পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে যানবাহনের দ্রুতগতি মিছিলে ঢুকতে যাচ্ছিল, সামনে একটা গাড়ি এসে পড়ায় ব্রেক করে দুর্ঘটনা

এড়িয়েছে। মার্সিডিজের ড্রাইভারকে দেখে তাজ্জব বনে গেল রানা, শাড়ি পরা একটা মেয়ে। বোতামের ওপর আঙুল চেপে রেখেছে মেয়েটা, একটানা আওয়াজ করছে মার্সিডিজের হর্ন। সামনে থেকে সরে গেল বাধা, তেরছা একটা বাঁক নিয়ে হুস্ করে বেরিয়ে গেল মার্সিডিজ, জানালা দিয়ে পলকের জন্যে দেখা গেল প্যাসেঞ্জার সীটে বসা আরোহীকে—বিশালদেহী এক নিগ্রো।

বড় বড় মায়া ভরা চোখ, চেহারায় কোমল লাবণ্য—মেয়েটা নিশ্চয়ই বাঙালী।

বাঙালী একটা মেয়ের এই আত্মবিশ্বাস, আর সপ্রতিভ ভাব দেখে মনে মনে খুশি হওয়ার কথা রানার। কিন্তু খুশি হওয়া তো দূরের কথা, ক্ষীণ একটা চিন্তার রেখা ফুটে উঠল ওর কপালে। আরোহীর প্রকাণ্ড কালো মুখ পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে ও। ধীরে ধীরে ওর দিকে ঘুরে গিয়েছিল মুখটা, সোজা তাকিয়েছিল ওর চোখে।

আপন মনে কাঁধ ঝাঁকিয়ে পোর্টারের পিছু নিল ও। রেজিস্টারে সই করার জন্যে রিসেপশনে থামতে হলো। এখনও নিগ্রো যুবকের ছদ্মবেশ নিয়ে আছে ও, নাম নিয়েছে ডেরিক অ্যাম্বলার। রানা এজেন্সির লোকেরা ওর নামে হিলটনের একটা স্যুইট রিজার্ভ করেছে গতকাল। নতুন পরিচয়ের স্বপক্ষে কাগজ-পত্র, আর ছদ্মবেশটাকে নিখুঁত করার জন্যে কিছু সরঞ্জামও এখানে ওদের রেখে যাবার কথা।

এলিভেটর থেকে ছাব্বিশ তলার করিডরে বেরিয়ে এল ওরা। এক হাজার পাঁচ নম্বর স্যুইটের তালা খুলল পোর্টার। আলোকিত ছোট্ট লবিতে ঢুকল রানা, হ্যাট আর কোট খুলে চেয়ারের পিঠে রাখল। ইতোমধ্যে সামনের দরজাটা খুলে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছে পোর্টার। করিডরের এপাশ-ওপাশ দেখল রানা, তারপর ভেতরে ঢুকল। আরাম-কেদারা আর সোফায় সাজানো সিটিংরুম, সোফাগুলো হলুদ সিল্কে মোড়া। মেঝেতে নরম কার্পেট, এক কোণে খুদে একটা বার, বারের পাশেই খোলা জানালা। বেডরুমে ঢোকার দরজাটা খোলা রয়েছে। দরজার পাশে একটা ফ্রেঞ্চ সাইনবোর্ড, তার মাথায় একটা ফোল্ডার, আর কয়েকটা প্যাকেট দেখা গেল। এজেন্সির লোকেরা ঠিকমতই পৌঁছে দিয়ে গেছে সব।

টেবিলের ওপর ব্রীফকেস রেখে বিদায় নিল পোর্টার। দরজা বন্ধ করে দিয়ে বেডরুমে ঢুকল রানা, হাতে বিয়ারভর্তি গ্লাস। বিছানার পাশেই নিচু টেবিল, তাতে টেলিফোন আর ফুলদানি। ঝুঁকে গোলাপের ঘ্রাণ নিল ও।

কাপড়চোপড় না খুলেই, জুতোসুদ্ধ পা তুলে বিছানায় উপুড় হলো ও, বিয়ারের গ্লাসে ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে, আর ভাবছে।

কে মেয়েটা? নাকি প্রকাণ্ড নিগ্রো লোকটাকে নিয়েই মাথা ঘামানো উচিত ওর?

পিছু নিয়ে এসে দেখে গেল, কোন্ হোটেলে উঠেছে ও? নাকি আগেই জেনেছে কোথায় উঠবে, স্বচক্ষে দেখার জন্যে অপেক্ষা করছিল পার্কিং লটে?

কারা ওরা?

সরাসরি ওর দিকে তাকিয়েছিল লোকটা, কিন্তু তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না। তবে কি শুধু শুধু অস্বস্তি বোধ করছে ও?

বিয়ার শেষ করে চেহারার যত্ন নিতে বসল রানা। সাইডবোর্ডের মাথা থেকে ফোল্ডার আর কয়েকটা প্যাকেট নামাল, সব নিয়ে বসল ড্রেসিং টেবিলের সামনে।

কাঁচি, ক্ষুর, আর রেজার দিয়ে কামিয়ে ফেলল ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, ঝুল কমাল জুলফি আর চুলের। গোঁফটা থাকল, তবে চেঁছে একেবারে ছোট করে নিল। কাগজ-পত্রে চোখ বুলিয়ে খুশি হলো ও, কোথাও কোন খুঁত নেই। একজন মার্কিন নাগরিক ও, বোস্টন থেকে ছুটি কাটাতে এসেছে নিউ ইয়র্কে।

টেলিফোনে লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার সারল। আয়নার সামনে দিগম্বর হয়ে দাঁড়িয়ে কালো ক্রীম মাখল সারা শরীরে। দশ মিনিটের মধ্যে শুকিয়ে গেল ক্রীম, গায়ের সাথে এমনভাবে মিশে থাকল যেন কালো রঙ নিয়েই জন্মেছে ও।

লাঞ্চ সেরে সবেমাত্র একটা সিগারেট ধরিয়েছে, ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল ফোন।

রিসিভার তুলল রানা। 'হ্যালো?'

'তুমি মেজর মাসুদ রানা। জাতীয়তা: বাংলাদেশী। বয়স: আটাশ। গায়ের রঙ: উজ্জ্বল শ্যামলা। পেশা: বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের একজন এজেন্ট। কাভার: রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির ডিরেক্টর।'

'হু দ্য হেল ইউ আর?'

'নেশা: বোকার মত বিপদ খুঁজে বেড়ানো, ইডিয়টের মত মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়া। চরিত্র: অবশ্যই মুনি-ঋষি নও।'

'রিসিভার থেকে কাপড় সরাও!'

'স্বভাব: সেকেলে। দেশপ্রেমের মত হাস্যকর ভাবাবেগ তোমাকে তাড়িত করে। শত্রুর চোখে: আসলে তুমি ভাগ্যবান, তা না হলে কবেই মরে ভূত হয়ে যেতে। বিশেষ বৈশিষ্ট্য: কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে ওস্তাদ। অভিযোগ: তোমাকে কেনা যায় না।'

'বলবে, কে তুমি?'

'এফ.বি.আই.।'

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। এত তাড়াতাড়ি ওদের চোখে পড়ে গেল সে? 'কি চাও?'

'ব্যাখ্যা।'

'কিসের ব্যাখ্যা?'

'তুমি জানো।'

'গো টু হেল।' রিসিভার নামিয়ে রাখতে গেল রানা।

'আরে দোস্ত, রাগ করো কেন?' অপরপ্রান্তের রিসিভার থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে রুমাল। 'আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাই।'

'শালা!' আদর করে গাল দিল রানা।

'আসছি।'

দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল ফিলিপ ওয়াটসন। দৈনিক ওয়াশিংটন পোস্ট-এর স্টাফ রিপোর্টার ফিলিপ। বলাই বাহুল্য, চাকরিটা ওর কাভার। স্যুইটে ঢুকেই রানার পাঁজরে একটা গুঁতো মারল সে। সিটিংরুমে ঢুকে বারের সামনে দাঁড়াল

শিপ লুঠ হয়েছিল বলে কোথাও কোন রেকর্ড নেই।

ব্ল্যাকবিয়ার্ডকে বাদ দিয়ে এরপর রানা পিয়েরিলা গ্র্যান্ড, শার্প, সকিনস, আর ব্লাডি মরগ্যানের ওপর পড়াশোনা ঝালিয়ে নিল। যার যার আমলে এরা প্রত্যেকেই কুখ্যাত জলদস্যু ছিল।

কয়েকটা তথ্য পাবার পর পরিষ্কার হয়ে গেল, গুপ্তধনটা আসলে ব্লাডি মরগ্যানেরই। মরগ্যান যে শুধু জলদস্যু ছিল তাই নয়, ষোলোশো পঁচাত্তর থেকে ষোলোশো অষ্টাশি সাল পর্যন্ত জ্যামাইকার গভর্নর এবং কমান্ডার-ইন-চীফও ছিল সে। ব্রিটিশ মুদ্রাগুলো সম্ভবত জ্যামাইকা গ্যারিসনে পাঠানো হয়েছিল, সৈনিকদের বেতন হিসেবে। রক্ষকই ভক্ষক, মরগ্যানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ বারবার তোলা হয়েছে। এক্ষেত্রেও ব্যাপারটা হয়তো তাই ঘটেছিল, ব্রিটিশ মুদ্রাগুলো সেই-ই লুঠ করায়, তারপর তার অন্যান্য লুঠ করা মুদ্রার সাথে লুকিয়ে রাখে কোথাও।

'জলদস্যুদের ইতিহাস পড়ে তেমন কোন লাভ হয়নি,' বলল রানা। 'মরগ্যানের গুপ্তধনে কারও হাত পড়েছে, এটুকু জানা গেল, ব্যস। কার হাত পড়েছে, জ্যামাইকা থেকে সব মোহর আমেরিকায় চলে এসেছে কিনা, এ-সব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আরও ক্লু দরকার। সেই ক্লু-র খোঁজেই আজ রাতে আমরা বেরুব।' ক্লিনিক থেকে ছাড়া পেয়ে একটা হোটেলে উঠেছে গিলটি মিয়া, ছদ্মবেশ নিয়ে রানার জন্যে একটা বারে অপেক্ষা করবে সে।

নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে আয়েশ করে টান দিল ফিলিপ। 'আমার ধারণা,' বলল সে, 'সব মোহর জ্যামাইকা থেকে আমেরিকায় নিয়ে আসা হয়নি। এখনও ওখানে প্রচুর মোহর আছে। পড়াশোনা যখন করেছ তখন নিশ্চয়ই জানো, ইতিহাসের সবচেয়ে বড় গুপ্তধন বলতে মরগ্যানের গুপ্তধনকেই বোঝায়। মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে কোটি কোটি ডলারের লাখ লাখ মোহর সব নিয়ে আসতে পেরেছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। জাহাজ তো ওই একটাই ব্যবহার করছে ওরা।'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার। 'জাহাজ?'

'ঠিক জাহাজ নয়, আল-আমিন নামে একটা ডিজেল ইয়ট,' বলল ফিলিপ। 'উত্তেজিত হয়ো না, কারণ আমাদের হাতে কোন প্রমাণ নেই। বলতে পারো, ইয়টটাকে আমরা সন্দেহ করছি।'

তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল রানা। 'আল-আমিন?'

'হ্যাঁ,' বলল ফিলিপ। 'ফ্লোরিডা কীজ ধরে প্রায় নিয়মিত চলাচল করছে আল-আমিন। হয় জ্যামাইকার উত্তর উপকূলের ছোট্ট একটা দ্বীপ থেকে রওনা হয়ে গালফ অভ মেক্সিকোর সেন্ট পিটার্সবার্গ নামে এক জায়গায় আসছে, নাহয় সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে ওই দ্বীপে যাচ্ছে।'

'সেন্ট পিটার্সবার্গ?'

'টামপা-র কাছে একটা অবসর বিনোদন কেন্দ্র, ফ্লোরিডার পশ্চিম উপকূলে। খোঁজ-খবর নিয়ে আমরা জেনেছি, ইয়ট আর দ্বীপটার মালিক মি. ওয়াইজ, এক কালা-আদমী, বাস করে হারলেমে। নামটা আগে কখনও শুনেছ?'

'না।'

'তার আসল নাম আবু বকর সিদ্দিক, মিশরে জন্ম। কিন্তু আন্ডারগ্রাউন্ডে মি. ওয়াইজ নামে একডাকে চেনে তাকে সবাই। মুসলিম আর মিশরীয় বলেই হয়তো ইয়টের নাম রেখেছে আল-আমিন। তার কাগজ-পত্র খুঁটিয়ে কয়েকবার পরীক্ষা করেছি আমরা, কোথাও কোন খুঁত নেই। একটা তদন্ত টীম পাঠানো হয়েছিল কায়রোয়, ফিরে এসে তারা রিপোর্ট করল, আবু বকর সিদ্দিক নামে এক লোক সত্যি সেখানে ছিল—আন্ডারগ্রাউন্ডের সম্রাট খেতাব নিয়ে। কিন্তু কায়রো পুলিস জানিয়েছে, সিদ্দিকের নামে তারা কোন কেস ফাইল করতে পারেনি, প্রমাণের অভাবে। তারপর, পাঁচ বছর আগে, হঠাৎ করে মিশর থেকে গায়েব হয়ে যায় সে।'

'উদয় হয় আমেরিকায়।'

'হ্যাঁ,' নতুন একটা সিগারেট ধরাল ফিলিপ। 'কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, কাগজ-পত্রে প্রমাণ হয় বটে যে পাঁচ বছর আগে আবু বকর সিদ্দিক নামে এক লোক এ-দেশে আসে, আস্তানা গাড়ে হারলেমে, কিন্তু অনেক খুঁজেও আমরা এমন একজন লোক পাইনি যে তাকে ছ'মাস আগে হারলেমে বা নিউ ইয়র্কের অন্য কোথাও দেখেছে। গত পাঁচ বছর ধরে তার নামে নিয়মিত ট্যাক্স দেয়া হয়েছে, টিভি, ফায়ার-আর্মস, রেডিওর লাইসেন্স সংগ্রহ করা হয়েছে; নাগরিকত্ব আর পাসপোর্ট নেয়া হয়েছে; ভোট দেয়া হয়েছে—কিন্তু লোকটাকে কেউ কখনও দেখেনি।'

'তারমানে উড়ে এসে জুড়ে বসবে এখানে—এটা তার পাঁচ বছর আগের পরিকল্পনা?'

'বোধহয় তাই,' ধীরে ধীরে বলল ফিলিপ। 'নিশ্চয়ই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢালতে হয়েছে তাকে, আর কাউকে দিয়ে নিজের উপস্থিতি প্রমাণ করার জন্যে।'

'তুমি বললে আন্ডারগ্রাউন্ডে সবাই তাকে চেনে।' কালো মার্সিডিজ, শাড়ি পরা বাঙালী ড্রাইভার, আর প্রকাণ্ডদেহী নিগ্রো আরোহীর কথা মনে পড়ে গেছে। ওই লোকটাই কি মি. ওয়াইজ ওরফে আবু বকর সিদ্দিক? 'কালপ্রিট বলে তাকেই তোমরা সন্দেহ করছ?'

'হ্যাঁ। আজ বিকেলে পুলিস হেডকোয়ার্টারে একবার এসো তুমি, রানা। আমিও ওখানে থাকব। মি. ওয়াইজ সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য জানতে পারবে। তোমাকে শুধু এইটুকু বলে রাখি, লোকটা হারলেমে আত্মপ্রকাশ করার পর আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে মাফিয়া নামটা পর্যন্ত মুছে যেতে বসেছে। মাফিয়ার পেশী-পুরুষদের স্রেফ টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে সে। হারলেমের গুণ্ডা-পাণ্ডা, খুনে-বদমাশরা তার কথায় বাঁচে, তার কথায় মরে। পরিস্থিতি যে কতটুকু ভয়ঙ্কর, সে তোমাকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। বিকেলে, যদি সম্ভব হয়, ওর ডশিয়ে দেব তোমাকে, পড়লে বুঝতে পারবে।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'কিন্তু মোহরের ব্যাপারে তাকে সন্দেহ করছ কেন তা তো বললে না?'

উত্তরে ফিলিপ যা বলল, সংক্ষেপে তা এইরকম:

মোহরগুলো যারা বিক্রি করতে আসে তাদের মধ্যে মার্কিন নিগ্রোর সংখ্যাই বেশি, তবে পাঞ্জাবী, শিখ, তুর্কীর সংখ্যাও কম নয়। মোহর বিক্রি করতে এসে

এদের কয়েকজন পুলিস বা এফ.বি.আই. এজেন্টদের হাতে ধরা পড়েছে। জেরার মুখে সবাই তারা একই কথা বলে। অমুক বারে অচেনা এক লোকের কাছ থেকে মোহর কিনছে তারা, একেকটা একশো সত্তর ডলার করে। বেশিরভাগ মোহরের ওজন এক ভরি, বাজার দর একশো আশি ডলার, তারমানে মোহর প্রতি অন্তত দশ ডলার লাভ হয় তাদের।

অচেনা লোকগুলো, যাদের কাছ থেকে মোহর কিনেছে তারা, ওদের কয়েকজনকেও ধরতে পারে এফ.বি.আই.। কিন্তু ওদেরও বক্তব্য, জীবনে কখনও দেখেনি এমন একজন লোকের কাছ থেকে একশো বা দেড়শো মোহর বাজার দরের চেয়ে বেশ সস্তায়, একশো ষাট ডলার করে কিনছে ওরা।

কিন্তু এই তৃতীয় সারির লোকদের কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। তা সম্ভব হলেও কোথাও পৌঁছনো যাবে বলে মনে হয় না, কারণ এদের মুখ থেকেও ওই একই গল্প শোনা যাবে।

মি. ওয়াইজের সাথে মোহরের সম্পর্ক আছে, এটা ভাগ্যগুণে আবিষ্কার করে ফেলে এফ.বি.আই.। নিচের সারির একজন লোক দ্বিতীয় সারির এক লোকের কাছ থেকে দশটা মোহর কেনার সময় দাম মিটিয়েছিল বিশ ডলারের এক বান্ডিল নোট দিয়ে। শেষ সারির এই লোকটা জুয়াড়ী, নাম্বারস গেম খেলার নেশা আছে, তাই সে তার বিশ ডলারের কয়েকটা নোটের নাম্বার নোটবুকে লিখে রেখেছিল। সেই নোট মি. ওয়াইজের এক শিষ্যের কাছ থেকে পায় এফ.বি.আই.-এর একজন ডাবল এজেন্ট, তথ্য যোগান দেয়ার পুরস্কার হিসেবে।

নক হলো দরজায়, উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল রানা। ট্রে-তে কফির সরঞ্জাম, আর একটা পার্সেল নিয়ে ভেতরে ঢুকল ওয়েটার। পার্সেলটা আকারে এক বর্গফুট হবে, সাইডবোর্ডের মাথায় রাখতে বলল রানা। নঈম বা জুয়েল পাঠিয়েছে, ধারণা করল, হয়তো আগে পাঠাতে মনে ছিল না।

'কিন্তু লোকটার উদ্দেশ্য কি?' কফির কাপে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা। 'মানে, আমি জানতে চাইছি, লোকটা কি শুধুই শক্তিশালী একজন গ্যাঙ-লীডার, নাকি তারচেয়ে বেশি কিছু? আন্ডারগ্রাউন্ডে জাঁকিয়ে বসেছে, বেশ, গুণ্ডাদের লীডার বলে মেনে নিলাম। তোমরা তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ যোগাড় করতে পারছ না, বুঝলাম, লোকটা চালাক-চতুর। কিন্তু তোমরা তাকে ভয়ঙ্কর বলছ কেন?'

কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে মৃদু হাসল ফিলিপ। 'তুমি প্রশ্নটা করবে আমি জানতাম, তাই উত্তরটা তোমাকে আগেই দিয়েছি। বলিনি, পুলিস হেডকোয়ার্টারে এসো, ওর ডশিয়ে তোমাকে দেব?'

যাবার সময়ও রানার পাঁজরে কনুই চালাতে ভুল করল না ফিলিপ ওয়াটসন।

দরজা বন্ধ করে সিটিংরুমে ফিরেছে রানা, হঠাৎ একটা অস্পষ্ট আওয়াজ শুনে সচকিত হয়ে উঠল। ঘরের ভেতরই কোথাও হচ্ছে আওয়াজটা।

মৃদু, ভোঁতা, টিকটিক শব্দ—মন্থর, ধাতব। সাইডবোর্ডের দিক থেকে আসছে।

মুহূর্ত মাত্র ইতস্তত না করে, বোকার মত আচরণ হয়ে যাচ্ছে বুঝেও, ডাইভ

দিয়ে সোফার পিছনে, মেঝেতে পড়ল রানা, সমস্ত মনোযোগ চৌকো পার্সেলটার ওপর। 'আরে রসো,' মনে মনে বলল ও, 'বোকামি কোরো না, স্রেফ একটা ঘড়ি ওটা।' কিন্তু ঘড়ি কেন? এজেন্সি থেকে ওকে ঘড়ি পাঠাবে কেন? কে পাঠাল?

'টিক-টক··· টিক-টক···টিক-টক—।'

নিস্তব্ধ ঘরে আওয়াজটাকে এখন বিকট মনে হলো। যেন রানার হার্টবিটের সাথে তাল মিলিয়ে চলেছে।

'টিক-টক···টিক-টক···টিক-টক—'

সুর আর তাল হঠাৎ বদলে গেল। গভীর সতর্কসঙ্কেতের ঢঙে একটানা, ঘন ঘন বাড়ি পড়ছে।

'টংটংটংটংটংটং···'

রানার পেশীতে ঢিল পড়ল। ওর সিগারেট কার্পেট পুড়িয়ে ছোট একটা গর্ত তৈরি করছে, সেটা তুলে ঠোঁটে লটকাল। অ্যালার্ম ক্লকের বোমা ফাটে অ্যালার্মে প্রথমবার হ্যামার পড়লেই। ডিটোনেটরের পিনে আঘাত করে হ্যামার, ডিটোনেটর বিস্ফোরণ ঘটায়।

সোফার কিনারা দিয়ে মাথা তুলে পার্সেলটার দিকে তাকাল রানা।

'টংটংটংটংটংটং···'

পরিষ্কার, তীক্ষ্ণ আওয়াজটা প্রায় আধমিনিট স্থায়ী হলো, তারপর গতি মন্থর হয়ে এল।

'টং···টং···টং···টং···টং···'

সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা।

'ফটাস!'

বিস্ফোরণের আওয়াজটা বারো বোর কার্ট্রিজের চেয়ে বেশি নয়, কিন্তু বদ্ধ স্যুইটের ভেতর বেশ জোরে বাজল কানে। ছিন্নভিন্ন পার্সেলটা মেঝেতে পড়ে গেছে। ফিলিপের রেখে যাওয়া বিয়ারের গ্লাসটাও ভেঙে চুরমার। খানিকটা কালো ধোঁয়া দেয়াল ঘেঁষে উঠে গেল সিলিঙের দিকে। বাতাসে গান-পাউডারের ঝাঁঝ।

জানালা খুলে দিয়ে ধোঁয়া বেরোবার রাস্তা করে দিল রানা। লবিতে বেরিয়ে এসে দরজা খুলে করিডরে তাকাল। কেউ নেই। 'ডোন্ট ডিসটার্ব' লেখা বোর্ডটা দরজার গায়ে ঝুলিয়ে দিয়ে তালা লাগাল, ফিরে এল সিটিংরুমে। এজেন্সি থেকে পাঠানো জিনিসপত্র ঘেঁটে একজোড়া দস্তানা বের করে পরল, ফেটে যাওয়া পার্সেলের ভেতর থেকে পেন্সিলের ডগা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করে আনল লোহা আর কাঁচের ছোট ছোট টুকরো, চওড়া একটা ব্লটিং পেপারের ওপর পাশাপাশি সাজিয়ে রাখল সব। 'আরে, এটা কি!' সতর্কতার সাথে ছোট একটা অ্যালুমিনিয়াম কন্টেইনার বের করল ও, এক্সপোজড ফিল্ম রাখার জন্যে ব্যবহার করা হয় জিনিসটা।

আধ মিনিট মেয়াদের অ্যাসিড ক্যাপসুল ছিল ওটা। অ্যালার্মে প্রথম হ্যামারের বাড়ি পড়ার সাথে সাথে কাজ শুরু করে দেয় অ্যাসিড, সরু তামার তার খেয়ে ফেলতে থাকে। ত্রিশ সেকেন্ড পর ছিঁড়ে যায় তার, রিলিজ করে দেয় প্লাঞ্জার।

পার্সেলের ভেতর একটা ফোর-বোর এলিফ্যান্ট গানের কার্ট্রিজ ছিল, সেটার ক্যাপে বাড়ি মারে প্লাঞ্জার। ব্ল্যাক পাউডার ছিল, কিন্তু কোন বুলেট ছিল না। ইচ্ছে করলে ভেতরে একটা গ্রেনেড ভরে দিতে পারত, প্রচুর জায়গা ছিল পার্সেলে।

অ্যালুমিনিয়াম সিলিন্ডারটা তুলে নিয়ে স্ক্রু খুলল রানা, গুটানো একটা কাগজ বেরোল ভেতর থেকে। কার্পেটের ওপর কাগজটা মেলল ও, টাইপ করা তিনটে ইংরেজী বাক্য রয়েছে।

কাগজটার ওপর ঝুঁকে পড়ল রানা। লেখাটার বাংলা অর্থ দাঁড়ায়:

'ঘড়ির টিক টিক হার্টবিট থেমে গেছে। তোমার নিজের হার্টবিটেরও একটা সংখ্যা নির্দিষ্ট করা আছে। সংখ্যা আমি জানি। গুনতেও শুরু করেছি।'

মেসেজটার নিচে 'স্বাক্ষর'-এর পর লেখা হয়েছে, 'এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত…?'

পঞ্চান্নতম স্ট্রীটে দেখা কালো মার্সিডিজের কথা মনে পড়ল রানার। মনটা তাহলে শুধু শুধু খুঁত খুঁত করছিল না।

গিলটি মিয়াকে ফোন করল ও।

কোন সন্দেহ নেই, ওদের পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে। কিন্তু রানা যদি খোলস ছেড়ে আসল চেহারা নেয়, হোটেল বদলাতে হবে ওকে। শুধু শুধু ঝামেলা। 'ছদ্মবেশ তোমার না নিলেও চলবে,' গিলটি মিয়াকে বলল ও। 'পালের গোদা আমাদের কথা জানে—তার একটা ভিজিটিং-কার্ড পেয়েছি এইমাত্র।'

'শরীল ভাল তো, স্যার? ঠিক-ঠাক আচে সব?'

'হ্যাঁ।'

'কাজে কাজেই পোরগাম আমাদের ঠিকই থাকচে, কি বলেন, স্যার? কাড যকন পাঠিয়েচে, চলুন পায়ের ধুলো দিয়ে আসি। এবার কেউ গায়ে হাত দিতে এলে শালাদের দেকে লেবো না! আপনি সাতে থাকলে…'

'একটা কথা, গিলটি মিয়া,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'তোমার ট্রেনিং পিরিয়ড চলছে। যা কিছু করার তুমি করবে, শুধু সাহায্যের দরকার হলে আমি আছি। ভুলো না, কেসটা তোমার।'

'তা তো বুজলুম, কিন্তু ময়দানে আপনি থাকলে ওরা আমাকে গেরাহ্যিই করবে না।'

'সে তো আরও ভাল। ঝড়-ঝাপটা কিছুটা আমার ওপর দিয়ে যাবে, সেই সুযোগে কেসটা সলভ করে ফেলবে তুমি। আমি যদি এ-সময় এখানে না থাকতাম, কেসটা তো তোমাদেরকেই সামলাতে হত।'

'তা হত, কিন্তু দেশে বসে আপনি খবর পেতেন সবাই আমরা পটল তুলচি। এ ব্যাটা সাক্ষাৎ ইবলিস, স্যার। অমন করে কেউ কাউকে মারে? আরাকটু হলে তো মরেই যাচ্ছিলাম।'

কঠোর হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'তোমার গায়ে ওরা হাত তুলেছে, এর জন্যে ওদেরকে মূল্য দিতে হবে, গিলটি মিয়া।'

কোন কারণ নেই, অপরপ্রান্তে চোখ দুটো ভিজে উঠল গিলটি মিয়ার। 'তাহলে

সেই কতাই রইল, স্যার। আপনি সামনে থাকবেন, ছড়ি হাতে নিয়ে আপনার পেচনে থাকব আমি।'

হাসি চেপে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

তিন

ফিফথ এভিনিউ আর ব্রডওয়ে-তে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াল রানা। পরনে অ্যাশ কালারের কমপ্লিট স্যুট, চোখে গগলস, কাঁধে ব্যাগ আর ক্যামেরা। ট্যুরিস্টদের মত দোকানগুলোর শো-কেসের সামনে বারবার দাঁড়াল ও, লোকজনকে থামিয়ে পথ জিজ্ঞেস করল। যখন বুঝল কেউ ওর ওপর নজর রাখছে না, একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে এল পুলিস হেডকোয়ার্টারে। ফিলিপ ওয়াটসন অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে।

হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের লেফটেন্যান্ট রটউড হ্যান্ডশেক করল রানার সাথে। সম্ভাব্য সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল। মি. ওয়াইজের পুলিস রেকর্ড দেখানো হলো রানাকে, বেশিরভাগ তথ্য আগেই রানা গিলটি মিয়া আর ফিলিপের কাছ থেকে জেনেছে। মি. ওয়াইজের কয়েকজন শিষ্যের ফটো আর রেকর্ডও দেখার সুযোগ হলো। কয়েকটা ছবি আর নাম দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল রানার—শের-এ-পাঠান, ফতে সিং, আলি।

ইউ.এস. কোস্ট গার্ড সার্ভিসের একটা রিপোর্ট রয়েছে লেফটেন্যান্টের কাছে, সেটা পড়তে দেয়া হলো রানাকে, সাথে ইউ.এস. কাস্টমস্ সার্ভিসের আরেকটা রিপোর্ট। বোঝা গেল, কোস্টগার্ড কড়া নজর রেখে আসছে আল-আমিনের ওপর। আর, সেন্ট পিটার্সবার্গে নোঙর ফেললেই কাস্টমস্ অফিসাররা তল্লাশী চালিয়েছে ইয়টে। না, সোনার কোন মোহর পাওয়া যায়নি।

গত পাঁচ মাসের রিপোর্ট থেকে জানা গেল, জ্যামাইকা বা কিউবা থেকে রওনা হয়ে প্রতিবার সেন্ট পিটার্সবার্গে, 'স্নেক ট্রেডার্স' নামে এক কোম্পানীর নিজস্ব জেটিতে নোঙর ফেলেছে আল-আমিন। স্নেক ট্রেডার্স সম্পর্কে জানা গেছে, দেশের বিভিন্ন চিড়িয়াখানায় এবং সরকারী-বেসরকারী রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে বিষাক্ত সাপ সরবরাহ করে ওরা। দেখেশুনে মনে হয় কোম্পানীটা কোন রকম বেআইনী কাজের সাথে জড়িত নয়। মালিক একজন তুর্কী, মার্কিন নাগরিক, ছয় বছর ধরে এ-দেশে আছে। নাম, ফারাদ বুঁজে। তার সাথে কথা বলে পুলিস জানতে পেরেছে, আল-আমিনের সাথে বেশ বড় অঙ্কের ব্যবসা করে সে। বিভিন্ন দেশ থেকে, বিশেষ করে জ্যামাইকা থেকে বিষাক্ত সাপ কিনে আনিয়ে বিক্রি করাই তার ব্যবসা।

রানা জানতে চাইল, সাপ কিনে কোথায় রাখে স্নেক ট্রেডার্স?

কোম্পানীর নিজস্ব ওয়্যারহাউজ আছে, সাপগুলো সেখানেই সব রাখা হয়। যাদের দরকার তারা ওখানে গিয়ে কিনে নিয়ে আসে। না, ফারাদ বুঁজের কোন ক্রিমিন্যাল রেকর্ড নেই।

ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের সাহায্য নিয়ে আল-আমিনের ওয়্যারলেস শুনেছে

এফ.বি.আই.। কিউবা বা জ্যামাইকা থেকে রওনা হবার আগে অল্প দু'চার সেকেন্ডের জন্যে অন করা হয় রেডিও, বাকি সময় অফ করা থাকে সেট। সংক্ষিপ্ত মেসেজ যা-ও প্রচার করা হয়, কোড করা। না, ওদের কোড ভাঙা সম্ভব হয়নি।

'সোনা ব্যবসায়ীরা চোখে অন্ধকার দেখছে,' মুখ হাঁড়ি করে বলল লেফটেন্যান্ট রটউড। 'তাগাদার পর তাগাদা দিচ্ছে ওরা, অথচ কিছুই আমরা করতে পারছি না। কয়েক হপ্তা থেকে সোনার মোহর বাঁধ ভাঙা পানির মত ঢেলে দেয়া হচ্ছে নিউ ইয়র্কে, আর সব জায়গার কথা বাদ দিন। ওপর মহল থেকে কড়া নির্দেশ, মি. ওয়াইজের গায়ে হাত দেয়া যাবে না। বসে বসে আঙুল চোষা ছাড়া আর কি করার আছে আমাদের, বলুন?'

'ওপর মহলের নির্দেশ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সে নির্দেশ সি.আই.এ. আর এফ.বি.আই.-ও পেয়েছে,' বলল ফিলিপ। 'আমরা দু'পক্ষ ঝগড়া করছি বটে, কিন্তু ঝগড়ার মধ্যেও যার যার মত ব্যবস্থা নিতে পারতাম, শুধু যদি না ওই নির্দেশ…।'

'এরকম একটা নির্দেশ দেয়ার কারণ?' আবার জিজ্ঞেস করল রানা।

'কারণটা রাজনৈতিক,' রানার হাতে একটা ফোল্ডার ধরিয়ে দিয়ে বলল ফিলিপ। 'এটা পড়লেই সব তুমি বুঝতে পারবে। মি. ওয়াইজের ডশিয়ে।'

লেফটেন্যান্টকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিল রানা, বাইরে বেরিয়ে এসে ফিলিপকে বলল, 'আজ সন্ধ্যায় হারলেমে যাচ্ছি আমরা, সুযোগ পেলে মি. ওয়াইজের আস্তানায় একবার ঢুঁ মেরে আসব।'

'কিন্তু সাবধান, রানা,' ফিসফিস করে বলল ফিলিপ। 'ডশিয়ে পড়লে বুঝতে পারবে কার বিরুদ্ধে লাগতে যাচ্ছ তুমি। যেতে যখন চাইছ, আপত্তি করব না, তবে বেশিক্ষণ থেকো না ওখানে। আমাদের ধারণা, কেসটা এখনও ঠিকমত পাকেনি। তাই, আপাতত মি. ওয়াইজের ব্যাপারে আমাদের নীতি হলো, ধরি মাছ না ছুঁই পানি।'

'কাল হয়তো আমরা সেন্ট পিটার্সবার্গে যাচ্ছি,' বলল রানা। 'তারপর জ্যামাইকাতেও একবার বেড়াতে যাব। আমার ধারণা, রহস্যের জট খুলতে হলে সবগুলো স্টেশন একবার করে ঘুরে আসা দরকার।'

'তোমার সাথে যাবার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। নিউ ইয়র্ক আর হারলেমে ডিউটি দিতে হবে আমাকে, অফিসের নির্দেশ।' রানাকে ওর হোটেলের সামনে নামিয়ে দিল ফিলিপ।

হারলেম।

প্রকাণ্ড একটা সুইচবোর্ড সামনে নিয়ে বসে আছে গোবিন্দ গোস্বামী। চেয়ারে বসে ঢুলছে সে। বোর্ডের প্রতিটি লাইন চুপ মেরে আছে। হঠাৎ করে ডান দিকে একটা আলো জ্বলে উঠল—আলোর আভায় লালচে হয়ে উঠল গোবিন্দের ফর্সা চেহারা। রেড সিগন্যাল, ভারি গুরুত্বপূর্ণ।

'ইয়েস, বস্,' হেডফোনে ফিসফিস করে বলল সে।

'আমার সবগুলো "চোখ"-কে সতর্ক করে দাও,' পরিষ্কার বাংলায় নির্দেশ এল। ভারী, গম্ভীর, থমথমে কণ্ঠস্বর। 'তিনজন লোক।' রানা, গিলটি মিয়া, আর ফিলিপের চেহারার বর্ণনা পেল গোবিন্দ। 'ছদ্মবেশ নিয়েও আসতে পারে। হয় আজ রাতে, কিংবা কাল কোন এক সময়। বিশেষ করে এক থেকে আট নম্বর এভিনিউয়ের ওপর নজর রাখতে বলবে। নাইট স্পটগুলোতেও লোক রাখতে হবে। ওদের গায়ে হাত দেয়া চলবে না। হারলেমে ওরা পা দেয়া মাত্র আমি যেন জানতে পারি।'

'ইয়েস, স্যার, বস্,' রুদ্ধশ্বাসে বলল গোবিন্দ। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

একগাদা প্লাগ হাতে নিয়ে কাজ শুরু করল সে। একটু পরই প্রকাণ্ড সুইচবোর্ড পিট পিট করা আলোয় জ্যান্ত হয়ে উঠল। পালা করে প্রতিটি লাইনের সাথে ফিসফিস করে, জরুরী ভঙ্গিতে কথা বলে গেল গোবিন্দ।

ডোরাকাটা একটা টাই পরল রানা। শার্টের ওপর লেদার হোলস্টার পরল, বগলের তিন ইঞ্চি নিচে ঝুলে থাকল সেটা। ল্যুগার থেকে এক এক করে বের করল আটটা বুলেট, তারপর আবার ওগুলো ম্যাগাজিনে ভরল। স্লাইড টেনে চেম্বারে একটা ভরে নিয়ে সেফটি ক্যাচ তুলে হোলস্টারে ভরল পিস্তল।

বাক্স খুলে নতুন একজোড়া জুতো বের করল। চামড়ার নিচে, সবটুকু ডগা জুড়ে লুকানো আছে ইস্পাতের পাত। মোক্ষম একটা লাথি ঝাড়তে পারলে মাংসের ভেতর সেঁধিয়ে যাবে দেড় ইঞ্চি।

রাত আটটায় নরম্যান'স বারে পৌঁছল ও। টেলিফোনে আগেই রিজার্ভ করা হয়েছে টেবিল, চীফ ওয়েটার পথ দেখিয়ে নির্জন এক কোণে নিয়ে এল ওকে। এরপর একজন ওয়েটার এল অর্ডার নেয়ার জন্যে, কিন্তু তাকে পরে আসতে বলে বিদায় করে দিল রানা। দু'এক মিনিটের মধ্যে এসে পড়ার কথা গিলটি মিয়ার।

কিন্তু গিলটি মিয়া নয়, একজন দরবেশ গোছের লোককে এগিয়ে আসতে দেখল রানা। ধবধবে সাদা, ছুঁচাল দাড়ি ভদ্রলোকের। মাথায় সাদা পাগড়ি, পরেও আছেন সাদা শেরওয়ানি। হাতে একটা ফাইবার গ্লাসের ওয়াকিং স্টিক। চেহারা থেকে একটা নূরানী জ্যোতি বেরোচ্ছে, দেখে মনে শ্রদ্ধা এসে যায়। ভদ্রলোক টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন, স্টিলরিমের চশমার ভেতর দিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন রানার দিকে। চেহারায় সবিনয় একটা ভাব নিয়ে কিছু বলতে গেল রানা।

'আমাকে চিনতে পারচেন না, স্যার?' বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল গিলটি মিয়া, কপালে হাত তুলে বারবার, ঘন ঘন সালাম করল রানাকে।

দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে বারের চারদিকে চট করে একবার চোখ বুলিয়ে নিল রানা। কেউ ওদেরকে লক্ষ করছে না। 'বসো,' মৃদু কণ্ঠে বলল ও। 'তোমাকে না বলেছিলাম, ছদ্মবেশের দরকার নেই?'

'কিন্তু আপনি যকন ফোনে কতাটা বললেন, আমার তকন এই সাজ ওব্যেশ হয়ে গেচে।'

'মানে?'

'আমি তো, স্যার, সেই সক্কাল থেকে ইসব পরে লিয়ে বসে আচি।'

হাসি চেপে অন্য প্রসঙ্গে চলে এল রানা, 'কি খাবে বলো।'

চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল গিলটি মিয়া। 'শালারা ধুমসে মাল টানচে। আমাদের জন্যে ঠাণ্ডা কিছু বলুন।'

ওয়েটারকে ডেকে দুটো সফট ড্রিঙ্কের জন্যে বলল রানা। 'কাল আমরা সেন্ট পিটার্সবার্গে যাচ্ছি,' ওয়েটার চলে যেতে গিলটি মিয়াকে বলল ও। 'আজ রাতের কাজ শেষ হলে ট্রেনের টিকেট কাটবে তুমি। এবার শোনো, কেসটা সম্পর্কে নতুন কি জানা গেছে।'

ওয়েটার ড্রিঙ্ক দিয়ে চলে গেল। নিচু গলায় কিছুক্ষণ কথা বলার পর চুপ করল রানা।

'আচ্ছা, স্যার, এ-দেশে বিচুটি পাতা পাওয়া যায় কিনা জানেন?'

গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়ে আরেকটু হলে বিষম খেতে যাচ্ছিল রানা। 'কেন?'

'জ্ঞান-পাপীটাকে ন্যাংটো করে ওর পোঁদে যদি বিচুটি পাতা ঘষে দেয়া যায়, বাপ বাপ করে সব কিছু স্বীকার যাবে।' রানার বুঝতে অসুবিধে হলো না, জ্ঞান-পাপী বলতে কাকে বোঝাচ্ছে গিলটি মিয়া। 'কিংবা সারা গা ব্লেড দিয়ে চিরে লবণের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলে···।' হঠাৎ চুপ করল সে, চেহারায় বিস্ময় আর অবিশ্বাস ফুটে উঠল। 'এত কাল তো শুনেচি সি.আই.এ., আর এব.বি.আই. এজেন্টরা নাকি ইবলিসের চেয়েও এক কাঠি বাড়া। তাহলে?'

'তাহলে কি?'

'ব্যাটাকে গ্রেফতার করে এনে ভুঁড়িটা ফাটিয়ে দিচ্চে না কেন?'

'উঁহুঁ,' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'মি. ওয়াইজের গায়ে হাত দেয়ার সাহস ওদের কারও নেই।'

'কেন?'

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল রানা, ডশিয়ে-র লেখাগুলো মনে পড়ে গেল। মি. ওয়াইজ সাধারণ ক্রিমিন্যাল নয়, নেপথ্যে সে একজন রাজনৈতিক নেতা। অদ্ভুত এক কৌশলে গোটা মার্কিন নিগ্রো জনগোষ্ঠির রক্ষাকর্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি রাজ্যে যেখানে যত রাজনৈতিক, সামাজিক, আন্দোলনমুখী প্রতিষ্ঠান আছে, সবগুলো মি. ওয়াইজের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের নগদ চাঁদা পায়। গাছের একটি পাতা নড়লে সৃষ্টিকর্তার যেমন তা অজানা থাকে না, তেমনি একজন নিগ্রো যদি কোন বিপদে পড়ে মি. ওয়াইজেরও তা অজানা থাকে না। বিপদগ্রস্ত লোকটার কাছে তার সাহায্য ঠিক সময় মত পৌঁছে যায়। খুনের আসামী, প্রত্যক্ষ সাক্ষী আছে, ইলেকট্রিক চেয়ার ঠেকাবার সাধ্য নেই কারও—কিন্তু দেখা গেল দেশের বিখ্যাত লইয়ারদের একজন তার পক্ষ নিয়ে লড়ছেন, বিচারক আর জুরীদের কিভাবে যেন তিনি বুঝিয়ে ফেললেন, সাক্ষীরা সব ভুয়া, কিংবা আসামী স্রেফ আত্মরক্ষার জন্যেই লোকটাকে খুন করতে বাধ্য হয়েছিল, ফলে মৃত্যুদণ্ড এড়িয়ে যেতে পারল সে। সবাই জানল, এই লইয়ারকে

নিয়োগ করেছিলেন মি. ওয়াইজ। নিগ্রো মহলে ধন্য ধন্য রব উঠল তাঁর নামে। এরকম ঘটনা একটা নয়, শয়ে শয়ে।

কিন্তু সে নিজে কখনও সামনে আসে না। সবাই শুধু জানে, কালা আদমিদের একজন ত্রাণকর্তার উদয় হয়েছে, তার নাম মি. ওয়াইজ, বিনা স্বার্থে মানুষের উপকার করাই তার জীবনের ব্রত। মাত্র মাস ছয়েকের মধ্যে তার খ্যাতি আর জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বি হয়ে উঠেছে। মি. ওয়াইজ বলতে মার্কিন নিগ্রোরা অজ্ঞান।

সিনেট বা কংগ্রেসে নিগ্রোদের যারা প্রতিনিধিত্ব করছে, সবাই ব্যক্তিগতভাবে মি. ওয়াইজকে চেনে। মি. ওয়াইজের বুদ্ধিপরামর্শ মত কাজ করে তারা। বিনিময়ে মি. ওয়াইজ তাদেরকে সব কাজে সমর্থন দেয়। আর মি. ওয়াইজের সমর্থন পাওয়া মানে গোটা নিগ্রো জনগোষ্ঠির মদত পাওয়া।

এফ.বি.আই. আতঙ্কের মধ্যে আছে, কারণ তাদের ধারণা মি. ওয়াইজ নিগ্রোদের একজোট করছে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে। তার নেতৃত্বে কালা আদমিরা যদি বেঁকে বসে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি ছোট বড় শহরে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে।

এফ.বি.আই. এখন মি. ওয়াইজের খারাপ দিকগুলো আবিষ্কার করতে ব্যস্ত। এমন সব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, শুনলে শিউরে উঠতে হয়। শুধু নিউ ইয়র্কে বা হারলেমে নয়, দেশের প্রতিটি রাজ্যের নিগ্রো-প্রধান এলাকাতে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে মাফিয়া, তাদের জায়গা দখল করে নিয়েছে মি. ওয়াইজের লোকজন। নারী-ব্যবসা, জুয়া, ড্রাগস—সব এখন তাদের কব্জায়। তাদের এলাকায় কোন শ্বেতাঙ্গ খুন হলে সাক্ষী দেয়ার মত কাউকে পাওয়া যায় না, প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস পেয়ে যায় আসামী। বেশিরভাগ সময় খুনীর পরিচয় পর্যন্ত উদ্ধার করতে পারে না পুলিস।

মি. ওয়াইজের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হলো ঘুষ। রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে পুলিস বিভাগের বড় কর্তা পর্যন্ত, সবাই তার কাছ থেকে নিয়মিত মাসোহারা পায়।

গোটা পরিস্থিতি খুব নাজুক। মন্ত্রী পর্যায়ের গোপন বৈঠকে ব্যাপারটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও হয়েছে। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। মি. ওয়াইজের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে হলে সাক্ষ্য প্রমাণ যোগাড় করতে হবে, অথচ তা যোগাড় করা সম্ভব নয়। কেস দাঁড় করানো না গেলে শুধু শুধু খুঁচিয়ে লাভ নেই, তাতে হিতে বিপরীত হবে—খেপে আগুন হয়ে যাবে নিগ্রোরা, সারা দেশে দাঙ্গা বেধে যাবে। এই ঝুঁকি নিতে রাজি নয় কেউ। বৈঠকে শুধু বলা হয়েছে, আরও কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখা যাক। যখন দেখা যাবে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে বসেছে, তখন ব্যবস্থা নেয়া হবে। ইতোমধ্যে লোকটার ওপর কড়া নজর রাখা হোক, আর তথ্য সংগ্রহ করা হোক।

'সাধু বেশে ব্যাটা বেশ জমিয়ে লিয়েচে,' পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনে মন্তব্য করল গিলটি মিয়া।

'হারলেমে বাসে করে যেতে হবে আমাদের,' বলল রানা। 'সন্ধের পর ড্রাইভাররা ট্যাক্সি নিয়ে ওদিকে যেতে চায় না, টাকা-পয়সা সব কেড়ে নেয়।'

ওয়েটারকে ডেকে বিল মিটিয়ে দিল ও।

বাস স্ট্যান্ডে পৌছে রানা জিজ্ঞেস করল, 'পিস্তলটা ভুল করে রেখে আসোনি তো?'

একগাল হাসল গিলটি মিয়া। 'ভুল করে লয়, ইচ্চে করেই রেকে এয়েচি।'

'কেন?'

'যদি ধরা পড়ি, আমার কাচে অস্তোর না পেলে ছেড়ে দেবে ওরা,' বলল গিলটি মিয়া। 'আমি বেরিয়ে এসে পুলিসে খবর দিতে পারব।'

মাথা নাড়ল রানা। 'পুলিস আমাদের কোন সাহায্যে আসবে না।'

ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে।

ক্যাথেড্রাল আর ফিফথ পার্কওয়েয়র মোড়ে, লাইটপোস্টের নিচে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনজন নিগ্রো। ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টিতে ভিজে গেছে ওরা, থমথমে চেহারায় কার ওপর কে জানে রাজ্যের আক্রোশ। আটটার দিকে সতর্ক-সংকেত পাবার পর থেকে এখানে দাঁড়িয়ে যানবাহনের ওপর কড়া নজর রাখছে ওরা। যারা আসবে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, তাদের চেহারার বর্ণনা পাওয়া গেছে।

'এবার তোমার পালা, ব্রাদার,' শক্ত-সমর্থ, খর্বকায় চেহারার লোকটা তার ডান পাশে দাঁড়ানো সঙ্গীকে বলল। কংক্রিটের সাথে চাকার ঘর্ষণে তীক্ষ্ণ আওয়াজ উঠল, ওদের সামনে ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল পাবলিক বাসটা।

'হয়রান হয়ে গেছি,' লেদার জ্যাকেট পরা লম্বা লোকটা বলল। তবে হ্যাটটা নামিয়ে চোখ ঢাকল সে, উঠে পড়ল বাসে। দু'পাশের সীটের মাঝখান দিয়ে এগোল সে, আরোহীদের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। নিগ্রোবেশী রানা, আর দরবেশ গিলটি মিয়াকে দেখে চোখ পিট পিট করল, কিন্তু থামল না। ওদের পিছনের সীটে বসল সে।

পরবর্তী স্টপেজে বাস থামতে সীট ছেড়ে উঠে পড়ল লোকটা, একবারও পিছন দিকে না তাকিয়ে দরজার কাছে পৌছল। বাস প্রায় ছেড়ে দিয়েছে আবার, লাফ দিয়ে নেমে পড়ল সে। কোনদিকে না তাকিয়ে হন হন করে একটা পাবলিক বুদের দিকে এগোল।

বুদে ঢুকে দরজা বন্ধ করল সে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে তার কাছ থেকে সব জেনে নিল গোবিন্দ গোস্বামী। সুইচ-বোর্ডের ডান দিকের একটা বোতাম টিপল সে।

'ইয়েস?' সেই গমগমে কণ্ঠস্বর শোনা গেল হেডফোনে।

'বস্, স্যার, ওদের একজনকে এইমাত্র হারলেমে দেখা গেছে।' ছদ্মবেশী রানার চেহারার বর্ণনা দিল গোবিন্দ। 'সাথে আরেকজন রয়েছে, কিন্তু এমন তার ছদ্মবেশ, আসল চেহারা আন্দাজ করা অসম্ভব। উত্তর দিকে আসছে ওরা।' বাসের নাম্বার, আর কখন কোথায় সেটা থামবে তার সম্ভাব্য সময়সূচীও জানাল সে।

কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা।

'ঠিক আছে,' তারপর অনুত্তেজিত, ভারী গলা শোনা গেল। 'অন্যান্য এভিনিউ

থেকে সব ''চোখ''-কে ফিরে আসতে বলো। নাইট স্পটগুলোকে সাবধান করে দিয়ে বলো, ওদের একজন ভেতরে ঢুকে পড়েছে। শের-এ-পাঠান, রড, ফতে সিং, ন্যাটা, চার্লি, বুচার, টিপু, আর ফ্রেজারকে বলো…' ঝাড়া পাঁচ মিনিট ধরে কথা বলে গেল সে। 'গট দ্যাট? রিপিট।'

'ইয়েস, স্যার, বস্।' শর্টহ্যান্ড প্যাডে চোখ রেখে নির্দেশগুলো রিপিট করল গোবিন্দ।

'রাইট।' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

চোখ জোড়া উত্তেজনায় চকচক করছে গোবিন্দর। এক মুঠো প্লাগ নিয়ে কাজ শুরু করল সে। তার নিচু গলা থেকে সারা শহরে পৌঁছে গেল জরুরী বার্তা।

সেভেন্থ এভিনিউয়ের একশো তেইশ নম্বর স্ট্রীটে ডাবল কয়েন বার অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট।

লোকজন অপেক্ষা করছিল, বাস থেকে নামার সাথে সাথে তাদের চোখে ধরা পড়ে গেল রানা আর গিলটি মিয়া, কিন্তু কেউ ওদের পিছু নিল না। ডাবল কয়েনের বাইরে এবং ভেতরেও 'চোখ' রয়েছে, তারাও ওদেরকে দেখল। প্রত্যেকের সাথে রয়েছে মিনি রেডিও, খানিক পরপর গোবিন্দের সাথে মেসেজ বিনিময় করছে তারা। শত্রুদের চেনার কোন উপায় নেই, চারপাশে উথলে ওঠা টেনশন সম্পর্কে কিছুই জানল না রানা।

রাতের হারলেমে জমাট আড্ডার জন্যে ডাবল কয়েনের খুব নাম-ডাক। ভেতরে ঢুকে ওরা দেখল লম্বা বারের সামনে সব ক'টা টুলে লোক বসে আছে, তবে দেয়াল ঘেঁষা একটা টেবিল এখনও খালি। মাঝখানে টেবিল নিয়ে দু'জন বসল ওরা দু'পাশে। ওয়েটাররা সবাই ব্যস্ত, এদিকে আসতে সময় নেবে। চারদিকে তাকিয়ে দু'চারজন শ্বেতাঙ্গকে দেখল রানা। খেলার জগতে খ্যাতি আছে, কাগজে ছবি দেখা যায়। নিগ্রো বক্সারদের ঘিরে থাকা লোকজনদের মধ্যে একজন শ্বেতাঙ্গ রিপোর্টারকেও দেখা গেল। বাইরে বৃষ্টি হলেও, ভেতরের গুমোট ভাব কাটেনি। সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে হেরোইন ও মারিজুয়ানার গন্ধ মিশে আছে। কর্কশ, বেসুরো গলায় আঞ্চলিক টানে কথা বলছে সবাই। নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ ঝগড়াটে সুর বা হঠাৎ করে হেসে ওঠা কানের ওপর অত্যাচার ছাড়া কিছু নয়। দেয়ালগুলোয় সাঁটা রয়েছে বক্সারদের ছবি, মেয়েদের প্রায় উলঙ্গ দু'একটা ছবিও দেখা যাচ্ছে।

'কিছু খেতে চাইলে শুয়োরের মাংস নিয়ে হাজির হবে না তো?' হঠাৎ জানতে চাইল গিলটি মিয়া।

মৃদু হাসল রানা। 'খাওয়াটা সেরে নিলে মন্দ হয় না,' বলল ও। 'কি খেতে চাও বলো।'

'শিক কাবাব, পরোটা, আর সম্ভব হলে… না, থাক।'

'থাকবে কেন, বলো আর কি খেতে চাও।'

একটু হেসে গিলটি মিয়া বলল, 'এক পো দই, নাহায় এক গ্লাস দুদ।'

ওয়েটার এল অর্ডার নিতে। প্যাকেট দুধের ব্যবস্থা করা যাবে, কিন্তু কাবাব

আর পরোটা মিলবে না। সূপ, মুরগীর রোস্ট, আর মাখন দেয়া পাঁউরুটি চাওয়া হলো গিলটি মিয়ার জন্যে। রানা ইংলিশ ডিশের অর্ডার দিল।

ডিনার পরিবেশন করছে ওয়েটার, নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল রানা, 'আজ রাতে মি. ওয়াইজ কোথায় বসছেন, জানো নাকি?'

পলকের জন্যে স্থির হয়ে গেল ওয়েটারের হাত। পরিবেশন শেষ করে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল সে, অস্ফুটে বলল, 'আমার বাল-বাচ্চা আছে, বস্।'

খেতে শুরু করেও চারদিকে নজর রাখল রানা, কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই ওর চোখে পড়ল না। জোড়ায় জোড়ায় নারী-পুরুষ মদ খেয়ে মাতাল হচ্ছে, অশ্রাব্য গাল পাড়ছে, ধস্তাধস্তির ফলে দু'একটা গ্লাস বা বোতল ভাঙছে, কিন্তু তাতে অন্যান্যদের কারও চিত্তবিক্ষেপ ঘটছে বলে মনে হলো না।

ডিনার শেষ করে যেন কিছু ঘটার অপেক্ষায় আরও কিছুক্ষণ বসে থাকল রানা। কিন্তু কিছুই ঘটছে না দেখে বিল মিটিয়ে দিয়ে সেভেন্থ এভিনিউয়ে বেরিয়ে এল ওরা। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি থামেনি। ফুটপাথের এক ধার দিয়ে, দোকানগুলোর আলো ঝলমল জানালা ঘেঁষে এগোল ওরা। রাত যত বাড়ে, হারলেমের রাস্তা-ঘাটে লোকজনের ভিড়ও তত বাড়ে, কথাটা মিথ্যে নয়। দোকানগুলো খদ্দেরে ঠাসা। দুনিয়ার উদ্ভট সব জিনিস পাওয়া যায় হারলেমে। আত্মমৈথুনের যান্ত্রিক সরঞ্জাম থেকে শুরু করে মর্ষকামীর প্রয়োজনীয় হাতিয়ার, সব। পাশাপাশি রয়েছে বই-পুস্তক—উন্নতির সাতটি সিঁড়ি, হাত দেখে ভাগ্য গণনা, বন্ধুত্ব অর্জনের সঠিক পথ, ইত্যাদি। কয়েকটা ফায়ার আর্মসের দোকানও দেখা গেল, বেচাকেনা চলছে। এগুলো সবই যে চোর-ডাকাত ঠেকাবার কাজে ব্যবহার করা হবে তা মনে করার কোন কারণ নেই। এ-দেশের যে-কোন এলাকার তুলনায় হারলেমে দৈনন্দিন গুলি বর্ষণের হার অনেক বেশি।

'কোতায় চলেচি, স্যার?'

'নাইট হেভেনে।'

নরক থেকে ওরা যেন স্বর্গে উঠে এল। নামের সাথে মিল আছে নাইট হেভেনের। শান্ত, ভদ্র পরিবেশ। কোমল সঙ্গীতের মূর্ছনায় এক নিমেষে দূর হয়ে যায় মনের অস্থিরতা। এখানেও বেশিরভাগ খদ্দের নিগ্রো, কিন্তু সবাই সুবেশ এবং মার্জিত। কয়েকজন স্বর্ণকেশীকে দেখা গেল, নিগ্রো প্রেমিকের কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে ফিসফিস করছে।

মনে হলো ওদেরকে দেখে খুশি হয়েছে হেড ওয়েটার। পথ দেখিয়ে এক কোণের একটা টেবিলের দিকে ওদেরকে নিয়ে চলল সে। ইঙ্গিতে শহরের খ্যাতিমান কয়েক ব্যক্তিকে দেখাল। নামকরা লেখক, রাজনীতিক, গায়ক, আর অভিনেতারা এখানে নিয়মিত আসেন। কিন্তু রানা যখন মি. ওয়াইজ সম্পর্কে জানতে চাইল, এমন ভাব করল হেড ওয়েটার যেন শুনতে পায়নি।

কফির অর্ডার দিল ওরা। ওয়েটার আসতে, আবার প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করল রানা।

'সরি, স্যার,' নিচু গলায় বলল ওয়েটার। 'ওই নামে কোন ভদ্রলোককে চিনি

না।'

সাড়ে দশটায় বেরিয়ে এল ওরা। নিশাচরদের ভিড় রাস্তায় আরও বেড়েছে। প্রচুর কলগার্ল দেখা গেল। তাদের একটা দলকে লাইটপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে ঢলাঢলি করতে দেখে চোখে হাত চাপা দিল গিলটি মিয়া, নাউজুবিল্লাহ না কি যেন পড়ল বিড়বিড় করে। হঠাৎ রানা টের পেল, কিছু মেয়ে গিলটি মিয়ার বেশভূষা দেখে কৌতুকবোধ করছে। ওকে ধরে যদি এখন টানা-হ্যাঁচড়া শুরু করে, আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কেলেঙ্কারী ঘটে যাবার আগেই সাবধান হওয়া দরকার। একটা ট্যাক্সি আসতে দেখে হাত তুলল ও।

হারলেমের স্যাভয় বলরুম গোটা আমেরিকায় বিখ্যাত। বেশিরভাগ আধুনিক নাচের জন্ম হয়েছে এখানে। জাজের তীর্থভূমি বলা হয় স্যাভয়কে।

বিশাল ড্যান্স ফ্লোরের কিনারায়, রেলিঙের কাছে একটা টেবিল দেয়া হলো ওদেরকে। এখানে নিগ্রোদের চেয়ে শ্বেতাঙ্গ বেশি, মেয়ে বেশি পুরুষের চেয়ে। যন্ত্র-সঙ্গীতের মাধুর্য কিছুটা সময় সম্মোহিত করে রাখল রানাকে।

ওর ধ্যান ভাঙল গিলটি মিয়ার একটা প্রশ্নে। তার চোখ জোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। 'ডবোল কয়েন, নাইট হেবেন, তারপর স্যাবয় নাচঘর—ব্যাপার কি, স্যার?'

'কিছু না,' বলল রানা। 'সবই এগুলো মি. ওয়াইজের ব্যবসা। ফিলিপ আমাকে একটা তালিকা দিয়েছে। সবখানে একবার করে ঢুঁ মারছি, দেখা যাক…।'

'তালিকা তো, স্যার আমার কাচেও রয়েচে।'

'মানে?'

'আপনাকে বললাম না, সেদিন দু'আঙুলের একটা কাজ করেচি? ওই যে, জেসি'স বারে ঢোকার সময় মার খেলাম?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি তো বললে মানিব্যাগটায় তেমন কিছু নেই।'

'একটা কাগজের কতা আপনাকে বলা হয়নি। ডবোল কয়েন, নাইট হেবেন, স্যাবয়, মিনার্ভা, এই রকম অনেক নাম লেকা আচে তাতে; পেত্যেকটা নামের পাশে একটা করে দিন লেকা আছে—শনিবার, রোববার, সোমবার, এই রকম।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা, তারপর বলল, 'তুমি কি ভাবছ বুঝতে পারছি। মি. ওয়াইজ কোন্ দিন কোন্ বার বা রেস্তোরাঁয় থাকবে এটা তার তালিকা হতে পারে, এই তো? আজ সোমবার, তাই না?'

শেরওয়ানির পকেট থেকে নরম একটা মানিব্যাগ বের করল গিলটি মিয়া। কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে বলল, 'বি মাই গেস্ট—সোমবার।'

নামটা শুনেই আড়ষ্ট বোধ করল রানা। গিলটি মিয়াকে নিয়ে বি মাই গেস্টে যাওয়া ভারি অস্বস্তিকর। হারলেমের সবচেয়ে হট স্ট্রিপটিজ দেখানো হয় ওখানে। একটা বুদ্ধি বের করল ও, বলল, 'ওখানে আমরা একসাথে ঢুকব না। ঢোকার পর তুমি বারের সামনে বসবে, আমি একটা টেবিল পাবার চেষ্টা করব। কোন রকম বিপদ দেখলে…?'

'নও দো গিয়ারা?'

'হ্যাঁ, ঝেড়ে দৌড়। তবে পুলিসকে কিছু জানিয়ো না, এই নাম্বারটা রাখো, ফিলিপ ওয়াটসনকে একবার টেলিফোন কোরো।'

'চলুন তাহালে…'

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'এগারোটা। সাড়ে বারোটার আগে বি মাই গেস্ট খুলবে না। চলো, ডায়মন্ড ক্যাসিনোয় গিয়ে পিয়ানো শুনি।' উঠে পড়ল ও, কিন্তু আবার বসল।

'একটা কতা, স্যার।'

'বলো।'

'রোগা-পটকা হতে পারি, কিন্তু বেটাছেলে তো, তাছাড়া চুরিও করিনি, ঝেড়ে দৌড় দিতে…আমার লজ্জা করবে।'

'কথা বললে তো শোনো না,' তিরস্কার করল রানা। 'পিস্তল আনোনি, কাজেই বিপদ থেকে দূরে সরে থাকতে হবে তোমাকে।' এক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করল ও, তারপর হাত দিল শোল্ডার হোলস্টারে।

টেবিলের তলায়, নিজের উরুতে ভারী, শক্ত কিছুর স্পর্শ পেল গিলটি মিয়া। 'ল্যুগারটা রাখো,' বলল রানা।

অবাক হয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে গিয়েও রানার থমথমে চেহারা দেখে চুপ করে থাকল গিলটি মিয়া।

বড় সুইচবোর্ডটা এখন প্রায় নিঃশব্দ হয়ে গেছে। রানা আর গিলটি মিয়ার প্রতি মুহূর্তের খবর পাচ্ছে অপারেটর গোবিন্দ গোস্বামী। ডাবল কয়েন থেকে নাইট হেভেন, সেখান থেকে স্যাভয় বলরুম, ওখান থেকে ডায়মন্ড ক্যাসিনোয় এসেছে ওরা।

শেষ খবর এসেছে বারোটায়। তারপর আধঘণ্টা পেরিয়ে গেল, বোর্ড স্তব্ধ হয়ে আছে।

সোয়া বারোটায় জ্যান্ত হয়ে উঠল বি মাই গেস্টের হাউজফোন। হেড ওয়েটার রিসিভার ধরল। জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ওদের চেহারার বর্ণনা আগেই পেয়েছ। ওরা আসছে। লাল কার্পেট সম্বর্ধনা, ভি.আই.পি. টেবিল।'

'ইয়েস, স্যার, বস্,' শান্ত সুরে বলল হেড ওয়েটার, একটা ঢোক গিলল। ড্যান্স-ফ্লোরের ওপর দিয়ে ছুটল সে, ডান কোণের একটা টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। দামী লাল কার্পেটের ওপর বসানো রয়েছে টেবিলটা, একটা মোটা পিলার আড়াল করে রাখায় কামরার বেশিরভাগ জায়গা থেকে দেখা যায় না, সার্ভিস এন্ট্রান্সের পাশেই। তবে টেবিলটা থেকে ড্যান্স-ফ্লোর আর তার উল্টোদিকের ব্যান্ডপার্টি পরিষ্কার দেখা যায়।

টেবিলে মানুষ রয়েছে, প্রেমিকাকে নিয়ে এক শ্বেতাঙ্গ যুবক।

'দুঃখিত, স্যার,' হেড ওয়েটার বলল। 'একটা ভুল হয়ে গেছে। টেবিলটা আগেই আরেক ভদ্রলোক রিজার্ভ করেছেন। একজন সাংবাদিক।'

যুবক তর্ক জুড়ে দিল।

কিন্তু হেড ওয়েটার প্রায় ধমক মেরে চুপ করিয়ে দিল তাকে। 'ভুল হতে পারে না? এই যে, রিটার, এঁদেরকে ফার্স্টক্লাস একটা টেবিলে নিয়ে যাও। প্রথম রাউন্ড ড্রিঙ্ক ফ্রী। রবসন,' আরেক ওয়েটারকে হাতছানি দিয়ে ডাকল সে, 'টেবিল পরিষ্কার করো। দু'জনের জন্যে সাজাও।' প্রেমিকাকে নিয়ে ওয়েটারের পিছন পিছন চলল যুবক, বিনা পয়সায় ড্রিঙ্ক পাবে শুনে খুশি হয়ে গেছে।

ভি.আই.পি. টেবিলে একটা খুদে রিজার্ভ সাইনবোর্ড রাখল হেড ওয়েটার, তারপর পর্দা ঢাকা প্রবেশ পথের কাছে নিজের আসন উঁচু ডেস্কের কাছে ফিরে গেল।

ইতোমধ্যে মি. ওয়াইজ আরও দু'বার কথা বলেছে হাউজফোনে। প্রথমবার অনুষ্ঠান পরিচালকের সাথে।

'প্রিন্সেস আমিনার অনুষ্ঠান শেষ হলে আলো নিভিয়ে দেবে।'

'ইয়েস, স্যার, বস্।'

দ্বিতীয়বার চারজন লোকের সাথে। বেসমেন্টে বসে জুয়া খেলছিল তারা। প্রত্যেকের সাথে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলল সে।

চার

গাঢ় বেগুনি আর সবুজ নিওনে বড় করে লেখা, বি মাই গেস্ট। ট্যাক্সি থেকে নেমে একটা সিগারেট ধরাবার ছুতোয় চারদিকটা ভাল করে দেখে নিল রানা। কেউ ওকে অনুসরণ করে আসেনি, আশপাশের কেউও ওর দিকে তাকিয়ে নেই। ধাপ দুটো টপকে সুইংডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল ও, হাত বাড়াল পর্দার দিকে।

কান ঝালাপালা করা কনসার্ট, আর গরম বাতাস যেন একটা ধাক্কা দিল। হ্যাট-চেকার মেয়েগুলো চোখে দুষ্টামির ঝিলিক নিয়ে রানার গায়ে প্রায় ঢলে পড়ার উপক্রম করল।

'আপনার টেবিল রিজার্ভ করা আছে, স্যার?' জানতে চাইল হেড ওয়েটার।

'না,' বলল রানা। 'দেখো না, যদি কোন টেবিল খালি থাকে, প্লীজ।'

ডেস্কে মেলা টেবিল-প্ল্যানের ওপর ঝুঁকে পড়ল হেড ওয়েটার। এক সেকেন্ড দ্বিধায় ভোগার পর একটা সিদ্ধান্তে এল সে। প্ল্যানের এক কোণে পেন্সিল দিয়ে একটা ক্রস চিহ্ন আঁকল। 'গেস্টরা আসেনি। ওদের জন্যে তো আর টেবিলটা আমি অনন্ত খালি রাখতে পারি না। আমার সাথে আসুন, স্যার, প্লীজ।' কার্ড ধরা হাতটা মাথার ওপর তুলে এগোল সে, পিছনে রানা।

লাল কার্পেটের ওপর উঠে এল রানা। এরই মধ্যে দু'জন ওয়েটার এগিয়ে এসে একটা বাদে বাকি চেয়ারগুলো সরিয়ে নিতে শুরু করেছে। রিজার্ভ সাইনটাও তুলে নেয়া হলো।

'রিটার,' হেড ওয়েটার বলল, 'ভদ্রলোকের অর্ডার নাও।' চলে গেল সে।

চিকেন স্যান্ডউইচ, আর বিয়ার চাইল রানা। বি মাই গেস্টে কোল্ড ড্রিঙ্ক বা

কফি পাওয়া যায় না। ওয়েটার চলে যেতে চারদিকে তাকাল রানা। কনসার্ট থেমে গেছে। মঞ্চ থেকে লাইন দিয়ে বিদায় নিল দলটা। মঞ্চ ফাঁকা, কিন্তু টেবিল ছেড়ে ফ্লোরে চলে এসেছে দশ-বারো জন যুবক-যুবতী, নাচের ভঙ্গিতে হাঁটাহাঁটি করছে তারা। কেউ হঠাৎ ক্যাঙারুর মত লাফ দিয়ে চিৎকার করে কোন গানের কলি আওড়াচ্ছে, কেউ কোমর আর পিঠ দুলিয়ে টুইস্ট নাচছে।

মঞ্চের মেঝে মোটা কাঁচ দিয়ে মোড়া, কাঁচের নিচ থেকে উঠে আসছে গাঢ় লাল রঙের আলো। কনসার্ট পার্টি মঞ্চ থেকে নেমে যেতে আলোটা নিভে গেল। তার বদলে, সিলিং থেকে নেমে এল পেন্সিলের মত সরু আলোর বর্শা, আলোকিত করে তুলল ফুটবলের চেয়েও বড় আকৃতির কাঁচের বলগুলোকে, দেয়াল ঘেঁষে খানিক পর পর ঝুলছে ওগুলো। প্রতিটি বল আলাদা রঙের—লাল, সোনালি, নীল, সবুজ আর বেগুনি। আলো পড়তেই ওগুলোকে এক একটা রঙিন সূর্যের মত দেখাল। কালো রঙের বার্নিস করা দেয়ালে ওগুলোর প্রতিবিম্ব পড়েছে, প্রতিবিম্ব পড়েছে লোকজনের ঘাম চকচকে মুখেও। এক জোড়া আলোর মাঝখানে যে লোকটা বসে আছে তার মুখের দু'পাশ দু'রঙের—একটা দিক হয়তো সবুজ, আরেক দিক লাল। একেবারে কাছে যারা রয়েছে তাদের ছাড়া এই আলোর ছলচাতুরিতে কারও চেহারা চিনতে পারা প্রায় অসম্ভব। কোন কোন আলোয় হয়তো একটা মেয়ের লিপস্টিক কালো হয়ে উঠেছে। কিছু আলো কারও মুখ গাঢ় রঙে জ্বলজ্বলে করে তুলেছে, কিন্তু সেই মুখেরই অপর পাশটা পানিতে ডোবা লাশের মত নিষ্প্রভ, ফ্যাকাসে।

গোটা দৃশ্যটা প্রায় ভৌতিক এবং রোমাঞ্চকর।

খুব যে একটা বড় কামরা তা নয়, ষাট ফুট বাই ষাট ফুটের মত হতে পারে। পঞ্চাশটার মত টেবিল, খদ্দেররা যেন টিনের ভেতর ঠাসাঠাসি করা মুড়ি। গুমোট ভাবটা দম বন্ধ করে আনে, সিগারেটের ধোঁয়া আর প্রায় দুশো নিগ্রোর ঘামের গন্ধে ভারী হয়ে আছে বাতাস।

কেউ চুপ করে নেই। চড়া গলায় কথা বলছে সবাই। খিলখিল ছাড়া হাসি নেই মেয়েদের। মাঝে মধ্যে পুরুষ আর নারীকণ্ঠের ঝগড়া শোনা যায়, তারপরই ঠাস করে চড় মারার আওয়াজ।

'প্রিন্সেস কোথায়, প্রিন্সেস? চলে এসো আঙিনা। দিগম্বরী সাজো…!'

মাঝে মধ্যেই ফ্লোর থেকে লাফ দিয়ে মঞ্চে উঠে পড়ছে কোন মেয়ে বা কোন ছেলে। উঠেই ধেই ধেই নাচতে শুরু করছে সে। বন্ধু-বান্ধবরা হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে। চারদিক থেকে কুকুর-বিড়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে। রানার কাছাকাছি টেবিল থেকে এক ছেলে মুখের ভেতর আঙুল পুরে শিস দিল। অনুষ্ঠান পরিচালক তেড়ে এল, কৃত্রিম রাগে ঘুসি বাগিয়ে। মঞ্চ ফাঁকা হয়ে গেল, কিন্তু পরিচালক অদৃশ্য হতেই আবার একটা মেয়ে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল।

চারদিক থেকে চিৎকার জুড়ে দিল ছেলেরা, 'খোলো, খোলো, খুলে ফেলো! গেট হট, বেবি! শেক ইট, শেক ইট।' পর্দা সরিয়ে আবার ছুটে আসতে দেখা গেল পরিচালককে।

রানার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

ঠিক একটায় ভেতরে ঢুকল গিলটি মিয়া। কারও দিকে তাকাল না সে, এমনকি হেড ওয়েটারের কথা শোনার জন্যে দাঁড়ালও না, হন হন করে বার কাউন্টারের দিকে এগোল। 'এক আউন্স রাম দাও দেকি। দেকো, পানি-টানি আবার মিশিয়ো না!' কাউন্টারের গায়ে হেলান দিয়ে বারম্যানকে অর্ডার করল সে।

বেরোবার আরও হয়তো পথ থাকতে পারে, কিন্তু রানা শুধু তিনটে দেখতে পেল। একটা দিয়ে ওরা ঢুকেছে, দ্বিতীয়টা ওর পিছনে সার্ভিস এন্ট্রান্স, আর তৃতীয়টা মঞ্চের পিছনে।

হঠাৎ হাততালির শব্দ। মঞ্চে উদয় হয়েছে অনুষ্ঠান-পরিচালক—লম্বা এক নিগ্রো যুবক, পরনে তারই মত কালো কমপ্লিট স্যুট, বাটনহোলে টকটকে লাল গোলাপ। মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত দুটো একটু ওপরে তুলল সে। নিঃসঙ্গ একটা স্পটলাইটের সাদা আলো পড়ল তার ওপর। কামরার বাকি অংশ অন্ধকারে ঢাকা।

নিস্তব্ধতা।

'ভাই এবং বোনেরা,' ঘোষণা করল পরিচালক, দু'কান পর্যন্ত লম্বা হাসি দেয়ায় সোনালি আর সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল, 'আপনারা যা চাইছেন!'

তুমুল করতালি, তার সাথে কুকুর-বিড়ালের ডাক।

মঞ্চের বাঁ দিকে ফিরল পরিচালক। ডান হাতটা লম্বা করে দিল। আরও একটা স্পটলাইট পড়ল মঞ্চে, আলোকিত হলো ড্রাম-পার্টি। 'মি. ওয়াইল্ড সাইকী, অ্যান্ড হিজ ড্রাম!'

আবার হাততালি।

দাঁত বের করে হাসছে চারজন নিগ্রো, পরনে আগুন-রঙ শার্ট আর দুধ সাদা ট্রাউজার। প্রত্যেকের সামনে একটা করে ব্যারেল আকৃতির ড্রাম। লোকগুলো লম্বা চওড়া, পেশীবহুল শরীর। দলনেতা উঠে দাঁড়িয়ে মঞ্চের কিনারা পর্যন্ত হেঁটে এসে দর্শকদের উদ্দেশে মাথা নত করল।

দু'সেকেন্ড পর প্রথম বাড়ি পড়ল ড্রামে। আঙুলের ডগা দিয়ে মৃদু টোকা দিচ্ছে ড্রামাররা। কোমল শব্দ, এলোমেলো ছন্দ।

'এবার বন্ধুরা,' বলল পরিচালক, এখনও তাকিয়ে আছে ড্রামারদের দিকে, 'প্রিন্সেস...,' এক সেকেন্ড বিরতি নিল সে, 'প্রিন্সেস আমিনা!' শেষ শব্দটা আর্তচিৎকারের মত শোনাল। নিজেই হাততালি দিতে শুরু করল সে।

উল্লাসে ফেটে পড়ল দর্শক। ড্রামগুলোর পিছনে বিস্ফোরিত হলো দরজা, বিশালদেহী দু'জন নিগ্রো মেয়ে ঢুকল মঞ্চে। প্রায় নগ্নই বলা যায়, শুধু কোমর থেকে সোনালি জরির চওড়া ঝালর ঝুলছে। দু'জন মিলে ধরাধরি করে নিয়ে এল প্রিন্সেস আমিনাকে, প্রিন্সেস তার পেলব বাহু জোড়া দিয়ে ওদের গলা জড়িয়ে ধরেছে। মাথা ঢেকে রেখেছে অস্ট্রিচ পাখির কালো পালক, চোখ দুটোয় কালো পর্দা লাগানো, জোড়া ফুটোর ভেতর শুধু মণি দুটো দেখা যায়।

মঞ্চের মাঝখানে নামানো হলো প্রিন্সেসকে। তাকে মাঝখানে রেখে দর্শকদের উদ্দেশে মাথা নোয়াল মেয়ে দুটো। দু'পা সামনে বাড়ল প্রিন্সেস, অনুসরণ করল

স্পটলাইট। অন্ধকারে মিলিয়ে গেল মেয়ে দুটো।

পরিচালকও অদৃশ্য হয়েছে।

ড্রামের কোমল ধ্বনি ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

হাত দুটো গলার কাছে তুলল প্রিন্সেস, কালো পালকের আবরণ খসে পড়ল তার শরীরের সামনে থেকে, দু'পাশে পাঁচ ফুট উঁচু ফণার মত আকৃতি নিল সেটা। পিছন দিকে হাত নিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে নাড়ল সে, ফণার আকৃতি বদলে গিয়ে ময়ূরের একটা পেখম হয়ে উঠল। বিবস্ত্রই বলা যায়, শুধু ভি আকৃতির একটা কালো লেস রয়েছে নাভির নিচে, আর দুই স্তনের ওপর দুটো সোনালি তারকা চিহ্ন। গায়ের রঙ ঘিয়ের মত, ঢেউ খেলানো শক্ত শরীর, অপূর্ব। সামান্য তেল মেখেছে, চকচক করছে সাদা আলোয়।

কামরার ভেতর পিন-পতন স্তব্ধতা। ড্রামের শব্দ বাড়তে শুরু করল। পালসের সাথে তাল রেখে ঘন ঘন বাড়ি পড়ছে।

ড্রামের ছন্দের সাথে মিল রেখে প্রিন্সেসের পেটে ঢেউ উঠল, কালো পালকগুলো ঘন ঘন ছুটোছুটি করল সামনে থেকে পিছনে। হঠাৎ দ্রিম করে বিস্ফোরিত হলো চার নম্বর ড্রাম, এতক্ষণ সেটা ব্যবহার করা হয়নি। বিকট শব্দের সাথে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেলো প্রিন্সেস। তিনটে ড্রামের দ্রুতগতি আওয়াজের সাথে ছন্দ বজায় রেখে সে তার নিতম্ব ঘোরাচ্ছে, শরীরের ওপরের অংশ স্থির। শুধু চার নম্বর ড্রাম হঠাৎ হঠাৎ দ্রিম করে উঠলে প্রচণ্ড ভাবে ঝাঁকি খাচ্ছে গোটা শরীর, আর প্রতিবার ঝাঁকি খাবার পর কাঁপুনি থামতে পনেরো বিশ সেকেন্ড সময় নিচ্ছে।

এবার তার পা আর কাঁধ নড়তে শুরু করল। আরও জোরে, আরও দ্রুত বাড়ি পড়ছে ড্রামে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ একই সাথে ঢেউ তুলছে না, প্রতিটি অঙ্গের যেন আলাদা প্রাণ আছে, এক একটা সাড়া দিচ্ছে এক এক তাল আর ছন্দে।

ভেজা ভেজা ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেল প্রিন্সেসের, মুখের ভেতর ঝিক করে উঠল সাদা দাঁত। নাকের ফুটো ফুলে উঠল।

ড্রামের ছন্দে আর কোন বিরতি থাকল না, প্রতিটি আওয়াজ এখন আর আলাদা করে শোনা অসম্ভব। অস্থির, উন্মাদ হয়ে উঠল শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ, ওগুলো যেন প্রিন্সেসের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। পালকের আবরণ ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। সারা শরীর কাঁপতে শুরু করল। হাত দুটো উঠে গেল মাথার ওপর, সেভাবেই থাকল। বিরতিহীন ঢেউ উঠছে পেটে। পা দুটো ফাঁক করল সে। কোমরটা বড়সড় একটা বৃত্ত রচনা করে চলেছে, বারবার। আচমকা ডান স্তন থেকে তারকা-চিহ্নটা খুলে নিল সে, ছুঁড়ে দিল দর্শকদের দিকে। এই প্রথম আওয়াজ উঠল অন্ধকার থেকে, চাপা একটা গোঙানি। পরমুহূর্তে আবার নিস্তব্ধতা।

এবার দ্বিতীয় স্তন উন্মুক্ত হলো। আবার গুঙিয়ে উঠল দর্শক। কান ফাটানো ড্রামের আওয়াজে টেবিল-চেয়ার কাঁপতে শুরু করল। ড্রামারদের মুখ বেয়ে নামল ঘামের ধারা। হাতগুলো আলোর ঝলক যেন, ওঠা-নামা চোখে ধরা পড়ে না। চার জোড়া চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসার উপক্রম করেছে, মাথাগুলো এক দিকে কাত করা, যেন কিছু শোনার চেষ্টা করছে ওরা। প্রিন্সেসের দিকে কেউ তাকাচ্ছে

না।

হাঁপাতে শুরু করেছে দর্শকরা, চোখে কারও পলক নেই।

এখন প্রিন্সেসের শরীরও ঘামে চকচক করছে। কাঁপুনি থেমে গেছে তার, প্রতি মুহূর্তে শুধু ঝাঁকি খাচ্ছে। মুখ খুলে গেল, চাপা চিৎকার করে উঠল। সাপের মত এঁকেবেঁকে নেমে এল হাত দুটো, হ্যাঁচকা এক টানে নাভির নিচে থেকে খসিয়ে আনল ভি আকৃতির লেস, ছুঁড়ে দিল দর্শকদের দিকে। প্রিন্সেসের পরনে এখন তিনটে সুতোয় বাঁধা গোলাপ আকৃতির কালো সিল্ক ছাড়া কিছু নেই। ড্রামের দ্রিম দ্রিম আওয়াজে যৌনতার ইঙ্গিত। আবার নরম একটা চিৎকার বেরিয়ে এল আমিনার গলা থেকে, ভারসাম্য রক্ষার জন্যে হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে দিল সে। শরীরটা মেঝের দিকে নেমে এল, তারপর উঠল—ঘন ঘন।

দর্শকদের হাঁপানোর আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেল রানা, কেউ কেউ শুয়োরের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে। ও নিজেও টেবিলের কিনারা শক্ত করে ধরে আছে। মুখের ভেতরটা শুকনো।

ড্রামের আওয়াজ মন্থর হয়ে এল। প্রতিটি বাড়ির সাথে আরও নিচু হলো প্রিন্সেসের শরীর, নিচু হলো আর ঝাঁকি খেলো। দ্রিম, এক সেকেন্ড বিরতি, দ্রিম।

ভাঁজ করা হাঁটু যথাসম্ভব ফাঁক করে মেঝেতে রাখল আমিনা, তার শরীরের ওপরের অংশ পিছন দিকে ঢলে পড়তে শুরু করল। অশ্লীল প্রস্তাব আর মন্তব্যের ঝড় বইছে চারদিক থেকে। প্রিন্সেসকে পাবার জন্যে প্রচণ্ড ব্যাকুলতা অনুভব করছে প্রত্যেকে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ দেখতে চায় ওরা ওকে।

মঞ্চে আবার উদয় হলো পরিচালক। আলো পড়ল তার গায়ে। 'ঠিক আছে, ভায়েরা, ঠিক আছে।' তার কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে। হাত দুটো মেলে দিয়ে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল সে। 'প্রিন্সেস আমিনা রাজি হয়েছেন!'

উল্লাসে মাতোয়ারা হয়ে উঠল দর্শক। প্রিন্সেস আমিনা এবার সম্পূর্ণ নগ্ন হবে।

'ফেলে দাও, আমিনা! খুলে দেখাও, সুন্দরী! জলদি, জলদি!'

দ্রিম করে আওয়াজ করল ড্রাম।

'কিন্তু, বন্ধুরা,' চিৎকার করে বলল পরিচালক, 'আফটারঅল উনি একজন প্রিন্সেস, অন্ধকার ছাড়া কিভাবে নিজেকে তিনি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করেন!'

দর্শকরা হতাশায় গুঙিয়ে উঠল।

অন্ধকার হয়ে গেল কামরা।

এই অনুষ্ঠানের বোধহয় এটাই রীতি, ভাবল রানা।

হঠাৎ করে ওর সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল।

দর্শকদের শোরগোল দূরে সরে যাচ্ছে, দ্রুত। সেই সাথে মুখে ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ পেল রানা। মনে হলো, যেন ডুবে যাচ্ছে ও।

'আরে! কী হলো!'

দড়াম করে আওয়াজের সাথে কি যেন বন্ধ হয়ে গেল মাথার ওপর। পিছন দিকে একটা হাত বাড়াল রানা। এক ফুট পিছনে দেয়ালটা ওপর দিকে দ্রুত উঠে যাচ্ছে।

'আলো,' শান্ত, অচেনা একটা কণ্ঠস্বর।

একই সময়ে রানার দুটো হাত কনুইয়ের ওপর চেপে ধরল কে যেন। চাপ পড়ল কাঁধের ওপর, জোর করে চেয়ারে বসিয়ে রাখা হলো ওকে।

খুট্ করে আওয়াজের সাথে জ্বলে উঠল আলো। আপনা থেকে বন্ধ হয়ে গেল চোখ, জোর করে একটু ফাঁক করল রানা। সামনে টেবিল নিয়ে এখনও চেয়ারে বসে আছে ও। কিন্তু বি মাই গেস্টের ডান্স-ফ্লোর নয়, চৌকো একটা সেলে রয়েছে ও। ওর সামনে, টেবিলের ওদিকে বিশালদেহী এক নিগ্রোকে দেখা গেল, হাতে পিস্তল নিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। দু'পাশে আরও দু'জন রয়েছে—একজন নিগ্রো, অপরজন সম্ভবত শিখ। হাতে পিস্তল।

হিসস শব্দে থামল হাইড্রলিক লিফট। মুখ তুলে ওপর দিকে তাকাল রানা। প্রায় ত্রিশ ফিট ওপরে রয়েছে ট্র্যাপ-ডোর। ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হলো না। আসলে লাল কার্পেটে মোড়া লিফটের মেঝেতে সাজানো হয়েছিল চেয়ার-টেবিল, বোতাম টিপে লিফটটাকে নিচে নামিয়ে আনা হয়েছে।

সামনের নিগ্রোটা বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল। 'জার্নিটা কেমন লাগল, মিস্টার? একেই আমরা লাল-গালিচা সম্বর্ধনা বলি।'

'তবিয়ত ঠিক হ্যায় না?' ডান পাশ থেকে জিজ্ঞেস করল শিখ লোকটা।

পেশী ঢিল করে দিল রানা। অপেক্ষা করছে।

বাঁ পাশে আরেক নিগ্রো, শক্ত করে ধরে আছে ওর হাত দুটো। 'সার্চ হিম!' বলল সে, মনে হলো সে-ই দলনেতা। মাথা কামানো, গায়ে অসুরের শক্তি রাখে লোকটা। কনুইয়ের কাছ থেকে নিচের দিকে রানার হাত অবশ হয়ে যাচ্ছে।

রানার হার্ট লক্ষ্য করে ধরা পিস্তলটা নিশ্চয়ই তার খুব শখের জিনিস। কালো আঙুল আর স্টকের মাঝখানে চকচক করছে মাদার-অভ-পার্ল। লম্বা আটকোনা ব্যারেলটাও কারুকাজ করা। টেবিলের ওদিক থেকে এগিয়ে এল বিশালদেহী, রানার পেটে পিস্তলের মাজল্ চেপে ধরল। সেফটি ক্যাচ রিলিজ করা রয়েছে।

'এত ভয় কেন? গায়ে না ঠেকালেও মিস করবে না,' বলল রানা।

'শাট আপ!' লোকটা বাঁ হাত দিয়ে নিখুঁতভাবে সার্চ করল রানাকে। পা, ঊরু, পিঠ, দু'পাশ, কোথাও বাদ রাখল না। 'শোল্ডার হোলস্টার রয়েছে, কিন্তু খালি, বুচার।'

ভুরু কুঁচকে উঠল বুচার অর্থাৎ দলনেতার। 'তারমানে সঙ্গীর কাছে আগেই পাচার করে দিয়েছে ওটা।' শিখ লোকটার দিকে ফিরল সে। 'ফতে সিং, ওপরে যাও!' এক সেকেন্ড চিন্তা করল সে। 'বসের নির্দেশ, বিরক্ত না করলে ওর সঙ্গী লোকটাকে কিছু বলার দরকার নেই। এলাকা ছেড়ে ভালয় ভালয় যদি চলে যায়, যাক। তবে দেখতে পেলে অস্ত্রটা কেড়ে নিয়ো।'

'জো হুকুম!' চুল ঢাকা কাঁধ ঝাঁকাল ফতে সিং।

ধরে দাঁড় করানো হলো রানাকে। টেবিলের একটা পায়ায় পা বাধিয়ে হ্যাঁচকা টান দিল ও। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে প্রচণ্ড এক থাবড়া মারল বুচারের মুখে। কাঁচের প্লেট আর গ্লাস ভাঙার আওয়াজ হলো। ফ্রেজার পিছিয়ে যাবার আগেই

তার হাঁটুর নিচে হাড়ের ওপর প্রায় গেঁথে গেল রানার জুতোর ডগা। ছোট্ট জায়গায় তুমুল ধস্তাধস্তি হলো বটে, কিন্তু রানাকে ছাড়ল না বুচার। হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল রানা, ওর মাথার পিছনে পিস্তলের মাজল্ চেপে ধরেছে ফতে সিং।

ফ্রেজারের ট্রাউজারে রক্ত, এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। হাতের পিস্তলটা রানার দিকে তাক করা। বুচারের ঠোঁটের কোণ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে।

'ওয়াক!' খেঁকিয়ে উঠল বুচার, ঠেলা দিয়ে রানাকে ঘোরাল সে।

পিঠে ধাক্কা খেয়ে দেয়ালের গায়ে পড়ল রানা, দেয়ালের একটা অংশ পিছন দিকে সরে গিয়ে বেরোবার পথ করে দিল ওদেরকে। সামনে লম্বা একটা প্যাসেজ।

পাঁচ

পাথুরে প্যাসেজে প্রতিধ্বনি তুলল ওদের পায়ের আওয়াজ। শেষ মাথায় একটা দরজা। সেটা পেরিয়ে আরেকটা প্যাসেজে এল ওরা, ছাদ থেকে নগ্ন একটা বালব ঝুলছে। আরেক দরজা খুলে বড় একটা ওয়্যারহাউজে ঢুকল, চারদিকে কাঠ আর বোর্ডের বাক্স সাজানো। মাথার ওপর রানওয়ে, ওভারহেড ক্রেন চলাচলের জন্যে। বাক্সগুলোর মার্কিং দেখে বোঝা গেল, ওগুলোয় মদ আছে। সরু প্যাসেজ ধরে লোহার একটা গেটের দিকে এগোল ওরা। রানার সামনে রয়েছে ফ্রেজার, সে-ই কলিং বেলের বোতামে চাপ দিল।

কোথাও কোন শব্দ নেই। রানা আন্দাজ করল, নিশ্চয়ই ওরা এক পাড়া থেকে আরেক পাড়ায় চলে এসেছে।

ভারী বোল্ট নামানোর আওয়াজ হলো, ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে খুলে গেল গেট। কমপ্লিট স্যুট পরা একজন নিগ্রো, হাতে রিভলভার, একপাশে সরে গিয়ে পথ করে দিল ওদেরকে। কার্পেট মোড়া হলে ঢুকল ওরা।

'ভেতরে যেতে পারো, বুচার,' স্যুট পরা লোকটা বলল। 'বস্ তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

ওদের সামনে চকচকে মেহগনি কাঠের একটা দরজা। নক করল ফ্রেজার। ভেতরে ঢুকল।

শিরদাঁড়ায় পিস্তলের খোঁচা খেয়ে পা বাড়াল রানা।

মস্ত এক ডেস্কের পিছনে বিশাল পিঠ লাগানো গদিমোড়া চেয়ারে বসে রয়েছে মি. ওয়াইজ। সম্পূর্ণ শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন। শরীর ঢিল করে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে। সরাসরি রানার দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল সে, যেন সমীহের সাথে অভ্যর্থনা জানাল। 'গুড মর্নিং, মি. মাসুদ রানা।' তার কণ্ঠস্বর কৃত্রিম লাগল রানার কানে—অস্বাভাবিক ভারী, ঘড়ঘড়ে, যেন গলা ভেঙে গেছে। 'প্লীজ সীট ডাউন।'

গলার আওয়াজ বদলে ফেলেছে, চিনতে দিতে চায় না, ভাবল রানা।

নরম কার্পেটের ওপর দিয়ে এগোল রানা, সামনে ফ্রেজার, পিছনে বুচার।

ডেস্কের সামনে স্টিলের গদিমোড়া চেয়ারে বসল ও। কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখল মি. ওয়াইজকে।

হোটেল হিলটনের কাছে কালো মার্সিডিজে এই লোককেই দেখেছিল রানা। কিন্তু মুহূর্তের সেই দেখায় মি. ওয়াইজের চেহারায় যে রাশভারি ব্যক্তিত্ব, চোখ-মুখ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসা যে ক্ষমতা আর প্রতাপ রয়েছে তার কিছুই টের পায়নি ও।

লোকটা কালো, কিন্তু ঘন বা চকচকে নয় রঙটা, যেন তার শরীরে একটু হলেও তামাটে মানুষের রক্ত আছে। মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল, দুই চোখে বুদ্ধির ঝিলিক, নাকটা নিগ্রোদের মত মোটেও থ্যাবড়া নয়। রানার দৃষ্টি বারবার ফিরে এল কপাল আর চোখে। বেশ বড়সড় মাথা, কিন্তু কপালটা যেন মাথার তুলনায় অনেক বেশি বড়। মুখটা প্রকাণ্ড বলেই হয়তো চোখ জোড়া পরস্পরের কাছ থেকে অনেকটা দূরে, দুটো চোখের ওপর একই সময়ে তাকানো সম্ভব নয়। আণ্ডা আণ্ডা চোখ, কিন্তু ঢুলু ঢুলু হয়ে আছে। এটাও একটা ছল, অনুমান করল রানা। চোখের পাতা পুরোপুরি মেলছে না।

ঘাড় নাড়ার বা ফেরাবার প্রশ্ন ওঠে না, কারণ চেয়ারের পিঠে শক্তভাবে হেলান দিয়ে রয়েছে মি. ওয়াইজ।

চোখের পাতায় কোন চুল নেই, চুল নেই ভুরুতেও। আধ বোজা চোখে শ্যেনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, স্থির। কোন কিছুর দিকে তাকালে মনে হচ্ছে জিনিসটার সবগুলো দিক দেখতে পাচ্ছে সে। মানুষের নয়, যেন অচেনা কোন জন্তুর চোখ, জ্বলজ্বল করছে।

কোথাও কিছু নেই, গুলির আওয়াজ হলো। অস্পষ্ট, কিন্তু পরিষ্কার শোনা গেল।

পুরোপুরি খুলে গেল মি. ওয়াইজের চোখ জোড়া। অমনি তাকে চিনে ফেলল রানা। আন্দাজটা মিথ্যে নয় দেখে মনে মনে শিউরে উঠল ও।

দরজার দিকে ছুটল বুচার।

'তোমাকে আমার দরকার আছে,' ঘড়ঘড় করে উঠল মি. ওয়াইজের কণ্ঠস্বর। 'ফ্রেজার, তুমি দেখো।' খোঁড়াতে খোঁড়াতে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ফ্রেজার। মি. ওয়াইজ রানার দিকে তাকাল। 'সম্ভবত আপনার সঙ্গী, মি. রানা। কোনভাবে আমাদের আন্ডারগ্রাউন্ড অফিসে ঢুকে পড়েছে।'

ক্রিং ক্রিং করে ডেস্কের একটা ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলল মি. ওয়াইজ। কয়েক সেকেন্ড শুনল, তারপর, 'সে এখন ওয়্যারহাউজে, ফতে সিং। ধরা পড়ার পর তুমি ওকে সেকেন্ড গ্যারেজে আটকে রাখবে। সবাইকে বলে দাও, কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে।' রিসিভার নামিয়ে রেখে আবার চেয়ারে হেলান দিল সে।

সত্যিই কি গিলটি মিয়া?—ভাবল রানা। ঢুকল কিভাবে? এদের কাউকে যদি আহত করে থাকে, বা মেরে ফেলে থাকে, ওর কপালে দুঃখ আছে।

দুশ্চিন্তা বাড়ল ওর।

'ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে চাই না,' যেন রানার চিন্তা-ভাবনা ধরতে পেরেই বলে উঠল মি. ওয়াইজ, 'কিন্তু আপনার সঙ্গী কেটে পড়ার সুযোগটার সদ্ব্যবহার করেনি।' কাঁধ ঝাঁকাল সে।

ডিনার জ্যাকেট দারুণ মানিয়েছে মি. ওয়াইজকে। শার্টের সামনে আর হাতায় লাগানো হীরেগুলো যেন তার অহঙ্কারেরই আভাস দেয়। ডেস্কের ওপর তার সামনে চারটে টেলিফোন, একটা ইন্টারকম। ইন্টারকমে বিশটা বোতাম রয়েছে। দৃষ্টিকটু, এবং পরিবেশের সাথে সম্পূর্ণ বেমানান আরও একটা জিনিস রয়েছে—হাতির দাঁতের হাতলওয়ালা একটা সাদা চামড়ার চাবুক।

রানার দিকে গভীর মনোযোগের সাথে তাকিয়ে আছে মি.ওয়াইজ। যেন দেখা, আর নিজেকে দেখতে দেয়া ছাড়া আপাতত আর কোন কাজ নেই।

চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কামরার চারদিকে তাকাল রানা।

প্রশস্ত কামরা, চারদিকে বুক শেলফ। ফার্নিচারগুলো সৌখিন আর দামী। একজন কোটিপতির লাইব্রেরী রূম।

মি. ওয়াইজের মাথার অনেকটা ওপরে একটা জানালা রয়েছে, চারদিকের বাকি দেয়াল সার সার বুক শেলফে ঢাকা। পিছন দিকে তাকাল রানা। সেই একই দৃশ্য, বুক শেলফ আর বুক শেলফ। কোথাও একটা দরজার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। অথচ ঠিক ওর পিছনে দু'জন নিগ্রোকে দেখল ও, কখন ঢুকেছে টেরও পায়নি। একটা বুক শেলফের দু'দিকে দাঁড়িয়ে আছে তারা, দু'জনের হাতেই পিস্তল। আর বুচার দাঁড়িয়ে আছে ঠিক ওর চেয়ারের পিছনে।

রানা লক্ষ করল, তিনজনের কেউই মি. ওয়াইজের দিকে তাকিয়ে নেই। চেহারায় সমীহ আর শ্রদ্ধা নিয়ে ফাঁকা মেঝের ওপর স্থির হয়ে আছে তাদের দৃষ্টি।

মি. ওয়াইজের গলা ঘড়ঘড় করে উঠল, 'নিক আর টেনিসন, তোমরা যাও।'

'ইয়েস, স্যার, বস্।' দু'জন একযোগে বলল। দরজা খোলার আওয়াজ শুনল রানা। চট করে পিছন ফিরে তাকাল ও। একটা বুক শেলফ সরে গিয়েছিল, সাবলীল ভঙ্গিতে ফিরে এল আগের জায়গায়।

আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল। এতক্ষণ রানার দিকে মি. ওয়াইজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থির হয়ে ছিল। গভীর মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করেছে ওকে। কিন্তু এখন রানা লক্ষ করল, ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেও দৃষ্টি কেমন যেন আচ্ছন্ন, যেন বহুদূরে কোথাও তাকিয়ে আছে, ভাবছে অন্য কোন বিষয়।

অতীত রোমন্থন?

লোকটাকে বিরক্ত না করার সিদ্ধান্ত নিল রানা। জ্যাকেটের পকেটে হাত ভরতে গেল ও।

'সিগারেট খেতে পারেন আপনি, মি. রানা,' বলল মি. ওয়াইজ। 'কিন্তু আপনার যদি অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে ডেস্কের ড্রয়ারে যে ফুটোটা রয়েছে, ওটার দিকে একবার তাকান।'

সামনের দিকে ঝুঁকল রানা। বড় একটা কী-হোল। ডায়ামিটারে, আন্দাজ করল, পয়েন্ট ফোর ফাইভ ক্যালিবার। ডেস্কের নিচের দিকে কোথাও নিশ্চয়ই

একটা সুইচ আছে, পা দিয়ে চাপ দিলে ফায়ার হবে। বিপদের মধ্যে রয়েছে, তা সত্ত্বেও হাসি পেল রানার। কৌশলগুলো নিঃসন্দেহে একটু পুরানো ধাঁচের। প্রথমে বোমা, তারপর ভৌতিক টেবিল, এখন আবার ডেস্কে ফিট করা পিস্তল।

তবে একটা কথা মানতেই হয়। প্রতিটি কৌশল প্রত্যাশিত ফল দিয়েছে। মি. ওয়াইজ এখনও ওর কোন ক্ষতি করতে চায়নি, শুধু ভয় পাওয়াতে চেয়েছে, বা নিজের সম্পর্কে একটা ধারণা দিতে চেয়েছে। প্রথম দুটো কৌশল ছিল হালকা রসিকতার মত। কিন্তু ডেস্কের ফুটোটা মোটেও রসিকতা নয়। অনেক মাথা খাটিয়ে ফিট করা হয়েছে পিস্তলটা। নিশ্চই এটা ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়।

সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান দিল রানা। মি. ওয়াইজের হাতে বন্দী হয়ে খুব যে একটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে ও, তা নয়। ওর কোন ক্ষতি হবে এই চিন্তাটাকেই মাথায় ঢুকতে দিচ্ছে না। একদিনের বেশি দু'দিন যদি নিখোঁজ থাকে ওরা, রানা এজেন্সি শহরের প্রতিটি ইঁট খুলে ফেলবে ওদের খোঁজে। সি. আই. এ. আর এফ. বি. আই.-ও বসে থাকবে না। মি. ওয়াইজ তা ভাল করেই জানে।

চিন্তা নিজেকে নিয়ে নয়, গিলটি মিয়াকে নিয়ে। ফতে সিং তাকে নিয়ে কি করছে কে জানে।

হঠাৎ কথা বলল মি. ওয়াইজ, 'আপনি একজন বাংলাদেশী, মি. রানা। আর বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশ। শুনেছি অন্যায়-অবিচার, জোর-জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন আপনার দেশে প্রতি মুহূর্তের ঘটনা। কথাটা কি সত্যি?'

'হঠাৎ এ-প্রসঙ্গ?' ইংরেজীতে কথা বলছে ওরা।

'ধরে নেব আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছুক নন?'

'হ্যাঁ, সত্যি।'

'এ-ও শুনেছি, আপনি নাকি খাঁটি একজন দেশপ্রেমিক,' বলল মি. ওয়াইজ। 'তাই জানতে ইচ্ছে করে, গরীব মাতৃভূমির সেবা না করে ধনী একটা দেশের আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? দেশের ছেলে দেশে ফিরে গিয়ে দেশের খেদমত করলে সেটা কি বেশি মানানসই হত না?'

সে প্রশ্ন তো আমিও তোমাকে করতে পারি!—ভাবল রানা।

কিন্তু মুখে বলল, 'আমার এই কাজটাও দেশ-সেবা বৈকি। বাঘা বাঘা ক্রিমিন্যালকে ধরার ব্যাপারে সাহায্য করলে মক্কেলদের কাছ থেকে মোটা ফি পাওয়া যায়। আমার, বা আমার প্রতিষ্ঠানের রোজগার করা টাকা দেশে চলে যায়, বিদেশে খরচ করা হয় না।'

'তা হারলেমে ঘুরঘুর করছেন কি মনে করে, মি. রানা?'

চুপ করে থাকল রানা।

'উত্তর না দিলে নিজের বিপদ ডেকে আনবেন, মি. রানা,' সাবধান করে দিয়ে বলল মি. ওয়াইজ। 'আপনার সঠিক উত্তর দেয়ার ওপরই নির্ভর করছে আপনাদের দু'জনের ভাগ্য। অনেক কিছু জানি আমি, মিথ্যে কথা বললে ধরা পড়ে যাবেন। বলুন।'

'আমার মক্কেলের অভিযোগ, হারলেম থেকে কেউ সোনার মোহর ছাড়ছে

বাজারে, অনেক কম দরে। আমার কাজ এই মোহরের উৎস খুঁজে বের করা, আর দায়ী লোককে পুলিসের হাতে তুলে দেয়া।'

'শুধু এই উদ্দেশ্য? আর কোন উদ্দেশ্য নেই আপনার?'

'না।'

রানাকে ছাড়িয়ে আরও সামনে চলে গেল মি. ওয়াইজের দৃষ্টি। 'বুচার।'

'ইয়েস, স্যার, বস্।'

'মি. রানাকে চেয়ারের সাথে বাঁধো।'

চেয়ার ছাড়তে গেল রানা।

'নড়বেন না!' ফিসফিস করে বলল মি. ওয়াইজ। 'বসে থাকলেই বরং বেঁচে থাকার বেশি সম্ভাবনা।'

তীক্ষ্নদৃষ্টিতে মি. ওয়াইজের দিকে তাকাল রানা। লোকটার চেহারায় কোন ভাব নেই। ধীরে ধীরে আবার বসল ও। সাথে সাথে ওর গায়ে পেঁচিয়ে দেয়া হলো একটা চওড়া লেদার স্ট্র্যাপ। কষে টান দিয়ে বাঁধা হলো ওকে। ছোট আরও দুটো স্ট্র্যাপ দিয়ে চেয়ারের হাতলের সাথে বাঁধা হলো হাত জোড়া, কব্জির কাছে। খুব বেশি হলে চেয়ার সহ মেঝেতে আছাড় খেতে পারবে রানা, তাছাড়া সম্পূর্ণ অসহায় ও।

ইন্টারকমের একটা সুইচ টিপল মি. ওয়াইজ। 'শিরিন আক্তারকে পাঠাও,' বলে সুইচটা অফ করে দিল।

শিরিন আক্তার! নামটা কেন যেন পরিচিত লাগল রানার।

কয়েক সেকেন্ড পরই ডান দিকের একটা বুক শেলফ পিছন দিকে সরে গেল।

ধীর পায়ে কামরায় ঢুকল মেয়েটা। বুকের ভেতর একটা ধাক্কা খেলো রানা। এমন সুন্দরী মেয়ে জীবনে যেন দেখেনি ও। সেদিন এই মেয়েটা কালো মার্সিডিজ চালাচ্ছিল, কিন্তু পলকের দেখায় এই রূপ ওর চোখে ধরা দেয়নি। ভেতরে ঢুকে থামল রূপসী, বুক শেলফটা আগের জায়গায় ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। আবার পা বাড়িয়ে রানার দিকে তাকাল সে। প্রথমে চোখে, তারপর সারা মুখে, তারপর পা থেকে শুরু করে মাথা পর্যন্ত—অদ্ভুত এক পুলক অনুভব করল রানা, যেন মেয়েটার দৃষ্টি কোমল পরশ বুলিয়ে দিল ওর শরীরে।

রানাকে দেখা শেষ করে মি. ওয়াইজের দিকে ফিরল শিরিন আক্তার। রানার পাশে দাঁড়াল সে, জিজ্ঞেস করল, 'জী?'

ওর কণ্ঠস্বর আবার শুনতে ইচ্ছে করল রানার। মধু মাখানো গলা।

শিরিনের দিকে তাকালই না মি. ওয়াইজ, তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'ও অদ্ভুত একটা মেয়ে, মি. রানা। ভাল কথা, নিশ্চয়ই ওকে আপনার চেনা চেনা লাগছে? না লাগলেই আশ্চর্য হব। বছর দুয়েক আগেও ঢাকায় ওর চেম্বার ছিল। জায়গাটার কি যেন নাম, শিরিন?'

'গুলশান।'

'হ্যাঁ, গুলশানে ছিল ওর চেম্বার।'

এতক্ষণে বুঝল রানা, নামটা কেন চেনা চেনা লাগছিল। শিরিন আক্তার, নামটা

বছর দুয়েক আগে বেশ আলোড়ন তুলেছিল ঢাকায়। কাগজে ওর সম্পর্কে ফিচার-টিচারও লেখা হয়েছিল। বিখ্যাত অ্যাস্ট্রোলজার। ওর অনেক ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেছে বলে শুনেছে রানা। মাথা ঝাঁকাল ও।

'ও একটা অমূল্য সম্পদ,' বলল মি. ওয়াইজ। 'আর অমূল্য সম্পদ সংগ্রহ করা আমার একটা হবি। ওর গুণের খবর শুনে ঢাকা থেকে ওকে আনিয়েছি। সাইকিক পাওয়ার আছে ওর, টেলিপ্যাথি জানে। এ-সব সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণা নেই আমার,তবে এটুকু জানি যে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে শিরিন। আপনি মিথ্যে কথা বলুন, ঠিক ও সেটা ধরতে পারবে।'

ঘাড় ফিরিয়ে আবার রানার দিকে তাকাল শিরিন। এবার কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করল রানা।

'এ-সব আপনাকে বলার উদ্দেশ্য, আপনি যাতে সাবধান হতে পারেন।' শিরিনের দিকে তাকাল মি. ওয়াইজ। 'ও আমার ভারি অনুগত, ভক্তও বলতে পারেন। কথা আদায় করার অনেক মাধ্যম আছে, কিন্তু টরচার করা আমার পছন্দ নয়। নোংরা একটা ব্যাপার। তাছাড়া, হাতের কাছে শিরিন থাকলে, তার দরকারও পড়ে না। বুচার, শিরিনকে একটা চেয়ার দাও। শিরিন, চেয়ারটা নিয়ে মি. রানার পাশে বসো। সাবধান, পিস্তলের সামনে বোসো না।'

একটা খালি চেয়ার রানার দিকে ঠেলে দিয়ে, তাতে বসল শিরিন, রানার ডান হাঁটু ঘেঁষে। মায়াভরা চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। অপলক তাকিয়ে থাকল রানার চোখে।

ডিম্বাকৃতি মুখটা, মসৃণ, লাবণ্যমাখা—কোথাও কোন ভাঁজ বা রেখা নেই। হলদেটে মাখনের মত গায়ের রঙ, ভুরুর গোড়ায় হালকা সবুজ ভাব। মাথায় নীলচে কালো চুল, শাড়ি ঢাকা কাঁধে গোছা গোছা কালো গোলাপের মত স্তূপ হয়ে আছে।

স্বচ্ছ কালো চোখ, একজোড়া কোমল আলো। হঠাৎ সেই আলো দপ্ করে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যেন ব্যক্তিগত কোন বার্তা দিতে চায় রানাকে। নিজের অজান্তেই শিহরিত হলো রানা।

ঝিক্ করে উঠল ওর চোখ, পাল্টা সাড়া দিল।

টিকালো নাক, ফুটো দুটো একবার, মাত্র একবার ফুলে উঠল। রানা বুঝল, এটাও একটা সঙ্কেত। ওর নিজের নাকের ফুটো জোড়াও একবার নড়ে উঠল।

নীল জর্জেট, নীল ব্লাউজ। কানে নীলকান্ত মণি বসানো ঝুমকো। বাঁ হাতের ব্রেসলেটেও নীলা। কিন্তু আঙুলে কোন আঙটি নেই। নখে নেইল পালিশ আছে, আঙুলের রঙের সাথে মেলানো। কোলের ওপর হাত দুটো রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে বসে আছে সে, ফলে ব্লাউজের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে দুই স্তনের মধ্যবর্তী খাদ।

পরপর দুটো সঙ্কেত পেয়েও রানার চেহারায় কোন ভাব ফোটেনি, অন্তত ফোটেনি বলেই রানার ধারণা। কিন্তু কিছু একটা সন্দেহ করেছে মি. ওয়াইজ। অস্বস্তির সাথে নড়েচড়ে বসল সে। হয়তো নিজের অজান্তেই উত্তেজনা বা খুশির ক্ষীণ একটু ভাব ফুটেছে রানার চেহারায়।

'সিধে হও,' ঘড়ঘড় করে উঠল মি. ওয়াইজের কণ্ঠস্বর, 'সিধে হয়ে বসো।'

চাবুকটা ডেস্ক থেকে তুলে নিয়ে বাতাসে শপাং করে বাড়ি মারল সে। পলকের জন্যে চোখ-মুখ কুঁচকে উঠল রানার।

ধীরে ধীরে সিধে হয়ে বসল শিরিন। হাতে এক প্যাকেট তাস রয়েছে, শাফল করতে শুরু করল। তারপর, কি দুঃসাহস, আবার একটা ইঙ্গিত দিল সে রানাকে।

সবগুলো তাস দু'ভাগে ভাগ করে দু'হাতে নিল শিরিন। ডান হাতে ওপরের তাসটা হার্টসের বদমাশ—গোলাম। বাঁ হাতে ওপরের তাসটা স্পেডের রাণী। কোলের ওপর হাত দুটো নামাল সে, গোলাম আর রাণী মুখোমুখি হলো। হাত দুটো পরস্পরের দিকে এগোল—পরস্পরকে চুমো খেলো গোলাম আর রাণী। তারপর আবার তাসগুলো শাফল করল সে।

এই ইঙ্গিত দেয়ার সময় একবারও রানার দিকে চোখ তুলে তাকাল না শিরিন। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘটে গেল ব্যাপারটা। কিন্তু মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠল রানা, পালস রেট বেড়ে গেল ওর।

শত্রু শিবিরে ওর একজন বন্ধু আছে?

'তুমি তৈরি, শিরিন?' জানতে চাইল মি. ওয়াইজ।

'হ্যাঁ, তাসগুলো রেডি করেছি,' মৃদু স্বরে বলল শিরিন।

'মি. রানা,' বলল মি. ওয়াইজ, 'আমার প্রশ্নটা ছিল, হারলেমে কেন এসেছেন আপনি। উত্তরটা আবার আপনি দেবেন। শিরিনের দিকে তাকিয়ে কথা বলুন।'

শিরিনের চোখে তাকাল রানা। কোন বার্তা নেই সেখানে। ওর দিকে তাকিয়েও নেই চোখ দুটো। ওর মাথার ভেতর দিয়ে যেন অন্য কোথাও তাকিয়ে আছে শিরিন।

আগের উত্তরটাই আওড়ে গেল রানা।

'আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন,' বলল মি. ওয়াইজ। 'আমার সম্পর্কে আপনি কি জানেন?'

সাথে সাথে উত্তর দিল রানা, 'আপনি মিশরীয়। পাঁচ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রে এসে নাগরিকত্ব নিয়েছেন। এখানের প্রায় সবগুলো রাজ্যে ব্যবসা আছে আপনার। সরাসরি রাজনীতির সাথে জড়িত না হলেও, আপনি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। নিগ্রোরা আপনাকে ভালবাসে। তাদের বিপদে-আপদে আপনি সাহায্য করেন।' ফিলিপ ওয়াটসনের কাছ থেকে যা জেনেছে রানা, প্রায় সবই গড়গড় করে বলে গেল সে।

'ব্যস, আর কিছু জানেন না?' হুমকির মত শোনাল মি. ওয়াইজের গলা।

'না।'

'শিরিন। বলো, ও কি সত্যি কথা বলছে?'

শিরিনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে অস্বস্তিবোধ করল রানা। মিথ্যে বলছে ও, মেয়েটা কি তা ধরতে পারবে? যদি পারে, সেটা কি ফাঁস করে দেবে?

কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধ হয়ে থাকল কামরা। চেহারায় নির্লিপ্ত ভাব আনার চেষ্টা করল রানা। সিলিঙের দিকে তাকাল ও। তারপর আবার চোখ নামিয়ে শিরিনের দিকে।

শিরিনের চোখে দৃষ্টি ফিরে এল। রানার দিক থেকে মুখ ফেরাল সে, তাকাল মি. ওয়াইজের দিকে।

'উনি সত্যি কথাই বলছেন,' মৃদু কণ্ঠে বলল সে।

ছয়

এক মুহূর্ত চিন্তা করল মি. ওয়াইজ। মনে হলো একটা সিদ্ধান্ত নিল সে, তারপর হাত বাড়াল ইন্টারকমের দিকে। 'ফতে সিং?'

'ইয়েস, স্যার, বস্।'

'গিলটি মিয়াকে আটকে রেখেছ তো?'

'ইয়েস, স্যার, বস্।'

'আচ্ছামত পেটাও। তারপর সিটি হাসপাতালের কাছাকাছি কোন নর্দমায় ফেলে দিয়ে এসো। বুঝতে পেরেছ?'

'ইয়েস, স্যার, বস্।'

'কারও চোখে ধরা পোড়ো না।'

'নো, স্যার, বস্।'

ইন্টারকমের সুইচ অফ করে দিল মি. ওয়াইজ।

'তোমার চোখ কানা হয়ে যাক,' নির্জলা বাংলায় অভিশাপ দিল রানা। 'ঠুঁটো হও। তোমার মাথায় বাজ পড়ুক।'

কিন্তু মি. ওয়াইজ ওর ফাঁদে পা দিল না। জিজ্ঞেস করল, 'ইংরেজীতে বলুন, প্লীজ।'

'গিলটি মিয়ার গায়ে আঁচড় লাগলে আপনাকে ভুগতে হবে,' শান্ত গলায় বলল রানা। জানে, বৃথা আস্ফালন করে কোন লাভ নেই। 'আমি অন্তত সাক্ষী থাকলাম, আপনি ওকে আহত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এফ. বি. আই. আপনাকে ছাড়বে না।'

'ছাড়বে না মানে?' এই প্রথম মি. ওয়াইজকে হাসতে দেখা গেল। 'ছেড়ে দিয়েই তো বসে আছে। দেখছেন না, সব জানার পরও আমাকে ওরা ঘাঁটাতে সাহস পাচ্ছে না! বুচার, এদিকে এসো।'

'ইয়েস, স্যার, বস্।' এগিয়ে এসে ডেস্কের সামনে দাঁড়াল বুচার।

রানার দিকে তাকাল মি. ওয়াইজ। 'কোন্ আঙুলটা সবচেয়ে কম ব্যবহার করেন আপনি, মি. রানা?'

প্রশ্ন শুনে হতভম্ব হয়ে গেল রানা। মাথার ভেতর ঝড়।

'ধরে নিচ্ছি, আপনি বলবেন, বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা,' ঘড়ঘড় করে উঠল ভারী গলা। 'বুচার, মি. রানার বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা ভেঙে দাও।'

বুচার—কসাই। নামের সাথে কাজের মিল রয়েছে। বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল সে। বুক চিতিয়ে রানার দিকে হেঁটে এল। সারা শরীর ঝাঁকি খেলো

রানার, চেয়ারের হাতল চেপে ধরল ও। ব্যথাটা কল্পনা করার চেষ্টা করল ও, যাতে সহ্য করার শক্তি পায়।

রানার দুটো হাতই চেয়ারের হাতলের সাথে বাঁধা। বাঁ হাতের শক্ত কড়ে আঙুলটা হাতল থেকে খুঁচিয়ে তুলল বুচার। দু'আঙুলে সেটার মাথা ধরে, ধীরে ধীরে খাড়া করল। খিক খিক করে হাসছে। চোখ আঙুলটার দিকে নয়, রানার মুখের দিকে।

দম বন্ধ করে, সারা শরীর শক্ত করল রানা, প্রতিটি পেশী টান টান হয়ে ঝাঁকি খেল একবার। চেয়ারটা নিয়ে মেঝেতে উল্টে পড়ার চেষ্টা ব্যর্থ হলো। বুচার চেয়ারের পিঠে একটা হাত ঠেসে ধরেছে। দরদর করে ঘামছে রানা। কটকট আওয়াজ বেরিয়ে এল মুখের ভেতর থেকে, দাঁতগুলো পরস্পরকে পিষছে। পাগল করা ব্যথা মাথায় যেন আগুন ধরিয়ে দিল। প্রায় জ্ঞান হারাবার অবস্থা হলো ওর, শুধু দেখল বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা, গোলাপী ঠোটজোড়া একটু ফাঁক হয়ে আছে।

কড়ে আঙুলটা খাড়া হয়ে রয়েছে। এবার সেটাকে কব্জির দিকে বাঁকা করতে শুরু করল কসাইটা। হঠাৎ ভোঁতা একটা শব্দ তুলে মট্ করে ভেঙে গেল আঙুলটা।

'এখন আমি খুশি,' শান্ত সুরে বলল মি. ওয়াইজ।

নড়বড়ে আঙুলটাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছেড়ে দিল বুচার।

আহত পশুর মত ক্ষীণ একটু গুঙিয়ে উঠে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে জ্ঞান হারাল রানা।

'লোকটার সহ্য-ক্ষমতা একেবারেই কম,' মন্তব্য করল বুচার।

নরম এক তাল কাদার মত চেয়ারে নেতিয়ে পড়ে আছে শিরিন, চোখ বুজল সে।

হাতঘড়ি দেখল মি. ওয়াইজ। তিনটে বাজে। 'ওকে জাগাও।'

চেয়ারের পিছনে দাঁড়াল বুচার, রানার কানের নিচে আঙুল দিয়ে চাপ দিল।

গুঙিয়ে উঠে বুক থেকে চিবুক তুলল রানা। প্রথমে সব ঝাপসা দেখল, তারপর ধীরে ধীরে পরিষ্কার হলো দৃষ্টি। 'ইউ ব্যাস্টার্ড!'

'এখনও যে আপনি বেঁচে আছেন সেজন্যে আমাকে ধন্যবাদ দিন।' মি. ওয়াইজ হাসল। 'জিজ্ঞেস করতে পারেন, মরে গিয়ে হারলেম নদীর পানি দূষিত করার সুযোগ না দিয়ে কেন আপনাকে সামান্য ব্যথা উপভোগ করার সুযোগ দেয়া হলো। হ্যাঁ, এর একটা ব্যাখ্যা আছে।'

একাগ্র মনোযোগের সাথে বাঁ হাতের অস্তিত্ব ভুলে থাকার চেষ্টা করল রানা। ভাঙা আঙুলটার দিকে একবারও তাকাল না, শুধু অনুভব করল প্রতি মুহূর্তে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে ওটার ওপর।

'শিরিন কখনও ভুল করে না,' শুরু করল মি. ওয়াইজ। 'ওর কথা আমি বিশ্বাস করেছি। আমার সম্পর্কে এফ. বি. আই. বা পুলিস যা জানে, তারচেয়ে বেশি কিছু আপনি জানেন না। আপনাকে বাঁচিয়ে রাখার দুটো কারণের মধ্যে এটা একটা।'

চুপচাপ নিজের চেয়ারে বসে আছে শিরিন। তাকিয়ে আছে রানার দিকে, কিন্তু রানা তাকিয়ে আছে মি. ওয়াইজের দিকে।

'আরেকটা কারণ,' বিরতির পর শুরু করল মি. ওয়াইজ, 'মি. রানা, এখনকার আমার এই একঘেয়ে জীবন। আসলে, আপনাকে বলতে আপত্তি নেই, আমি প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে কাজ করছি। কার ওপর প্রতিশোধ, সেটা আপনি নাই বা জানলেন।'

কিন্তু আমি জানি, মনে মনে বলল রানা।

বলে চলেছে মি. ওয়াইজ, 'ভেবেছিলাম, ভয়ানক সব বাধার সম্মুখীন হব, এ-দেশের পুলিস আর নিরাপত্তা বাহিনী আমাকে তাড়া করে বেড়াবে। কিন্তু, সত্যি বলতে কি, ওরা আমাকে ভীষণভাবে নিরাশ করেছে। একটা খোঁচা, বুঝলেন, একটা খোঁচা পর্যন্ত দিতে সাহস পায়নি ওরা। এই সময় আপনি এলেন। বিশ্বাস করুন, আমার ভাল লাগল। ভাবলাম, এবার বোধহয় একটু খেলাধুলো হবে, একঘেয়েমির হাত থেকে রেহাই পাব।

'শুনেছি, আপনি নাকি লেজ নামিয়ে পালাতে জানেন না। পরাজয় স্বীকার করা আপনার প্রকৃতিতে নেই। এ-সব সত্যি কিনা, সেটাই আমি দেখতে চাই। আপনার জন্যে আমার দুটো প্রস্তাব। এক, আমার সাথে লাগুন, প্রমাণ করুন আপনি আমার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু, তাতে বিপদ হলো, যদি হেরে যান, পৈত্রিক প্রাণটা হারাতে হবে। দুই, বারো ঘন্টার মধ্যে এ-দেশ ছেড়ে চলে যাবেন আপনি—তাহলে আপনার সাথে আমার আর কোন শত্রুতা থাকবে না।

'তবে, দুঃখিত, স্ট্রেচারে শোয়া অবস্থায় প্লেনে উঠতে হবে আপনাকে, মি. রানা। এখান থেকে যাবার আগে আমার আরও কিছু ক্ষমতার ছাপ মেরে দেয়া হবে আপনার গায়ে। ব্যাপারটাকে খারাপভাবে নেবেন না, প্লীজ। এ শুধু আপনার আক্রোশ আর রাগ জাগিয়ে তোলার জন্যে। বিলিভ মি, ভয় পেয়ে আপনি ভেগে গেলে আমি ভারী হতাশ হব। আমি চাই, আপনার মধ্যে যে পৌরুষ আছে সেটা জেগে উঠুক। আপনি পাল্টা আঘাত করবার জন্যে খেপে উঠুন।'

নিষ্ফল রাগে দাঁতে দাঁত চাপল রানা।

'এরপর আপনাকে যদি আমি দেখি, তখনকার মূডের ওপর নির্ভর করবে কি শাস্তি দেব।' বুচারের দিকে তাকাল মি. ওয়াইজ। 'মি. রানাকে সাত নম্বর গ্যারেজে নিয়ে যাও। কি করতে হবে তুমি জানো। তারপর সেন্ট্রাল পার্কে নিয়ে গিয়ে পচা পানিতে ফেলে দিয়ে আসবে। দেখো আবার ডুবে না যায়। বুঝতে পারছ?'

'ইয়েস, স্যার, বস্।'

'মি. রানা, বুঝতেই পারছেন কি ঘটতে যাচ্ছে,' বলল মি. ওয়াইজ। 'ওরা আপনাকে একটু অপমান করবে। খোলসা করেই বলি, দু'চার ঘা লাগাবে আর কি। প্লীজ, বাধা দেবেন না।'

'বাস্টার্ড!' বিড় বিড় করে বলল রানা।

'বুচার?'

'ইয়েস, স্যার, বস্?'

'কোন ঝুঁকি নেবে না,' হুঁশিয়ার করে দিল মি. ওয়াইজ। 'যদি বাধা পাও, শাস্তির মাত্রা দ্বিগুণ করবে। যদি দেখো মি. রানা বিপদ হয়ে উঠছেন, আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছেন, ঝামেলা একেবারে চুকিয়ে ফেলবে। উনি আমাদের কুটুম নন।'

'ইয়েস, স্যার, বস্।'

রানার কব্জি আর কোমরের স্ট্র্যাপ খুলে দিল বুচার, আহত হাতটা বাঁকা করে ওর পিঠের ওপর নিয়ে এল। 'গেট আপ!' একটা মোচড় দিয়ে বলল সে। ব্যথায় নীল হয়ে গেল রানার চেহারা, চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল ও।

মি. ওয়াইজের ঢুলু ঢুলু চোখের দিকে আরেকবার তাকাল রানা। 'আপনার চ্যালেঞ্জ,' বলে এক সেকেন্ড বিরতি নিল ও, 'আমি গ্রহণ করলাম। আবার আমাদের দেখা হবে।'

এরপর শিরিন আক্তারের দিকে তাকাল ও। মাথা নিচু করে কোলের ওপর পড়ে থাকা হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে আছে সে। চোখ তুলল না।

'অনেক হয়েছে, আর কেন!' চাপা সুরে বলল বুচার, একটা ঠেলা দিয়ে ঘোরাল রানাকে। এলোমেলো পা ফেলে এগোল রানা, শিরদাঁড়ার সাথে কনুইটা এমনভাবে চেপে ধরেছে বুচার, মনে হলো কাঁধের কাছে ভেঙে যাবে হাতটা। কাতরাতে শুরু করল রানা, কুঁজো হয়ে গেল। বুচারকে ও বিশ্বাস করাতে চায়, যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে ওর, নরম কাদা হয়ে গেছে। আশা, তাতে যদি বাঁ হাতটাকে একটু রেহাই দেয় কসাইটা। কারণ, এই অবস্থায় আচমকা কিছু করতে গেলেই হাতটা ভেঙে যাবে।

রানার কাঁধের ওপর দিয়ে হাত বাড়াল বুচার। একটা বইয়ের গায়ে ঠেলা দিতেই দরজার কবাটের মত খুলে গেল গোটা বুক-শেলফ। পিঠে ধাক্কা দিয়ে কামরা থেকে বের করে আনা হলো রানাকে। পিছনে পা চালাল বুচার, একজোড়া ক্লিক শব্দের সাথে আগের জায়গায় ফিরে গেল বুক-শেলফ। দরজার কবাট খুব মোটা দেখে রানার ধারণা হলো, নিশ্চয়ই সাউন্ড-প্রুফ। ছোট্ট একটা কার্পেট মোড়া প্যাসেজে বেরিয়ে এসেছে ওরা, প্যাসেজটা শেষ হয়েছে একটা সিঁড়ির মাথায়। নিচের দিকে প্রায় খাড়াভাবে নেমে গেছে সিঁড়িটা।

গুঙিয়ে উঠল রানা। 'হাতটা ভেঙে ফেলছ!' আরেকবার ফোঁপাল ও।

টলতে শুরু করল, ঘাড়ের ওপর নড়বড় করছে মাথা। শরীরের সমস্ত পেশী ঢিল করে দিয়েছে।

ওর পিছনে কসাইটার সঠিক পজিশন আগে জানা দরকার। দুই উরুর মাঝখানটা, তা না হলে গলা, শুধু এই দু'জায়গার কোথাও যদি মোক্ষম একটা আঘাত করা যায় তবেই মুক্তির সম্ভাবনা। লোহার শরীর এদের, অন্য কোথাও যতই মারো, কোন ফল হবে না।

'মাগীটা তোমাকে কি মেসেজ দিল?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল বুচার। 'কাছে ছিলাম, সব দেখেছি।' খ্যাক খ্যাক করে হাসল সে। বাঁ হাতটা আরও জোরে মুচড়ে ধরল সে। 'বলো!'

অসহ্য ব্যথায় মাথায় যেন আগুন ধরে গেল রানার। কালো হয়ে এল চোখের সামনেটা, ছোট ছোট আলোর তীক্ষ্ণ বর্শা ফুটে উঠছে। 'উফ! ঢিল দাও! ভে-ভেঙে...!'

'বস্ কি বলেছেন, মনে আছে?' রানার কানের কাছে কথা বলছে বুচার। 'ইচ্ছে করলেই তোমাকে আমি মেরে ফেলতে পারি।'

সত্যি সত্যি জ্ঞান হারাবার মত অবস্থা হলো রানার।

'মাগীর অনেক দেমাক, আমাকে পাত্তাই দিতে চায় না,' বলে চলেছে বুচার। রানার হাতটা আরও একটু ওপরে তুলল সে। মট্ করে একটা শব্দের জন্যে অপেক্ষা করছে রানা। 'বলো, কি বলেছে। ওকে তুমি চেনো আগে থেকে?'

'বলছি,' রুদ্ধশ্বাসে বলল রানা। 'একটু ঢিল দা-দাও!'

রানার ঘাড়ে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল বুচার। 'আমি তাহলে ভুল দেখিনি! গুড, গুড! শালীকে আজ পেয়েছি!' পিঠের ওপর ইঞ্চি দুয়েক নামাল রানার হাত। 'আজই ওকে আমি বিছানায়...!'

একটু ঢিল, আর কিছুর দরকার ছিল না। ইতোমধ্যে প্যাসেজটা অর্ধেক পেরিয়ে এসেছে ওরা, সিঁড়ির মাথায় পৌঁছতে আর মাত্র কয়েক পা বাকি। আবার একবার হোঁচট খাবার ভঙ্গি করল রানা, তাল ঠিক রাখতে গিয়ে পিছিয়ে এল, ধাক্কা খেলো বুচারের সাথে। স্পর্শ থেকে দূরত্ব আর দিকের হিসেব পাওয়া গেল।

ডান হাতটা তক্তার মত সোজা করা ছিল। সামনের দিকে একটু ঝুঁকল রানা, পায়ের ওপর ঘুরতে শুরু করে হাতটা পিছন আর নিচের দিকে চালাল। দুই উরুর ভেতরে সেঁধিয়ে গেল হাত। বিশাল হাঁ করল বুচার, কিন্তু ইঁদুরের মত চি চি, চাপা আওয়াজ বেরোল শুধু। ওরকম জায়গায় একটু জোরে টোকা পড়লে চিৎকার করার শক্তি থাকে না।

রানার বাঁ হাত ছেড়ে দিল বুচার, পিস্তলটাও ফেলে দিয়েছে। দু'হাতে নিজের উরুর মাঝখানটা চেপে ধরে আছে সে। টলছিল, দড়াম করে পড়ে গেল কার্পেটের ওপর।

রানার বাঁ হাত অবশ হয়ে গেছে, চেষ্টা করেও নাড়তে পারল না। ঝুঁকে দেখল, কড়ে আঙুলটা ফুলে চাঁপা কলার মত হয়ে গেছে। হঠাৎ চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ করল, সাপের মত কি যেন কিলবিল করে এগোচ্ছে। ঝট্ করে ফিরল। বুচারের একটা হাত। কালো আঙুলগুলো কার্পেটের ওপর পড়ে থাকা পিস্তলটা প্রায় ধরে ফেলেছে।

ছুটে গিয়ে পিস্তলটায় লাথি মারল রানা। ওর পা ধরে হ্যাঁচকা টান দিল বুচার। দড়াম করে পড়ে গেল রানা, পিস্তলের ব্যারেলের ওপর পড়ল ডান হাত।

এক-লাফে উঠল রানা, মাথা নিচু করে বুচারও দাঁড়াতে চেষ্টা করল। অপেক্ষা করল রানা, দাঁড়াবার সুযোগ দিল বুচারকে। দু'হাতে ধরল তাকে, ঘোরাল। বুচারের একটা হাত এখনও দুই উরুর মাঝখানে। তার মাথার পিছনে পিস্তলের হাতলটা সজোরে নামাল রানা, একই সাথে কোমরের ওপর ঝেড়ে একটা লাথি কষল।

হুস করে একটা আওয়াজের সাথে ফুসফুস খালি করে বেরিয়ে এল সমস্ত বাতাস। কোন আওয়াজ না, নিঃশব্দে প্যাসেজ থেকে নেমে গেল বুচার। প্রায় খাড়া সিঁড়ি, রকেট-গতিতে নামল সে, কোন ধাপে ধাক্কা না খেয়ে সোজা প্রথম ল্যান্ডিঙে।

সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়াল রানা। ল্যান্ডিঙে ড্রপ খেয়ে কুণ্ডলী পাকানো শরীরটা নিচে, সিঁড়ির গোড়ায় নেমে গেছে।

ডান হাতের পিঠ দিয়ে চোখে পড়া ঘাম মুছল রানা। বাঁ হাতের কড়ে আঙুল দপদপ করছে, ধীরে ধীরে কোটের পকেটে ভরল সেটা। ডান হাতে পিস্তল নিয়ে আরও কিছুক্ষণ কান পেতে থাকল, তারপর পা টিপে নামতে শুরু করল।

ল্যান্ডিঙের দু'পাশে দুটো দরজা, একটা তারমধ্যে সামান্য একটু খোলা। কয়েক ধাপ নামার পর অস্পষ্ট আওয়াজ পেল রানা, খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছে। সুরটা পরিচিত লাগল, তারপর বুঝল ক্যাসেট প্লেয়ারে হিন্দী গান বাজছে। সিঁড়ির নিচে এক চুল নড়ছে না বুচারের দেহ।

খোলা দরজা দিয়ে পশম ঢাকা একটা মুখ উঁকি দিল। দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, তারপর আবার নামতে শুরু করল। মিউ করে উঠে ঘরের ভেতর মাথাটা ঢুকিয়ে নিল সাদা বিড়ালটা। দরজার সামনে পৌঁছে ভেতরে উঁকি দিল রানা। আশা ভোঁশলের গান এখন পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। সোফায় হেলান দিয়ে রয়েছে মাথা কামানো এক দৈত্য, পাটখড়ি আকৃতির নিগ্রো একটা মেয়ে তার পা টিপে দিচ্ছে। বিড়াল বা দরজার দিকে খেয়াল নেই ওদের, নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। দ্বিতীয় দরজার গায়ে কান ঠেকাল রানা। যান্ত্রিক কোলাহল শোনা গেল। ওয়্যারলেস অন করে মেসেজ রিসিভ করছে কেউ। তারমানে এখানেই মি. ওয়াইজের কমিউনিকেশন সেন্টার।

একবার ইচ্ছে হলো ভেতরে ঢুকে সব চুরমার করে দেয়। ইচ্ছেটাকে দমন করল রানা। ঘরের ভেতর ক'জন আছে জানা নেই। তাছাড়া, প্রথম কাজ গিলটি মিয়াকে উদ্ধার করা, তারপর অন্য কথা।

নিচে নেমে এল রানা। বুচার মারা গেছে, কিংবা যাচ্ছে। মাথার ও কোমরের, দুটো আঘাতই গুরুতর। মাথার পেছনটা টেনিস বলের মত ফুলে উঠেছে, মাঝখানে দেড় ইঞ্চি গভীর একটা গর্ত। লাথিটা লেগেছিল শিরদাঁড়ার ওপর, ইস্পাতের পাত হাড়ের ভেতর পর্যন্ত সেঁধিয়ে গিয়েছিল। ট্রাউজার আর শার্ট ভিজে গেছে রক্তে।

পিস্তলটা চেক করল রানা। কোল্ট পয়েন্ট থ্রী এইট ডিটেকটিভ স্পেশাল, কেটে ছোট করা হয়েছে ব্যারেল। চেম্বার লোড করা। হ্যামার তোলা।

সামনে একটা দরজা। ভেতর দিক থেকে বোল্ট লাগানো। কবাটে কান ঠেকাল রানা। এঞ্জিনের ভোঁতা আওয়াজ পেল ও। দরজার ওদিকে গ্যারেজ, বোঝা গেল। কিন্তু এঞ্জিন চালু কেন? রাতের এই শেষ প্রহরে?

তারপরই ব্যাপারটা মাথায় খেলল। মি. ওয়াইজ নিশ্চয়ই ইন্টারকমে কথা বলেছে তার লোকদের সাথে, আগেভাগে জানিয়ে দিয়েছে ওকে নিয়ে নামছে বুচার। তারমানে গ্যারেজে অপেক্ষা করছে লোকজন। ওদের পৌঁছতে দেরি হচ্ছে

দেখে নিশ্চয়ই চিন্তা করছে তারা। হয়তো দরজার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে।

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। বিস্ময়ের একটা ধাক্কা দেয়ার সুযোগ রয়েছে ওর। শুধু যদি এখন বোল্টে ভাল করে তেল দেয়া থাকে।

বাঁ হাতটা প্রায় অকেজোই বলা চলে। তবু ডান হাতে পিস্তল নিয়ে পকেট থেকে বের করল সেটা, হালকা ভাবে পরীক্ষা করল প্রথম বোল্টটা। আওয়াজ হলো না, সাবলীলভাবে তোলা গেল। দ্বিতীয়টাও নিঃশব্দে তুলল রানা। এবার বাকি থাকল হাতলটা। ঘুরিয়ে টান দিলেই খুলে যাবে কবাট।

হাতলটা ধীরে ধীরে ঘোরাল রানা। তারপর নিজের দিকে টানল। এক চুল এক চুল করে ফাঁক হতে শুরু করল কবাট, সেই সাথে এঞ্জিনের আওয়াজ বাড়তে লাগল। গাড়িটা নিশ্চয়ই দরজার কাছেই। পিস্তলের সেফটি ক্যাচ আগেই অফ করেছে ও, হ্যাঁচকা টান দিয়ে এবার খুলে ফেলল দরজা।

কয়েক ফিট সামনে কালো একটা সিডান। এঞ্জিন চলছে। গ্যারেজের জোড়া দরজার দিকে মুখ করে রয়েছে গাড়িটা। নগ্ন একটা বালবের আলোয় দু'পাশে আরও কয়েকটা গাড়ি দেখা গেল। সিডানের ড্রাইভিং সীটে রোগা-পাতলা এক নিগ্রো বসে আছে, ঠোঁটে সিগারেট। গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আরেক লোক, সে-ও নিগ্রো। আশপাশে আর কাউকে দেখল না রানা।

ওকে দেখে হাঁ হয়ে গেল লোকগুলো। হুইলে বসা লোকটার ঠোঁট থেকে খসে পড়ল সিগারেট। তারপরই হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াল তারা।

'খবরদার!' গর্জে উঠল রানা। গাড়ির জানালায় পিস্তলের মাজল্ উঁকি দিতেই গুলি করল ও। ড্রাইভারের কপালসহ মাথার সিকিভাগ উড়িয়ে দিল পয়েন্ট থ্রী এইট। জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল পিস্তল ধরা হাত, মরা সাপের মত গাড়ির গা ঘেঁষে দুলছে, পিস্তলটা মুঠো থেকে খসল না।

বাইরে দাঁড়ানো লোকটা ঝুঁকি নেয়নি, মাথার ওপর হাত তুলেছে। ঠোঁট জোড়া একটু একটু কাঁপছে তার। আগুা আগুা চোখে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'তোমাকেও একই রাস্তায় পাঠাব,' বলল রানা, 'যদি না সত্যি কথা বলো। আমার সঙ্গী, গিলটি মিয়া, কোথায় সে?'

'তাকে নিয়ে গেছে...'

'কোথায়?' এক পা সামনে বাড়ল রানা।

'সিটি হাসপাতালে...'

'কতক্ষণ আগে?' লোকটার মাথা লক্ষ্য করে পিস্তল তুলল রানা।

'প্রায় আধ ঘণ্টা...।'

'ক'জন ছিল সাথে?'

'ফতে সিং, একা...।'

'পিছন ফেরো,' দ্রুত নির্দেশ দিল রানা।

ঘুরতে শুরু করল লোকটা, ড্রাইভারের ঝুলে থাকা হাতে পিস্তলটা দেখতে পেয়ে ছোঁ দিল। বদ্ধ গ্যারেজে আবার বোমার মত আওয়াজ করে বিস্ফোরিত হলো পয়েন্ট থ্রী এইট। দু'হাতে পেট চেপে ধরল লোকটা, এলোমেলো পা ফেলে রানা

দিকে এগোল দুই কদম, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ল ওর পায়ের কাছে।

লাফ দিয়ে তাকে টপকাল রানা, সিডানের দরজার সামনে থামল। দরজা খুলতেই হুমড়ি খেয়ে বাইরে এসে পড়ল ড্রাইভারের লাশ। রক্ত এড়িয়ে ড্রাইভিং সীটে বসার চেষ্টা করল রানা, পিস্তলটা কোলের ওপর রাখল। দরজা বন্ধ করে আহত হাতটা হুইলে রাখল, ছেড়ে দিল গাড়ি।

জোড়া দরজা খোলা, কিন্তু ভেড়ানো। ভারী গাড়ির ধাক্কায় খুলে গেল কবাট, গাড়ির গায়ে একটা বুলেট লেগে পিছলে গেল চুঁই শব্দে। রাস্তার ওপারে একটা জানালার কাঁচ ঝনঝন আওয়াজ করে ভেঙে পড়ল।

রাস্তায় উঠে এল গাড়ি। আবার গুলির আওয়াজ হলো। পিছনের দরজা দিয়ে গ্যারেজে লোক ঢুকছে। জানালা দিয়ে হাত বের করে পরপর দুটো গুলি করল রানা। সামনে একটা বাঁক থাকা সত্ত্বেও গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল।

বাঁক নিতে গিয়ে গাড়িটা প্রায় উল্টে যাবার উপক্রম করল, কিন্তু কোন রকমে সামলে নিল রানা। কোন্ রাস্তায় রয়েছে বুঝতে পারল না। ভিউ মিররে চোখ, এখনও কোন গাড়ি পিছু নেয়নি। নির্জন রাস্তা, ফুটপাথ ফাঁকা। কোথাও টহল পুলিস দেখা যাচ্ছে না। সামনে একটা চৌরাস্তা।

অচেনা এলাকা, কোন্ দিকে যাচ্ছে বোঝার উপায় নেই। ডান দিকে বাঁক নিল ও। হঠাৎ খেয়াল করল রাস্তার বাঁ দিকে ঘেঁষে গাড়ি চালাচ্ছে ও। ডান দিকে সরে এল তাড়াতাড়ি। কড়ে আঙুলটা দপ দপ করলেও, তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে হুইল ধরে থাকতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। বাঁ দিকের দরজা আর জানালায় রক্ত লেগে রয়েছে, বার বার সেটা স্মরণ করে দূরে সরে থাকার চেষ্টা করল ও।

ঘন্টায় পঞ্চাশ মাইলের বেশি স্পীড তুলল না। সামনে একটা লাল সিগন্যাল দেখল, কিন্তু থামল না। প্রায় অন্ধকার একটা এলাকা পেরিয়ে এল ও, দু'পাশে বিশাল সব গোডাউন। ভিউ মিররে এখনও কোন গাড়ি নেই। সামনে আরেকটা আলোকিত চৌ-রাস্তা পড়ল, এখানে কিছু লোকজন আর গাড়ি দেখা গেল। ট্রাফিক সিগন্যালের সামনে সিডান থামাল রানা।

চিনতে পারল রাস্তাটা। পার্ক এভিনিউয়ের একশো ষোলো নম্বর রাস্তায় রয়েছে ও। বাঁক নিয়ে পরের রাস্তায় এল, গাড়ির গতি কমাল। একশো পনেরো নম্বর রাস্তা।

তারমানে হারলেম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ও, শহরে ঢুকছে। ষাট নম্বর রাস্তায় এসে আবার মোড় ঘুরল গাড়ি। নির্জন, কোথাও কিছু নড়ছে না। সরু একটা গলিতে ঢুকে গাড়ি থামাল ও। নেমেই উল্টো দিকে হাঁটা ধরল, যেদিক থেকে এসেছে।

সিকি মাইল হেঁটে সিটি হাসপাতালে পৌঁছল রানা। কিন্তু ডেস্ক ক্লার্ক জানাল, দু'ঘন্টার মধ্যে কোন আহত লোককে ভর্তি করা হয়নি। ফোন বুদে ঢুকে রিসিভার তুলল রানা।

হিলটনের রিসেপশনিস্ট বলল, 'আপনার জন্যে একটা মেসেজ আছে, মি. রানা। গিলটি মিয়া নামে এক ভদ্রলোক টেলিফোনে···।'

পরম স্বস্তি বোধ করল রানা।

পার্ক এভিনিউ পর্যন্ত হেঁটে এল ও। একটা ট্যাক্সি নিয়ে পৌঁছল হোটেলে।

মেসেজটা নিয়ে নাইট পোর্টার অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে। ডান হাত দিয়ে ভাঁজ করা কাগজটা খুলল রানা। প্রথমেই সময় লেখা রয়েছে, রাত চারটে। তার নিচে ইংরেজীতে লেখা, 'এই মেসেজ পেলেই আমাকে ফোন করবেন, স্যার!'

এলিভেটরে চড়ে নিজের স্যুইটে ফিরল রানা। টেলিফোনের সামনে একটা চেয়ার টেনে বসল। যাক, ওরা দু'জনেই বেঁচে আছে। 'একটা ফাঁড়া গেল বলতে হয়!'

সাত

'নাউজুবিল্লা! নাউজুবিল্লা!' প্রথমে চোখ বুজল গিলটি মিয়া, তারপর স্টেজের দিকে পিছন ফিরল। প্রিন্সেস আমিনার নাচ দেখবে না সে।

বার কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কফি বা সফট কোন ড্রিঙ্ক পাওয়া যায় না এখানে, তাই এক আউন্স হুইস্কির অর্ডার দিতে হয়েছে। কিন্তু গ্লাসটা একবারও মুখে তোলেনি সে। ঠোঁটে একটা সিগারেট ঝুলিয়ে রেখেছে, তবে ধরায়নি সেটা।

নাচ প্রায় শেষ হয়ে এল, একবারও স্টেজের দিকে ফেরেনি। গোটা কামরায় কোথাও আলো জ্বলছে না, শুধু স্টেজে স্পটলাইটের চোখ-ধাঁধানো আলো রয়েছে। কাউন্টারের কাছ থেকে সরতে শুরু করল সে। অনেক লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে, ভিড় ঠেলে এগোল। আবছা অন্ধকারে টেবিলগুলোকে পাশ কাটিয়ে হাঁটছে, রানার টেবিলের দিকে।

রানা যদি এদিকে তাকিয়েও থাকে, তাকে দেখতে পাবে না, গিলটি মিয়া জানে। প্রায় অন্ধকার কামরা, তার ওপর মোটা পিলারটা আড়াল করে রেখেছে। অনুষ্ঠান পরিচালক বলল, আফটার অল আমিনা একজন প্রিন্সেস, আলোর মধ্যে কিভাবে তিনি বিবস্ত্র হন! গিলটি মিয়া বুঝল, গোটা কামরা অন্ধকার করে দেয়া হবে। পকেট থেকে গ্যাস লাইটারটা বের করল সে।

সত্যি সত্যি সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে গেল কামরা। রানার কাছ থেকে গিলটি মিয়া তখন সাত কি আট গজ দূরে, পিলারের কাছ থেকে বড়জোর তিন গজ। অন্ধকার নামতেই লাইটার জ্বালল সে। দেখল, পালোয়ান মার্কা এক লোক পিলারের ওপর দিকে হাত বাড়াচ্ছে। পিলারের গায়ে লাল একটা বোতাম দেখা গেল। পালোয়ান ওর দিকে তাকাতে যাবে, লাইটার নিভিয়ে ওখান থেকে সরে গেল গিলটি মিয়া।

ঝাড়া এক মিনিট পর আবার আলো জ্বলল, উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কামরা। গিলটি মিয়া তখন খালি একটা চেয়ারে বসে নেশাগ্রস্তের মত পা আর মাথা দোলাচ্ছে। লক্ষ করল, কেউ ওর দিকে তাকিয়ে নেই। কয়েক সেকেন্ড পর পিলারের দিকে তাকাল ও। পালোয়ান গায়েব হয়ে গেছে। পিলারের ওপাশে লাল কার্পেটের ওপর চেয়ার-টেবিল ঠিকই আছে, কিন্তু রানাকে কোথাও দেখা গেল না।

'দোস্ত বুঝি মাল একটু বেশি টেনেছ?' গিলটি মিয়ার সামনের চেয়ারে বসা এক

যুবক সহাস্যে জানতে চাইল।

'ডু ফুর্তি, ডু ফুর্তি,' উদার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল গিলটি মিয়া। 'একানে তো সব্বাই ফুর্তির লেগেই আসে, বাওয়া।'

'কিন্তু মেয়েমানুষ ছাড়া ফুর্তি কি আর জমে, দোস্ত!' বলল যুবক। একটু ম্লান হলো তার চেহারা। 'দেখা যাচ্ছে শুধু আমাদের সাথেই ওই জিনিস নেই।'

'মেয়েমানুষ? ওহ্ ড্যাম!'

'মানে?' অবাক চোখে তাকাল যুবক।

'তোমার বুজি শখ মেটেনি একনো?' তিক্ত হাসি ফুটল গিলটি মিয়ার ঠোঁটে। 'আমি তো কানে ধরেচি, মেয়েমানুষের ধারে-কাচে ঘেঁষব না। দুনিয়ার যত অশান্তি, তার মূলে কে? ওই মেয়েমানুষ।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। হাতজোড় করল। 'মাফ করো, বেরাদার। আমার লাগবে না। তোমার অল্প বয়েস, তোমার কতা আলাদা।' হঠাৎ খাদে নামাল গলা। 'গোপন কতা, কাউকে বলবে না তো?'

'কি?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল যুবক।

হাত তুলে টেনিস বলের আকৃতি বোঝাতে চাইল গিলটি মিয়া। 'এই রকম। একদম কচি মাল। ভারি সুন্দরী। লাগবে?'

'কোথায়?' লোভে চকচক করে উঠল যুবকের চোখ।

'সবাই এ খবর জানে না,' ফিসফিস করে বলল গিলটি মিয়া। 'শুধু পুরানো খদ্দেরদের সুযোগটা দেয়া হয়। ধনী লোকের বউ বা মেয়ে, অ্যাডভেঞ্চারের জন্যে এই পতে নেমেচে। তোমাকে পচোন্দ হলে টাকা-পয়সা কিচ্চু নেবে না। চাও? একে ট্রাই করে দেকতে পারো।'

'কিভাবে? প্লীজ...।'

'দুমিলিট পর, কেমন? আমি চলে গেলে, বুজলে? ওই যে পিলারটা দেকচো, ওপর দিকে লাল একটা বোতাম আচে। কোন দিকে না তাকিয়ে ওটা টিপে দেবে। লাল স্কার্ট পরা একটা মেয়ে ঢুকবে এক মিলিট পরই...।'

'আমার তরফ থেকে এক পেগ...,'

'পরে,' যুবককে বাধা দিয়ে বলল গিলটি মিয়া। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল সে। দ্রুত পায়ে পিলারের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লাল কার্পেটের ওপর দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাল গিলটি মিয়া। তার মনে একটা সন্দেহ জেগেছে, এখুনি প্রমাণ হয়ে যাবে সেটা সত্যি না মিথ্যে।

রানার খালি চেয়ারটায় বসল সে। খানিক পর লক্ষ করল, হেড ওয়েটার আর বারম্যান ওর দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে কি যেন আলাপ করছে। হেড ওয়েটারের ইঙ্গিতে একজন ওয়েটার এগিয়ে এল।

'স্যার, একটু ভুল হয়ে গেছে,' বলল সে। 'এটা এক ভদ্রলোকের রিজার্ভ করা টেবিল...'

'জানি,' বলল গিলটি মিয়া। 'আমার বসের। তিনি এখানে নেই কেন জানো?'

থতমত খেয়ে ফিরে গেল ওয়েটার। কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে ওরা তিনজন সলা-পরামর্শ শুরু করল।

দু'মিনিট পেরিয়ে গেছে, কিন্তু চেয়ার ছাড়ছে না যুবক। মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠল গিলটি মিয়া। ভয়, এখানে তাকে বেশিক্ষণ বসতে দেয়া হবে না। বিড়বিড় করে গাল পাড়তে শুরু করল সে, 'হারামখোর ছোকরার হলো কি! উটে এসে বোতামটা টিপচে না কেন!'

চার মিনিটের মাথায় একসাথে দুটো ব্যাপার লক্ষ করল গিলটি মিয়া। দরজা দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল একজন শিখ, গিলটি মিয়াকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল। কিন্তু তা মাত্র মুহূর্তের জন্যে। হঠাৎ সে দৌড় দিল।

এতক্ষণে সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে যুবককেও দেখা গেল চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে আসতে।

পিলারের কাছে পৌঁছে গেল যুবক, হাত তুলে টিপে দিল লাল বোতামটা।

গিলটি মিয়াকে নিয়ে নিচে নেমে এল লিফট। মাথার ওপর ঢাকনিটা ঘটাং করে বন্ধ হয়ে গেল। গিলটি মিয়ার চোখ বন্ধ, দোয়া-দরূদ পড়তে পড়তে চেয়ার ছাড়ল সে, অন্ধের মত চারপাশটা হাতড়াতে লাগল। দেয়ালে ধাক্কা খেতে পিছিয়ে গেল সেটা, চোখ মেলে দেখল লম্বা একটা প্যাসেজে রয়েছে সে।

'আচ্ছা, বুজেচি,' আপন মনে সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে। 'গুমোর ফাঁক হয়ে গেচে।' নির্জন প্যাসেজ ধরে, হাতের ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে এগোল সে।

দ্বিতীয় প্যাসেজে ঢুকতেই দেখল, তিনজন হোঁৎকা চেহারার নিগ্রো তার দিকে এগিয়ে আসছে। নিজেদের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা করছে ওরা। গিলটি মিয়াকে দেখে ওদের একজনের ভুরু কুঁচকে উঠল। পাশ কাটাবার সময় তার পেটে ছড়ির ডগা দিয়ে একটা হালকা খোঁচা মারল গিলটি মিয়া, বলল, 'হাই, লং টাইম নো সি!'

'হাই!' বিড়বিড় করে বলল লোকটা, চিন্তিত ভাবে তাকিয়ে থাকল গিলটি মিয়ার দিকে। তারপর, এগিয়ে যাওয়া সঙ্গীদের দিকে দ্রুত পা বাড়াল। আবার যখন পিছন ফিরল সে, আরেকটা দরজা পেরিয়ে ওয়্যারহাউজে অদৃশ্য হয়ে গেছে গিলটি মিয়া। ওয়্যারহাউজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কোন্ দিকে যাবে ঠিক করতে পারল না গিলটি মিয়া।

'মনে হচ্ছে নতুন মাল?' ওভারহেড ব্রিজ থেকে কথা বলল একজন লোক।

ঝট্ করে ওপর দিকে তাকাল গিলটি মিয়া। বিশালদেহী এক নিগ্রো, পরনে ওভারঅল। কোমরে হাত রেখে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে।

'মি. ওয়াইজকে একটা মেসেজ দিতে এলুম!' একগাল হেসে বলল গিলটি মিয়া।

দড়াম করে খুলে গেল একটা দরজা। 'লুক আউট!' কে যেন চিৎকার করে উঠল। কয়েকজন লোকের ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ শোনা গেল।

ওভারহেড ব্রিজের লোকটা ট্রাউজারের পকেটে হাত ভরল। শেরওয়ানির পকেট থেকে বেরিয়ে এল গিলটি মিয়ার হাত। এক মুহূর্ত দেরি না করে একটা গুলি করল সে। 'হুঁশিয়ার! যাকে দেকবো তাকেই গুলি করব!' প্রথম গুলিটা অবশ্য কাউকে লক্ষ্য করে করেনি, ফাঁকা আওয়াজ। ব্রিজের ওপাশে সরে গিয়ে গা ঢাকা

দিয়েছে বিশালদেহী। পায়ের শব্দগুলো এখন আর শোনা যাচ্ছে না। এক পা এক পা করে পিছু হটতে শুরু করল গিলটি মিয়া। কাঠের একগাদা বাক্সের আড়াল থেকে উঁকি দিল একটা মাথা। সাথে সাথে গুলি করল গিলটি মিয়া। মাথাটা অদৃশ্য হয়ে গেল। পিছন থেকে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল দু'জন লোক, হাত থেকে ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিল পিস্তল। 'গেচিরে! স্যার, বাঁচান!'

দশ মিনিট পর ওয়্যারহাউজ থেকে একটা গ্যারেজে নিয়ে আসা হলো গিলটি মিয়াকে। ফতে সিং আর উডকক থাকল পাহারায়, বসের কাছ থেকে নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে ওরা।

অনেক প্রশ্ন করেও গিলটি মিয়া-রহস্যের কোন মীমাংসা করতে পারেনি ওরা। স্রেফ ধ্যানমগ্ন দরবেশ বনে গেছে গিলটি মিয়া। ফতে সিং আর উডকক হাল ছেড়ে দিল, বসের কাছ থেকে নির্দেশ পাবার পর গিলটি মিয়াকে কিভাবে শায়েস্তা করা হবে তাই নিয়ে আলোচনা শুরু করল।

চোখ বুজে ওদের প্রতিটি কথা গোগ্রাসে গিলছে গিলটি মিয়া। ফতে সিং লোকটাকে তার একটু নরম বলে মনে হলো, প্রাণে দয়া-রহম এখনও কিছুটা আছে। সে প্রস্তাব দিল, ঝামেলা না করে গিলটি মিয়াকে গুলি করে মেরে ফেলা দরকার। কিন্তু উডকক ভয়ানক নিষ্ঠুর, তার কথা হলো, মৃত্যুদণ্ড আসলে কোন শাস্তিই নয়। শাস্তি দিতে হলে গিলটি মিয়ার হাত-পায়ের আঙুল একটা একটা করে ভাঙতে হবে। তারপর ভাঙতে হবে কব্জি আর কনুই। খুলি না ফাটিয়ে তুলে ফেলতে হবে চুলসহ চামড়া। কানের ফুটোয় গরম সীসা ঢেলে দেয়ার পর জিভে গাঁথতে হবে গরম লাল পেরেক।

কাপড় যাতে না ভেজে তার জন্যে সংগ্রাম শুরু করল গিলটি মিয়া। অনেক কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনল সে। ইতোমধ্যে, ওদের কথা শুনে, বুঝে নিয়েছে, সাহায্য পাবার কোন আশা নেই।

'দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্চি,' হঠাৎ তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল সে, 'পতপত করে উড়চে···। কি উড়চে?' বলে চোখ মেলল সে। কটমট করে তাকাল ফতে সিং-এর দিকে। 'বল দেকি, কি উড়চে?'

ফতে সিং আর উডকক পরস্পরের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল।

'বলতে পারলি না?' সবজান্তার ভঙ্গি করে হাসল দরবেশ। 'জানতাম, পারবি না! তোর দিলে দেশপ্রেম নেই। তুই একটা বেঈমান। শিখ জাতি আজ স্বাধীনতার জন্যে কাতারে কাতারে জান কোরবান করচে, আর তুই একানে আমোদ-ফুর্তি করচিস। ছি, ছি।'

ফতে সিং হতভম্ব হয়ে গেল। তার ঠোঁট কাঁপছে।

আবার চোখ বুজল দরবেশ। 'খালিস্তানের পতাকা···স্বাধীন দেশে খালিস্তানের পতাকা। আহ্, কি সুন্দর!'

এই সময় গ্যারেজের একটা শেলফে রাখা ইন্টারকম ঘড়ঘড় করে উঠল। উঠে গিয়ে সুইচ অন করে বসের সাথে কথা বলল ফতে সিং।

ইন্টারকমের সুইচ অফ করে দিয়ে উডককের দিকে ফিরল ফতে সিং। 'তুমি

তোমার কাজে যাও, কক। একে আমি একাই সামলাতে পারব।'

উড়কক চলে যেতে গ্যারেজে পায়চারি শুরু করল ফতে সিং। খানিক পর গিলটি মিয়ার সামনে থামল সে। 'বসের নির্দেশ, আচ্ছামত পিটিয়ে, হাত-পা ভেঙে, তোমাকে সিটি হাসপাতালের কাছাকাছি একটা নর্দমায় ফেলে দিয়ে আসতে হবে।'

যেন এ-ব্যাপারে কোনরকম আগ্রহ বা উদ্বেগ কিছুই নেই গিলটি মিয়ার, সে জানতে চাইল, 'যুদ্ধে না হয় না গেলি, যা আয় করিস তা থেকে কিছু টাকা চাঁদা তো দিতে পারিস। দেশের জন্যে কিছু না করে মারা গেলে, কোথায় ঠাঁই হবে ভেবে দেকেচিস?'

'হুজুর!' ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গি করল ফতে সিং। 'আপনাকে অজ্ঞান না করে আমার উপায় নেই। খানিকটা ব্যথা আপনাকে সহ্য করতেই হবে। কিন্তু ছাড়া পেয়ে যখন মুখ খুলবেন, বলবেন, আপনাকে ভয়ানক মারধর করা হয়েছে। তা না হলে আমি বিপদে পড়ব।'

আবার চোখ বুজল গিলটি মিয়া, এই সুযোগে তার কানের পাশে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল ফতে সিং। জ্ঞান ফেরার পর গিলটি মিয়া দেখল, অন্ধকার একটা গলিতে পড়ে রয়েছে সে। কানের পাশে ব্যথা করছে, কিন্তু তেমন মারাত্মক নয় আঘাতটা। পকেটে ল্যুগারটা রয়েছে, কিন্তু খালি। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সে। না, ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফেরার সময় কেউ তাকে অনুসরণ করেনি।

নিজের রুমে ফিরেই হোটেল হিলটনে ফোন করল গিলটি মিয়া। রানার জন্যে একটা মেসেজ দিল সে।

ছদ্মবেশ খুলে ফেলে কামরায় পায়চারি করছে সে, ফোন এল। ছোঁ দিয়ে রিসিভার তুলল। 'বলচি।'

গিলটি মিয়ার মুখ থেকে সব কথা শুনে মুচকি হাসল রানা। 'চোরকে তুমি শোনাতে গেছ ধর্মের কথা! তবে সান্ত্বনা এইটুকু যে তাতে কিছুটা হলেও কাজ হয়েছে। শোনো…' এরপর কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল ও।

পরমুহূর্তে ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন। রিসিভার তুলল রানা। 'হ্যালো।'

ফিলিপ ওয়াটসনের উত্তেজিত গলা শোনা গেল, 'তুলকালাম কাণ্ড বেধে গেছে, রানা। শহরের সমস্ত পুলিস অফিসারের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে মি. ওয়াইজ। ঈশ্বর জানেন, কি করেছ তোমরা! অযোগ্য, নেমকহারাম, ঘুসখোর, দায়িত্বজ্ঞানহীন, এই সব অভিযোগ আনছে সে। বলছে, অজ্ঞাত পরিচয় দু'জন লোক তার ওয়্যারহাউজে ঢুকে তিনজন লোককে খুন করে রেখে গেছে। দু'জন দারোয়ান, আর একজন ড্রাইভারকে। সত্যি নাকি?'

জবাব না দিয়ে খুক করে কাশল রানা।

'দুঃখিত, রানা। তোমাদের কি অবস্থা সেটাই জিজ্ঞেস করা হয়নি। তুমি…'

'শুধু একটা আঙুল নড়বড় করছে,' বলল রানা। 'ওর কিছু হয়নি তেমন।'

'শোনো, এফ.বি.আই.-এর বড় অফিসারদেরও ঘুম ভাঙাচ্ছে মি. ওয়াইজ। আমার ধারণা, ওয়াশিংটনের সাথেও যোগাযোগ করছে সে। ব্যাপারটা যদি বড়কর্তাদের হাতে চলে যায়, কতক্ষণ তোমাকে প্রোটেকশন দিতে পারব, জানি না। আমার মনে হয়, রানা, এই মুহূর্তে শহরে থাকা তোমার ঠিক হবে না···।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। 'নিজেকে আমি রক্ষা করতে জানি, ফিলিপ। তবু, সতর্ক করে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ।'

রিসিভার রেখে দিয়ে বাথরুমে ঢুকল রানা। আধ ঘণ্টা ধরে ঘষে ঘষে গায়ের কালো রঙ তুলে ফেলল সব। কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে দাড়ি কামাল। চিন্তিত। শার্ট পরার সময় আঙুলে ব্যথা পেয়ে উফ্ করে উঠল।

কাপড় পরা শেষ করে একটা সুটকেসে ওর জিনিস-পত্র সব ভরে নিল। কোল্টটা থাকল টেবিলের ওপর। কফি খেতে ইচ্ছে করল, কিন্তু ওর এই চেহারা দেখে আঁতকে উঠবে ওয়েটার। ফোনের রিসিভার তুলে ওভারসিজ অপারেটরের সাথে কথা বলল ও। মেয়েটা জানাল, 'দশ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে, স্যার।'

দশ মিনিট পর ফোন বাজল। রিসিভার কানে তুলতেই শব্দজটের আওয়াজ পেল রানা। চোখের সামনে একে একে ভেসে উঠল আরেক মহাদেশ, আরেক শহর, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, সাততলা বিল্ডিং, একজোড়া কাঁচা-পাকা ভুরু।

'ইউ আর কানেকটেড, স্যার,' ওভারসিজ অপারেটর জানাল। 'গো অ্যাহেড, প্লীজ। নিউ ইয়র্ক কলিং ঢাকা।'

পরিষ্কার বাংলা শুনতে পেল রানা, 'বাংলাদেশ ট্রেডিং করপোরেশন। কে বলছেন?' হেলেনার গলা।

'ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সাথে কথা বলতে পারি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমি তার ভাইপো বলছি নিউ ইয়র্ক থেকে।'

'এক সেকেন্ড, প্লীজ,' বলল হেলেনা। রানা জানে, ওর গলা চিনতে পেরেছে মেয়েটা। দ্রুত হাতে ইন্টারকমের বোতাম টিপে কথা বলছে মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের সাথে, 'নিউ ইয়র্ক থেকে মাসুদ রানা, স্যার।' বস্ কি বলছেন তাও আন্দাজ করতে পারল রানা, 'কানেকশন দাও!'

'রানা?' গুরুগম্ভীর, ভারী কণ্ঠস্বর। কোন কারণ ছাড়াই শরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠল রানার।

'জ্বী, স্যার,' বলল রানা। 'একটা কনসাইনমেন্টের ব্যাপারে আপনার একটু সাহায্য দরকার, তাই···।'

'বলে যাও।'

রানা এজেন্সির মাধ্যমে এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে সবই জানেন রাহাত খান। 'আজ রাতে আমাদের চীফ কাস্টমারের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম, স্যার,' বলল রানা। 'লোকটা পাগল, কিন্তু মস্তবড় বিজ্ঞানী। আমি ওখানে থাকতে থাকতেই তার তিনজন লোক অসুস্থ হয়ে পড়ে।'

'তুমি ঠিক জানো, পাগল বৈজ্ঞানিক?'

'জ্বী, স্যার।'

'আই সি। কি রকম অসুস্থ ওরা?'

'যতটা খারাপ হতে পারে, স্যার,' বলল রানা।

'দেখো, তুমিও আবার অসুস্থ হয়ে পোড়ো না।'

'একটু ঠাণ্ডা অবশ্য লেগেছে, তবে চিন্তিত হবার মত কিছু না,' বলল রানা। 'সব আমি লিখে জানাব। সমস্যা হলো, মনে হচ্ছে ডাক্তার আর সার্জেনরা জেদ ধরবে। শহরে ফ্লু দেখা দিয়েছে, ওরা চাইবে আমরাও যেন হাসপাতালে ভর্তি হই। আজই আমি কণাকে নিয়ে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছি, কিন্তু যেখানেই যাই না কেন, সেখানেও তো ডাক্তার আর সার্জেন আছে।'

'কণা?'

'জ্বী, স্যার। আমার নতুন সেক্রেটারি।'

'ও, হ্যাঁ।'

'ভাবলাম, যাই, সান পেড্রো-র যে ফ্যাক্টরির কথা আপনি বলেছিলেন সেখান থেকে একবার ঘুরে আসি।'

'গুড আইডিয়া।'

'এখন আপনি যদি ডাক্তার আর সার্জেনদের বড়কর্তাকে একটু বলে দেন, ওরা তাহলে হয়তো আমাকে আর বিরক্ত করবে না। আপনি একবার বলেছিলেন, উনি আপনার বন্ধু।'

'হ্যাঁ। ঠিক আছে,' বললেন রাহাত খান। 'ব্যবসার অবস্থা কেমন বুঝছ?'

'ভাল হবে বলে আশা করছি। খুব খাটতে হবে। আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি ফুল রিপোর্ট লিখে পাঠিয়ে দেবে আজ।'

'গুড,' বললেন রাহাত খান। 'আর কিছু?'

'না, স্যার; আর কিছু না, ধন্যবাদ, স্যার।'

'সুস্থ থেকো। গুডবাই।'

'গুডবাই, স্যার।'

রানা জানে, এফ.বি.আই. চীফ আর পুলিস প্রধানের সাথে এখুনি কথা বলবেন রাহাত খান। ওঁদের তিনি জানাবেন, যা ঘটেছে তার জন্যে তিনি দুঃখিত, কিন্তু রানা স্রেফ আত্মরক্ষার জন্যে এই পথ বেছে নেয়।

আবার ফোন বাজল।

গিলটি মিয়া জানাল, 'ডাক্তার রওনা হয়ে গেচে, স্যার। উড়োজাহাজ, আর রেলগাড়ি, দুটোরই টিকিট কাটা হয়েচে। হাতের কাচে কাগজ থাকলে লিকে নিন।'

'বলে যাও।'

'পেনসিলভানিয়া স্টেশন। ট্র্যাক ফরটিন। আজ সকাল দশটায়। রেলগাড়ির নাম, দি সিলভার ফ্যান্টম। ওয়াশিংটন, জ্যাকসনভিল, আর টামপা হয়ে সেন্ট পিটার্সবার্গ। আপনার জন্যে গোটা একটা কমপার্টমেন্ট ভাড়া করেচি, স্যার। এক কতায়, বেহেশতখানা। কার লম্বর দুশো পঁয়তাল্লিশ, কমপার্টমেন্ট এইচ। টিকেট পাবেন রেলগাড়ির কন্ডাক্টারের কাচে। আপনার নাম দিয়েচি মি. হায়দার।'

'গুড। আর তুমি?'

'উড়োজাহাজে করে যাব। আপনার রেলগাড়ি ওকানে পৌঁচুবে কাল দুপুর নাগাদ, স্যার। একটা ট্যাক্সি লিয়ে সোজা চলে যাবেন সানসেট বীচে—জায়গাটার নাম ট্রেজার আইল্যান্ড। বেশিরভাগ হোটেলই ওকানে। গালফ বুলেভার্ড ওয়েস্টে আপনার জন্যে গোল্ডেন টাওয়ার হোটেলের একটা কামরা ভাড়া করা হয়েচে। সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে কজওয়ে ধরে যেতে হবে। ড্রাইভারকে বললেই লিয়ে যাবে।'

'ভেরি গুড, গিলটি মিয়া,' বলল রানা। 'কিন্তু সাবধানে থেকো। তালিকায় আমার পর তোমার নাম আছে। তোমার ফ্লাইট ক'টায়?'

'দুপুরের পর, স্যার।'

'আজ রাতে যা ঘটেছে সব তুমি জানো না,' বলল রানা। 'মন দিয়ে শোনো, তারপর এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করে ওদের সব বলবে তুমি। ওরা রিপোর্টটা লিখে পাঠিয়ে দেবে ঢাকায়।'

রানার কথা শেষ হতে গিলটি মিয়া খিক খিক করে হাসল খানিকটা। 'জ্ঞান-পাপীর গর্দানে মোক্ষম একটা রদ্দা মেরেচেন, স্যার। বোজাই যাচ্ছে, ওই মেয়েটা আপনাকে বাঁচিয়ে দিয়েচে। কি যেন নাম বললেন, স্যার?'

'শিরিন আক্তার।'

'আহা, কি মিষ্টি নাম। কি মনে হয়, স্যার, আবার ওর সাহায্য পাব আমরা?'

'বোঝা যাবে আবার যদি দেখা হয়,' বলল রানা। 'সে-সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। মি. ওয়াইজ ওকে কাছ ছাড়া করে বলে মনে হয় না।'

রিসিভার রেখে জানালার সামনে দাঁড়াল রানা। ভোরের আলো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে শহরে, সাড়ে ছ'টা বাজে। ও কি বন্দী? শিরিন আক্তারের কথা ভাবছে রানা। কিন্তু কবীর চৌধুরী সম্পর্কে যতটুকু জানে সে, মেয়েদের ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ নেই।

তাকালে চোখ ফেরানো যায় না, অপরূপ সুন্দরী। ওকে বাঁচাবার জন্যে মিথ্যে কথা বলল কেন? নিশ্চয়ই অসুবিধের মধ্যে আছে। যতটা না ওর প্রতি সহানুভূতির জন্যে, তারচেয়ে বেশি কবীর চৌধুরীর সাথে অসহযোগিতা করার জন্যে মিথ্যে বলেছে মেয়েটা।

কবীর চৌধুরীর ভাষায়, শিরিন তার একটা মূল্যবান সম্পদ। তাহলে হয়তো সত্যি মানুষের মনের কথা ধরে ফেলতে পারে মেয়েটা, টেলিপ্যাথী জানে। দুর্লভ একটা গুণ, কিন্তু কোন কোন মানুষের মধ্যে এই গুণ সত্যিই থাকে। অন্তত সেইরকমই শুনেছে রানা।

মেয়েটা যদি সত্যি অসুবিধের মধ্যে থেকে থাকে—

একটা দায়িত্ব বোধ করল রানা। অল্প বয়স, সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, কিন্তু প্রতিভা বিকাশের কোন সুযোগ নেই। মিথ্যে প্রলোভন দেখিয়ে ঢাকা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে, আস্তানায় আটকে রেখে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করছে ওকে কবীর চৌধুরী…

এজেন্সির নির্দেশে একজন সার্জেন এল সাতটায়। তার ব্যাগ থেকে একটা হ্যাট, একটা রেনকোট, আর রানার ল্যুগারটা বেরোল। আঙুলটা পরীক্ষা করল সার্জেন, প্লাস্টার করে দিল।

'ফ্র্যাকচার,' মন্তব্য করল সে। 'সারতে কয়েক দিন সময় নেবে।'

সার্জেন বিদায় নেয়ার পর টেবিল থেকে কোল্টটা নিয়ে সুটকেসে ভরল রানা। ল্যুগার লোড করল। ব্রেকফাস্টের অর্ডার দেয়া যায়, ভাবল ও, তবে ট্রে রেখে ওয়েটার ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত বাথরুমে থাকতে হবে।

ফোনের দিকে হাত বাড়াতে যাবে, ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল সেটা। রিসিভার তুলল রানা, আন্দাজ করল: হয় পুলিস, নাহয় এফ. বি. আই.। কিন্তু না, এ সেই মধুকণ্ঠী মেয়েটা।

'হ্যালো? মি. মাসুদ রানা?' দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করল মেয়েটা, একটু হলেও হাঁপাচ্ছে।

চিনতে পারলেও পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, 'আপনি কে বলছেন?' রিসিভারে রুমাল চাপা দিয়ে নিয়েছে ও।

'আমি জানি, আপনিই মি. মাসুদ রানা,' বলল শিরিন আক্তার। 'আমাকে আপনি চিনতেও পেরেছেন।' একেবারে নিচু গলায় কথা বলছে সে, রিসিভারে ঠোঁট ঠেকিয়ে। 'মি. রানা…প্লীজ…'

অপেক্ষা করছে রানা, অপরপ্রান্তের দৃশ্যটা কল্পনার চোখে দেখার চেষ্টা করছে। মেয়েটা কি একা? কবীর চৌধুরীর আস্তানা থেকে ফোন করছে, জানে না আড়িপাতা যন্ত্র আছে সেটে? নাকি ওর পাশে থমথমে চেহারা নিয়ে বসে আছে কবীর চৌধুরী, তার কানেও একটা রিসিভার?

'প্লীজ, মি. রানা, আমাকে অবিশ্বাস করবেন না! সময় খুব কম, তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে আমাকে।'

'কোত্থেকে বলছেন?'

'ওষুধের একটা দোকান থেকে, কিন্তু এখুনি আমাকে আমার ঘরে ফিরে যেতে হবে। দয়া করে অন্য কিছু ভাববেন না…।'

'মি. রানার সাথে যদি যোগাযোগ হয়, কি বলব তাঁকে?'

'আশ্চর্য মানুষ তো! আপনাকে সাহায্য করলাম, এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলেন? যদি বলতাম, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন; আপনি মি. ওয়াইজের আসল পরিচয় জানেন, কবীর চৌধুরী আপনাকে জান নিয়ে বেরুতে দিত?' মনে হলো, খেপে গেছে মেয়েটা। 'আমার মায়ের কিরে খেয়ে বলছি, এটা কোন ফাঁদ নয়। প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়ে আপনাকে ফোন করছি।' আতঙ্কে কাঁপা কাঁপা শোনাল শিরিনের গলা। 'আপনার সাহায্য চাইছি আমি। আমাকে এই পাগলের হাত থেকে বাঁচান, প্লীজ…।'

তবু চিন্তা করছে রানা, কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না।

'ঠিক আছে, বুঝেছি,' হতাশ সুরে বলল শিরিন, 'ভুল হয়েছে আমার, ভুল জায়গায় নক করেছি। থ্যাংক ইউ, মি. আনগ্রেটফুল,' তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সুরে শেষ

কথাটা বলল সে।

'শোনো।' যদি অভিনয় হয়, এই মেয়ের অস্কার পাওয়া উচিত, ভাবল রানা। ওকে বিশ্বাস করা অনেকটা জুয়া খেলার মত। তবু, অকৃতজ্ঞ হওয়ার চেয়ে ঝুঁকিটা নেয়া উচিত। রিসিভার থেকে রুমাল সরাল ও। 'তুমি যদি দু'মুখো হও, শিরিন, স্রেফ মারা পড়বে। সাথে কাগজ-কলম আছে?'

'এক সেকেন্ড,' চাপা গলায় বলল শিরিন। 'হ্যাঁ।'

যদি ফাঁদ হয়, হাতের কাছে ওগুলো থাকারই কথা, ভাবল রানা। 'ঠিক দশটা বিশে পেনসিলভ্যানিয়া স্টেশনে চলে এসো। সিলভার ফ্যান্টম...,' ইতস্তত করল ও। 'ওয়াশিংটন যাবে। দুশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর কার, কমপার্টমেন্ট এইচ। বলবে তুমি মিসেস হায়দার। আমার যদি পৌঁছুতে দেরি হয়, কন্ডাক্টরের কাছে টিকেট পাবে। সোজা কমপার্টমেন্টে ঢুকে অপেক্ষা করবে আমার জন্যে। ঠিক আছে?'

'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ, আমি কৃতজ্ঞ...।'

'কেউ যেন দেখে না ফেলে,' সাবধান করে দিল রানা। 'বোরখা বা শাল দিয়ে চেহারা যতটা পারো ঢেকে রাখবে।'

'ঠিক আছে, অসংখ্য ধন্যবাদ। কথা দিচ্ছি, কেউ দেখতে পাবে না। সময় নেই, ছাড়ছি...।'

যোগাযোগ কেটে গেল, ধীরে ধীরে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। কপালে চিন্তার রেখা নিয়ে জানালার সামনে দাঁড়াল ও। বাইরে তাকাল, কিন্তু কিছু দেখছে না। আজেবাজে অনেক চিন্তা ভিড় করে আসছে মাথায়। হঠাৎ শ্রাগ করে জানালার সামনে থেকে সরে এল ও। ভাবল, সুন্দরী অনেক মেয়ে এর আগেও ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেছে তাকে—দেখা যাক না এ-ও তাদের একজন কিনা।

বাথরুমে ঢোকার আগে ফোনে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিল রানা।

হারলেম। বড় সুইচবোর্ড সামনে নিয়ে বসে আছে গোবিন্দ গোস্বামী। বসের নির্দেশে শহরের সবগুলো 'চোখ'-এর সাথে কথা বলছে সে। প্রথমে সে মাসুদ রানার চেহারার বর্ণনা জানিয়ে দিল। তারপর সাবধান করল, লোকটা ছদ্মবেশ নিয়েও থাকতে পারে। 'প্রতিটি রেল স্টেশনে, প্রতিটি বিমানবন্দরে নজর রাখো। হোটেল হিলটনের বাইরে থাকো। হাইওয়েতে টহল দাও। চিনতে পারা মাত্র সরাসরি আমাকে খবর দেবে। বস্ অপেক্ষা করছেন। প্রতিটি রেল স্টেশনে...'

আট

ফোনে ওর জন্যে একটা ট্যাক্সি ডাকতে বলল রানা। দু'মিনিট পর পোর্টার ফোন করে জানাল, 'ট্যাক্সি অপেক্ষা করছে, স্যার।'

হাতে সুটকেস, পরনে স্যুটের ওপর কান পর্যন্ত ঢাকা রেনকোট, গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে নিচের লবিতে নেমে এল রানা। হোটেল থেকে বেরোবার মেইন

গেট থেকে দূরে থাকল ও। করিডর থেকে পিছনের বারান্দায় বেরিয়ে এসে চারদিকটা ভাল করে দেখে নিল। বয়-বেয়ারারা আসা-যাওয়া করছে, কিন্তু ওর দিকে একবারের বেশি দু'বার তাকাল না। বাঁক নিয়ে আরেক বারান্দায় চলে এল ও, চেহারায় বেদনাকাতর ভাব নিয়ে ঢুকে পড়ল সার সার দোকানগুলোর শেষ মাথারটায়। এটা একটা ওষুধের দোকান।

কয়েকটা পেইনকিলার ট্যাবলেট কিনল রানা, তারপর রাস্তার ধারের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল। একটা খালি ট্যাক্সি ছুটে আসছে, হাত তুলে রানাও ছুটল। ট্যাক্সি থামল না, কারণ থামার সুযোগ পায়নি ড্রাইভার, চলন্ত ট্যাক্সির ওপর প্রায় লাফিয়ে পড়ল রানা। আহত হাতের তর্জনী হাতলে বাধিয়ে হ্যাঁচকা টান দিল ও, হালকা সুটকেসটা ট্যাক্সির ভেতর ছুঁড়ে দিয়ে নিজেও একলাফে উঠে পড়ল।

হোটেলের সামনে দিয়ে ছুটল ওর ট্যাক্সি। গেটের সামনে দুটো গাড়ি দেখা গেল। একটা ট্যাক্সি, ওর জন্যে ডাকা হয়েছে। অপরটা কালো অস্টিন। অস্টিনের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন বাজে চেহারার নিগ্রো। ড্রাইভিং সীটেও একজনকে দেখা গেল, লোকটা সম্ভবত শিখ। তিনজনই ওরা হোটেলের দিকে মুখ করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। মুচকি হাসল রানা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হওয়া ছাড়া আপাতত ওদের করার কিছু নেই। ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছে মনে মনে মাফ চেয়ে নিল ও।

কিন্তু পেনসিলভ্যানিয়া স্টেশনে ট্যাক্সি থেকে নামতেই ওদের চোখে ধরা পড়ে গেল রানা। দু'চাকার ঠেলাগাড়ি ঠেলতে ঠেলতে রানার পাশ ঘেঁষে হেঁটে গেল একজন নিগ্রো পোর্টার। সোয়া দশটা বাজে। গাড়িটা রেখে ফোন বুদে ঢুকল সে।

ট্রেন ছাড়তে যখন আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি, হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ল ট্রেনের একজন ওয়েটার। তাড়াহুড়ো করে তার জায়গায় আরেক নিগ্রো ওয়েটারকে ডিউটি করতে বলা হলো। ইতোমধ্যে লোকটাকে ফোনে বিস্তারিত নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হেড ওয়েটার পরিষ্কার বুঝল, গোটা ব্যাপারটার মধ্যে ঘাপলা আছে। কয়েকজন ওয়েটারের সাথে এ-নিয়ে কথা বলছে সে, এই সময় নতুন ওয়েটার এগিয়ে এসে হেড ওয়েটারকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেল। ফিসফিস করে অল্প দু'চারটে কথা বলল নতুন ওয়েটার। শুনে ফ্যাকাসে হয়ে গেল হেড ওয়েটারের চেহারা, কিরে-কসম খেয়ে বলল তার ভুল হয়ে গেছে, এ-ব্যাপারে আর সে ভুলেও মাথা ঘামাবে না।

চোদ্দ নম্বর গেট দিয়ে কাঁচ-ঘেরা প্ল্যাটফর্মে ঢুকল রানা। রূপালি রঙের সিকি মাইল লম্বা ট্রেন আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনের ম্লান আলোয় দাঁড়িয়ে আছে। পিছন দিকে ফোঁস ফোঁস করছে চার হাজার ঘোড়ার জোড়া ডিজেল ইলেকট্রিক ইউনিট। এঞ্জিনম্যান আর ফায়ারম্যানের কেবিন অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি, ঝলমল করছে, সামান্য একটু আঁচড়ের দাগ পর্যন্ত নেই কোথাও। বিভিন্ন মিটার আর এয়ার-প্রেশার ডায়ালগুলো শেষবারের মত পরীক্ষা করে নিচ্ছে তারা। দীর্ঘ যাত্রার প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন। যে-কোন মুহূর্তে রওনা হয়ে যাবে ট্রেন।

শহরের নিচে এই বিশাল কংক্রিটের পাতালে প্রায় জমাট বেঁধে আছে

নিস্তব্ধতা, কোন শব্দ হলে সাথে সাথে প্রতিধ্বনি জাগছে।

আরোহীর সংখ্যা বেশি নয়। নিউ ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, বালটিমোর, আর ওয়াশিংটন থেকে বেশ কিছু লোক উঠবে। একশো গজ হেঁটে এল রানা, খালি প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে পড়ল ওর জুতোর আওয়াজ। দুশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর কারের সামনে থামল ও, ট্রেনের প্রায় গোড়ার কাছে। দরজায় একজন পুলম্যান পোর্টার দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোকটার চোখে চশমা। কালো চেহারায় বিমর্ষভাব, তবে চোখে সরল দৃষ্টি।

'কমপার্টমেন্ট এইচ,' বলল রানা।

'মি. হায়দার, স্যার? ওয়েলকাম, স্যার। মিসেস হায়দার এইমাত্র পৌঁচেছেন।' পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল পোর্টার। ট্রেনে উঠে করিডর ধরে এগোল রানা। নরম তুলতুলে কার্পেট, গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে যায়। একদিকের দেয়ালে একটা নোটিস দেখল রানা। 'বাড়তি বালিশ দরকার? আরাম-আয়েশের যে-কোন ব্যবস্থার জন্যে আপনার পুলম্যান অ্যাটেনড্যান্টকে রিং করুন, তার নাম,' নোটিস বোর্ডে এরপর একটা ছাপা কার্ড পিন দিয়ে গাঁথা হয়েছে, 'মাইকেল বি. জেমিসন।'

করিডর ধরে ট্রেনের প্রায় অর্ধেকটা পেরিয়ে এল রানা। কমপার্টমেন্ট ই-তে অভিজাত চেহারার এক মার্কিন দম্পতিকে দেখা গেল, বাকি সব কামরা খালি। এইচ লেখা দরজাটা বন্ধ। হাতল ধরে ঘোরাল রানা, ভেতর থেকে তালা দেয়া।

'কে? কে?' উত্তেজিত মেয়েলি কণ্ঠস্বর।

'আমি,' বলল রানা।

কী হোলে চাবি ঢোকাবার আওয়াজ হলো, একটু একটু করে ফাঁক হলো দরজা। রানাকে দেখে আড়ষ্ট একটু হাসল শিরিন আক্তার, একপাশে সরে দাঁড়াল। ভেতরে ঢুকে সুটকেসটা রাখল রানা, বন্ধ করে দিল দরজা।

গাঢ় নীল রঙের সালোয়ার কামিজ পরেছে শিরিন। কালো একটা উলেন শাল দিয়ে গা ঢেকেছে, ঘোমটার ঢঙে মাথাটাও ঢাকা। দস্তানা পরা একটা হাত গলা ছুঁয়ে আছে, কালো শালের ফ্রেমে মুখের চেহারা বিবর্ণ। অসহায়, আর সন্ত্রস্ত হরিণীর মত লাগল। চোখ জোড়া ভয়ে কিছুটা বিস্ফারিত। কিন্তু তার এই ভীত-বিহ্বল চেহারা রানার চোখে দারুণ সুন্দর লাগল। ডিম্বাকৃতি মুখে রাজ্যের সরলতা, হাত দিয়ে স্পর্শ করতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে প্রাণভরে আদর করতে।

'খোদাকে হাজারো শোকর,' বিড়বিড় করে বলল মেয়েটা।

চট করে কামরার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল রানা। বাথরুমের দরজা খুলে ভেতরটা দেখল। খালি।

বাইরে একটা বেল বেজে উঠল তীক্ষ্ণ শব্দে। সাথে সাথে গতি সঞ্চার হলো ট্রেনে। অটোমেটিক সিগন্যাল পেরিয়ে আসার সময় আরেকবার বেল বাজল, তারপর প্রতি মুহূর্তে বাড়তে লাগল ট্রেনের গতি। ভাগ্যে যাই থাক, রওনা হয়ে গেছে ওরা।

'কোন্ সীটটা পছন্দ তোমার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'যে-কোন একটা হলেই চলবে,' বলল শিরিন। 'আপনি বলুন।'

'আপনি?' মৃদু হাসল রানা। 'আমি কি মিসেস হায়দারের সাথে কথা বলছি না?'

'কেউ তো নেই এখানে।' রানার রসিকতায় হাসল না শিরিন। 'তাছাড়া, আমাদের ভাষা বুঝবে কে?' ভয় ভয় ভাবটা এখনও সে কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

রানার মনে হলো, মেয়েটা ওকে বোল্ড আউট করে দিয়েছে। হাত তুলে হার মানার ভঙ্গি করল ও, বলল, 'যথার্থই বলেছেন, আপনার যুক্তি অকাট্য।'

হেসে ফেলল শিরিন। ঘাড়টা একবার কাত করল। 'বোঝা গেল পাল্টা ব্যবস্থা নিতে আপনি দেরি করেন না।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু দেখল শিরিনের চেহারায় আবার সন্ত্রস্ত ভাবটা ফিরে এসেছে। অভয় দিতে ইচ্ছে করল, কিন্তু পরে আবার নিজের কাছে হাসির খোরাক হতে না হয় ভেবে চুপ করেই থাকল। ব্যাপারটা এখনও পরিষ্কার নয়। কে বলবে ওকে কবীর চৌধুরী পাঠায়নি?

তবে, ভাবল রানা, বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটার মন নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, তার ব্যাপারে এখনও কোন আগ্রহ জন্মায়নি। খুঁটিয়ে দেখার চোখ নিয়ে এখনও একবার তাকায়নি পর্যন্ত।

আপনমনে কাঁধ ঝাঁকিয়ে এঞ্জিনের দিকে পিছন ফিরে বসল রানা। ওর সামনের চেয়ারে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসল শিরিন। নার্ভাস।

এখনও টানেলের ভেতর রয়েছে ট্রেন।

গা থেকে শাল খুলে সীটের ওপর নিজের পাশে রাখল শিরিন। কয়েকটা ক্লিপ খুলে মাথা ঝাড়া দিল, ফুলে-ফেঁপে উঠে দুই কাঁধে স্তূপ হলো ব্লু-ব্ল্যাক চুল। তার চোখের নিচে ফর্সা চামড়া নীলচে দেখে রানা বুঝল, সে-ও ঘুমাতে পারেনি কাল রাতে।

দু'জনের মাঝখানে একটা টেবিল। হাতের দস্তানা খুলতে গিয়ে কি মনে করে থেমে গেল শিরিন। হঠাৎ হাতটা বাড়িয়ে রানার ডান কব্জি চেপে ধরল সে, নিজের দিকে খানিকটা টানল, তারপর মৃদু একটা চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল। চোখের কোণ চিক চিক করে উঠল তার। 'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'আমি জানি, আমাকে বিশ্বাস করতে বলে তোমাকে আমি কঠিন সমস্যায় ফেলে দিয়েছিলাম।'

'বিশ্বাস করতে পারায় আমি খুশি,' বলল রানা, অপ্রতিভ দেখাল ওকে। নারী চিরকালই রহস্যময়ী, কিন্তু এই মেয়েটার রহস্য ভেদ করা খুব কঠিন হবে বলে মনে হলো ওর। শিরিনের শারীরিক উপস্থিতির সাথে নিজেকে এখনও যেন খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না ও। সিগারেট আর লাইটারের জন্যে পকেট হাতড়াতে শুরু করল ও।

চেহারায় অপরাধী ভাব নিয়ে তাকিয়ে থাকল শিরিন।

'তোমার ঘুম পেয়েছে?' সিগারেটে ঘন ঘন কয়েকটা টান দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'পেলেও ঘুমাব না। আমার ভয় করছে। সেই সেন্ট পিটার্সবার্গে গিয়ে ঘুমাব।'

চোখ সরু হয়ে গেল রানার, হাসিটা ছাপটুকু নিমেষে মিলিয়ে গেল।

'ফোনে তোমাকে ইতস্তত করতে শুনে বুঝলাম, আসলে ওয়াশিংটন যাচ্ছ না তুমি,' বলল শিরিন, '—কবীর চৌধুরীর ধারণাই ঠিক, সেন্ট পিটার্সবার্গে চলেছ তুমি।'

'কবীর চৌধুরী…'

'তাকে আমি তার লোকদের সাথে কথা বলতে শুনেছি,' বলল শিরিন। 'লং ডিসট্যান্স ফোন কলে সানডাক নামে এক লোকের সাথে কথা বলছিল। সানডাককে বলল, টামপার এয়ারপোর্ট আর ট্রেনের ওপর নজর রাখতে হবে। আমাদের বোধহয় আগেই ট্রেন থেকে নেমে পড়া উচিত, টারপুন স্প্রীঙে বা উপকূলের অন্য কোন ছোট স্টেশনে। ওরা কি তোমাকে ট্রেনে উঠতে দেখেছে?'

'আমার অন্তত জানা নেই,' বলল রানা। নরম হয়ে এল দৃষ্টি। 'তোমাকে? পালিয়ে আসতে অসুবিধে হয়নি তোমার?'

'আজ আমার বাজনা শিখতে যাবার দিন ছিল,' বলল শিরিন। 'এক ভারতীয়…'

'কি শেখো? সরোদ?' বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

অবাক দেখাল শিরিনকে। 'তুমি জানলে কিভাবে?'

'জানি না, আন্দাজ করছি,' বলল রানা। 'সরোদের প্রতি দুর্বলতা আছে কবীর চৌধুরীর। সরোদে তার মত গুণী শিল্পী দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ।'

রানার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল শিরিন। 'তুমি ওর প্রশংসা করছ!'

'ওর একটা গুণের,' অন্যমনস্ক দেখাল রানাকে। 'প্রশংসার যোগ্য আরও কিছু গুণ আছে ওর। কি যেন বলছিলে?'

'সরোদের প্রতি ওর দুর্বলতার কথা আমিও টের পেয়ে যাই,' বলল শিরিন। 'সেই সাথে ওর আস্তানা থেকে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও মুক্তি পাবার একটা বুদ্ধি আসে যায় মাথায়। সরোদ শিখতে চাই বলতেই রাজি হয়ে গেল। এক ভারতীয় ওস্তাদ শেখায় আমাকে। বুড়ো মানুষ, তাই আমাকেই তাঁর বাড়িতে যেতে হয়।'

'একা তোমাকে ছাড়ে?'

'মাথা খারাপ! ওস্তাদের বাড়িতে গাড়ি করে সকালে পৌঁছে দেয় এক লোক, আবার দুপুরের খানিক আগে গিয়ে নিয়ে আসে,' বলল শিরিন। 'কোন কোন দিন খুব সকালে বেরুই, ওস্তাদের সাথে বসে নাস্তা করি।' হাতঘড়ির দিকে তাকাল সে। রানা লক্ষ করল, ঘড়িটা অত্যন্ত দামী, হীরে আর প্ল্যাটিনাম দিয়ে তৈরি। 'আর এক ঘণ্টা পর আমার খোঁজ পড়বে। গাড়িটা ফিরে যেতেই রাস্তায় বেরিয়ে আসি আমি, ফোন করি তোমাকে।'

'এতক্ষণ কাটল কিভাবে?'

'টাকা আর গহনা বাদে সাথে আর কিছু নিয়ে বেরুইনি,' বলল শিরিন। 'একটা সুপারমার্কেটে ঢুকে কেনাকাটা করতে হলো।'

'টাকা আর গহনা মানে?'

ফিক করে একটু হাসল শিরিন। 'না, চুরি করিনি। আমাকে দেয়া কবীর

চৌধুরীর উপহার। ভবিষ্যৎ বলে, বা মানুষের মনের কথা ফাঁস করে দিয়ে খুশি করতে পারলে…'

'কাল রাতে মিথ্যে বলে কি উপহার পেলে?'

'হয়তো পেতাম, কিন্তু তুমি তার লোকদের মেরে ফেলায় রাগে উন্মাদ হয়ে গেল কবীর চৌধুরী। এরকম অস্থির হতে তাকে আগে কখনও দেখিনি আমি।'

'তুমি তাহলে পালাবার মতলবেই বেরিয়ে এসেছ,' বলল রানা। 'কিন্তু আমি যদি তোমাকে বিশ্বাস না করতাম?' মনে মনে বলল, বিশ্বাস করা ঠিক হচ্ছে কিনা এখনও জানি না। 'কি করতে তুমি?'

'আমার মন বলছিল, তুমি আমাকে সাহায্য করবে।' শিরিনের মায়াভরা চোখে শিশুর সারল্য।

'মন কি সব সময় ঠিক কথাটা ধরতে পারে?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে শিরিন বলল, 'আমারটা পারে।'

এ-প্রসঙ্গে আর কথা বাড়াতে ইচ্ছে করল না রানার, শুধু মৃদু একটু কাঁধ ঝাঁকাল।

জানালা দিয়ে ইঙ্গিতে বাইরেটা দেখাল শিরিন। টানেল থেকে বেরিয়ে এসেছে ট্রেন। নিউ ইয়র্ক আর ট্রেনটনের মধ্যবর্তী অনুর্বর প্রান্তরের ওপর দিয়ে ছুটছে। 'তুমি আমাকে নতুন জীবন দিয়েছ,' আপনমনে কথা বলছে সে। 'প্রায় এক বছর, প্রায় এক বছর ধরে দানবটার খাঁচায় বন্দী আমি। কিন্তু জানতাম, একদিন আমি মুক্তি পাব। জানতাম, একজন আসবে।' রানার দিকে ফিরল সে। 'সে যে তুমি, কাল তোমায় দেখেই বুঝতে পারি।'

'এরপর বলবে, আমার কাছে তুমি চিরকৃতজ্ঞ,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'আসলে শোধ-বোদ হয়ে গেছে। কাল রাতে তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ,' চোখে অদ্ভুত কৌতূহল নিয়ে তাকাল ও, 'মানে, সত্যি যদি তোমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে কিছু থাকে।'

'হ্যাঁ,' বলল শিরিন, 'আছে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কিনা জানি না, তবে কিছু একটা আমার মধ্যে আছে। কি ঘটতে যাচ্ছে প্রায়-সময় আমি তা আগেভাগে দেখতে পাই, বিশেষ করে অন্য লোকদের বেলায়। ঢাকায় তো অল্প ক'দিনে খুব নাম হয়েছিল আমার, কিন্তু মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে কবীর চৌধুরী এখানে নিয়ে এল আমাকে, আমার ক্যারিয়ারের বারোটা বেজে গেল।' আবার রানার হাতটা ধরে মৃদু চাপ দিল সে। 'তোমাকে প্রথম দেখেই আমি বুঝতে পারি, তুমি এসেছ আমাকে উদ্ধার করার জন্যে। আমি,' তার চেহারা লালচে হয়ে উঠল, 'উদ্ভট সব জিনিস দেখতে পাই।'

'উদ্ভট?'

'মানে, ব্যাখ্যা করে বলা কঠিন,' শিরিনের চোখ জোড়া নাচতে শুরু করল। 'যেমন, আমি দেখেছি, তোমার বাম হাতটা জখম হয়েছে। যেমন, আমি জানি তোমার আমার দু'জনের সামনেই বিপদ আছে। আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে, রানা।'

'চেষ্টার ত্রুটি করব না,' আশ্বাস দিল রানা। 'প্রথম কাজ, দু'জনেরই একটু ঘুমিয়ে নেয়া। কিছু খাওয়া উচিত, তোমার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। স্যান্ডউইচ আর কফি?'

মাথা ঝাঁকাল শিরিন।

'একটা কথা।' রানার চেহারায় কৃত্রিম গাম্ভীর্য। 'ভুলে গেলে চলবে না, পরস্পরের সাথে দু'জনই আমরা জড়িয়ে পড়েছি। আমরা স্বামী-স্ত্রী। আমার সাথে মিসেস হায়দারের মত ব্যবহার করবে তুমি।' একটু থেমে শেষ কথাটা বলল রানা, 'অবশ্য নির্দিষ্ট একটা সীমা পর্যন্ত আর কি।'

'সেই সীমা কে নির্ধারণ করবে?' হাসি চেপে জিজ্ঞেস করল শিরিন।

'ভোটাভোটি হবে,' বলল রানা। 'তুমি আমি ছাড়াও ভোটার রয়েছে আমাদের বয়স, কামনা-বাসনা, লোভ, ব্যক্তিত্ব, লজ্জা, আর পরিবেশ।'

খিলখিল করে হেসে উঠল শিরিন। খুঁটিয়ে দেখল রানাকে। কথা না বলে, চোখ না সরিয়ে, জানালার নিচের বোতামটা টিপে দিল সে।

'যেহেতু স্বামী-স্ত্রী, হোটেলে আমাদের একটাই রুম ভাড়া নিতে হবে। অর্থাৎ,' বলল রানা, 'একসাথেই শুতে হবে আমাদের।'

কন্ডাক্টর আর অ্যাটেনড্যান্ট একসাথেই কমপার্টমেন্টে ঢুকল। কফি আর চিকেন স্যান্ডউইচ চাইল রানা।

'আপনার স্ত্রীর ভাড়াটা বাকি আছে, মি. হায়দার,' বলল কন্ডাক্টর।

'অবশ্যই,' বলল রানা। দেখল, শিরিন তার হ্যান্ডব্যাগের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। 'থাক, ডার্লিং,' বলল ও, পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল। 'বাড়ি ছাড়ার আগে সব টাকা আমাকে দিলে, ভুলে গেছ?'

'গিন্নীদের কাছে তারপরও কিছু থাকে,' হাসতে হাসতে বলল কন্ডাক্টর। 'রেখে দেন, ম্যাডাম, সেন্ট পিটার্সবার্গে কেনাকাটার অনেক কিছু আছে। আগে কখনও ফ্লোরিডায় গেছেন আপনারা?'

'না,' বলল রানা।

'কামনা করি আপনাদের ভ্রমণ সুখের হোক।'

দরজা বন্ধ হতেই হেসে উঠল শিরিন। 'এত সহজে উচ্চারণ করলে, মনে হলো যুগ যুগ ধরে ডার্লিং বলা অভ্যেস করেছ। এভাবে যদি আমাকে লজ্জায় ফেলো, আমিও কিন্তু পাল্টা ব্যবস্থা নেব!' সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'নিশ্চয়ই আমাকে পেত্নী দেখাচ্ছে,' রানার মাথার পিছনে বাথরুমের দরজার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'যাই, ফ্রেশ হয়ে আসি।'

'ডার্লিং বললে যে খুশি হয় না,' বাথরুমের দরজা বন্ধ হবার ঠিক আগের মুহূর্তে বলল রানা, 'তাকে আমি শাঁকচুন্নী বলি।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। ট্রেনটন শহরে পৌঁছে গেছে ট্রেন, আঁকা ছবির মত বাড়ি-ঘর দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছে। গতি মন্থর হয়ে এল ট্রেনের।

ক্ষতি বৃদ্ধির হিসেব পরে হবে, ভাবল ও, সাথী হিসেবে শিরিন ওর সঙ্গে থাকছে। অনেক প্রশ্নের উত্তর জানা নেই ওর, কিন্তু সে-সব জিজ্ঞেস করবার সময়

এখনও আসেনি। আপাতত শুধু একটা ব্যাপারে চিন্তিত ও—পাল্টা আঘাত।

পাল্টা আঘাত যে আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, আরও একটা আঘাত করা হয়েছে কবীর চৌধুরীকে—যেখানে সবচেয়ে বেশি লাগবে: তার অহমিকায়।

শিরিনের গল্প বিশ্বাসযোগ্য হলেও হতে পারে। আলাপের শুরুতেই জড়তা অনেকখানি কেটে গেছে। সুন্দরী নারীর সঙ্গ কে না উপভোগ করতে চায়। তার ওপর, মেয়েটা ভারি বুদ্ধিমতী। অন্তত একঘেয়েমির শিকার হবার কোন কারণ ঘটবে না।

বাথরুমের দরজায় শব্দ হতে ঘাড় ফেরাল রানা। ধীরে পায়ে হেঁটে এসে রানার সামনের সীটে বসল আবার শিরিন। চেহারা থেকে ক্লান্তির ভাব মুছে গেছে, চোখে সকৌতুক হাসির ঝিলিক। ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে রানাকে কিছুক্ষণ দেখল সে। তারপর বলল, 'তুমি আমার কথা ভাবছিলে।'

চোখ ফিরিয়ে নিয়ে একটা সিগারেট ধরাল রানা।

'কিছু জিজ্ঞেস কোরো না,' আবার বলল শিরিন। 'সময় হলে সব এক সময় তোমাকে বলব আমি।'

'এখন নয়?'

'এই জন্যে নয় যে এই মুহূর্তে আমার অতীত আমি ভুলে থাকতে চাই,' হঠাৎ বিষণ্ন দেখাল শিরিনকে। মুখের সামনে হাত তুলে একটা হাই তুলল সে। 'আমার ঘুম পেয়েছে। কোন্ বিছানাটা আমার?'

'নিচেরটা আমার,' বলল রানা। 'সাবধানের মার নেই, মেঝের কাছাকাছি থাকতে চাই।' শিরিনের সন্ত্রস্ত ভাব লক্ষ করে আবার বলল ও, 'বলছি না বিপদ হবে। তবে, কবীর চৌধুরীর হাত খুব লম্বা, বিশেষ করে নিগ্রো মহলে। নিশ্চয়ই জানো, এ-দেশের রেলওয়েতে ওদের সংখ্যাই বেশি?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল শিরিন।

লাঞ্চ নিয়ে এল অন্যমনস্ক এক নিগ্রো। চেহারা দেখে মনে হলো এ জগতেই যেন নেই, তাড়াতাড়ি বিল নিয়ে কেটে পড়তে পারলে বাঁচে।

লাঞ্চ শেষ করে বোতাম টিপে পুলম্যান পোর্টারকে ডাকল রানা। তাকে অস্বাভাবিক নির্লিপ্ত দেখল, যেন পণ করে এসেছে রানার চোখের দিকে ভুলেও তাকাবে না।

বিছানা তৈরি করতে অযথা বেশি সময় নিল লোকটা। ভাব দেখাল, হাত-পা নাড়ার যথেষ্ট জায়গা পাচ্ছে না সে। তারপর, হঠাৎ করে, যেন তার সাহস ফিরে এল। এই প্রথম রানার দিকে ফিরল সে, বলল, 'মিসেস যদি পাশের ঘরে অপেক্ষা করেন তাহলে বোধহয় ভাল হয়, ততক্ষণে ঘরটা আমি গুছিয়ে দিই।' রানার দিকে ফিরেছে বটে, কিন্তু তাকিয়ে আছে রানার মাথার ওপর দিয়ে পিছন দিকে। 'পাশের কামরাটা সেই সেন্ট পিটার্সবার্গ পর্যন্ত খালি থাকবে।' রানার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে দুই কামরার মধ্যবর্তী দরজার তালা খুলল সে।

রানার চোখ নড়া দেখে ইঙ্গিত পেয়ে গেল শিরিন। পাশের ঘরে ঢুকে করিডরের দিকের দরজা বন্ধ করল সে। নিগ্রো পোর্টার ব্যস্ত হাতে দুই কামরার মাঝখানের দরজা বন্ধ করে দিল।

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল রানা, পোর্টারের নামটা স্মরণ করার চেষ্টা করল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এবার বলো কি বলতে চাও, জেমিসন।'

পোর্টারের চেহারায় স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল। সরাসরি রানার দিকে তাকাল সে। 'বলব বৈকি, স্যার, বস্। কিন্তু তার আগে আপনাকে কথা দিতে হবে আমি যে আপনাকে এ-সব বলছি তা কেউ জানবে না। জানলে…খুন হয়ে যাব আমি।'

'কেউ জানবে না, জেমিসন,' কথা দিল রানা।

'ট্রেনে আপনার শত্রু আছে, স্যার, বস্। বিলিভ মি, স্যার। এমন সব কথা শুনছি, ভয় লাগছে আমার। দুঃখিত, এর বেশি কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সাবধানে থাকবেন, এইটুকুই আমার অনুরোধ।'

'কি শুনেছ পরিষ্কার করে বলো, জেমিসন,' বলল রানা। 'তোমার কোন ভয় নেই।'

'আপনি বিদেশী লোক, মি. হায়দার,' নিচু গলায় বলল জেমিসন, 'এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানেন না।' পকেট থেকে কাঠের দুটো ছোট টুকরো বের করল সে। 'এগুলো রাখুন, বস্। দরজার তলায় ঢুকিয়ে দেবেন। এর বেশি কিছু করার নেই আমার। বলছেন ভয় নেই, কিন্তু আমি জানি, আপনাকে আমি সাবধান করেছি জানলে ওরা আমার গলা কাটবে।'

কাঠের টুকরো দুটো নিল রানা। 'কিন্তু…।'

দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল জেমিসন। 'দুঃখিত, স্যার, বস্। আজ সন্ধ্যায় ফোন করলে আপনাদের জন্যে ডিনার নিয়ে আসব আমি। আর কাউকে এ-ঘরে ঢুকতে দেবেন না।'

হাতটা লম্বা করে দিল জেমিসন, একশো ডলারের নোটটা নিয়ে পকেটে ভরল।

'আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব করব, স্যার, বস্,' আবার বলল সে। 'কিন্তু আমি সাবধান না হলে ওরা আমাকে যমের বাড়ি পাঠাবে।' দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল সে।

এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল রানা। তারপর পাশের ঘরের দরজাটা খুলল। খবরের কাগজ পড়ছে শিরিন।

'ঘর গোছানো শেষ,' বলল রানা। 'বক বক করে জীবনী শুনিয়ে গেল ব্যাটা। তুমি বাসায় না ওঠা পর্যন্ত আমি দূরে সরে থাকি। তোমার হয়ে গেলে ডেকো।'

শিরিন চলে গেল, তার ছেড়ে যাওয়া চেয়ারে বসল রানা। ফিলাডেলফিয়ার মাঠ, খেত, আর বাড়ি-ঘর সবেগে পিছু হটছে, সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা সিগারেট ধরাল ও। ভাবল, যতক্ষণ পারা যায় শিরিনকে অন্ধকারে রাখাই ভাল। খামোকা ওকে আতঙ্কিত করে লাভ নেই।

নতুন বিপদ এত তাড়াতাড়ি আসবে বলে ধারণা করেনি ও। ওর ওপর যারা

নজর রাখছে তারা যদি শিরিনের পরিচয় জেনে থাকে, তাহলে শিরিনও নিরাপদ নয়।

'রানা?' ডাকল শিরিন।

ঘর প্রায় অন্ধকার, শুধু বেড-লাইট জ্বলছে।

'ঘুমাবে না?' শালটা গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে শিরিন।

'এই তো।' একে একে দুটো দরজার তলায় কাঠের টুকরো গুঁজে দিল রানা। কোট খুলে অ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজল। বিছানায় উঠে ডান দিকে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। নরম বিছানা, ঘুমে জড়িয়ে এল চোখ। ট্রেনের সাথে শরীরটা দোল খাচ্ছে।

'ঘুমালে?' অস্ফুটে ডাকল শিরিন।

'উঁ?'

'আচ্ছা, ঘুমাও।'

ওপর থেকে উঁকি দিয়ে নিচের বিছানায় তাকাল শিরিন। বেড-লাইটের মৃদু আলোয় অনেকক্ষণ ধরে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। তারপর সিধে হয়ে শুলো আবার।

পাঁচ মিনিট পর গা থেকে ধীরে ধীরে শালটা সরাল শিরিন। আবার উঁকি দিয়ে নিচে তাকাল। মৃদু নাক ডাকছে রানা। কুঁকড়ে শুয়ে আছে ও, বোধহয় শীত করছে ওর।

অত্যন্ত সাবধানে বিছানার ওপর উঠে বসল শিরিন। নিচে পা দুটো ঝুলিয়ে দিয়ে রানার বিছানার ওপর আঙুলগুলো রাখল। অনেক সময় নিয়ে, সতর্কতার সাথে মেঝেতে নামল সে। শালটা রানার গায়ে বিছিয়ে দিয়ে আবার উঠে পড়ল নিজের বিছানায়।

মুচকি একটু হেসে ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

নয়

কু-উ-উ। তুমুল বেগে ছুটে চলেছে ট্রেন। পেনসিলভ্যানিয়া আর মেরীল্যান্ড পেরিয়ে এসেছে ওরা। ওয়াশিংটনে দীর্ঘ বিরতি ছিল, রানা তখন ঘুমিয়ে। একাধিক এঞ্জিনের শব্দ, ঢং ঢং ঘণ্টার আওয়াজ, লোকজনের চেঁচামেচি, আর লাউডস্পীকারের গোলযোগে ঘুম একবার ভাঙলেও আবার তলিয়ে যায় ও। ভার্জিনিয়াও পেরিয়ে এল ট্রেন। একটা ক্রসিং পেরোবার সময় ঘটাং ঘটাং আওয়াজে ওদের ঘুম ভাঙল, ঘড়িতে তখন সাতটা। আলো জ্বালার আগে দরজার তলা থেকে কাঠের টুকরো দুটো বের করে নিল রানা। তারপর অ্যাটেনড্যান্টকে ডাকল।

বাথরূম থেকে বেরিয়ে এল শিরিন। মেনু নিয়ে এক মিনিট তর্ক করল ওরা। শিরিনের ইচ্ছে দু'জনে একই খাবার খাবে। শেষ পর্যন্ত ওমলেট, ভেজিটেবল সূপ সসেজ, চিকেন রোস্ট, সালাদ, আর স্যান্ডউইচের অর্ডার দিল ওরা।

রাত ন'টায় টেবিল পরিষ্কার করতে এল জেমিসন। জিজ্ঞেস করল, আর কিছু

ওদের দরকার কিনা।
কি যেন চিন্তা করছিল রানা, মুখ তুলে তাকাল। 'বলতে পারো জ্যাকসনভিলে কখন পৌঁছুব আমরা?'
'সকাল পাঁচটার দিকে, স্যার, বস্।'
'ওখানে প্ল্যাটফর্মে সাবওয়ে আছে?'
'আছে। ট্রেন তো সাবওয়ের ঠিক পাশে থামবে।'
'তাড়াতাড়ি দরজা খুলে সিঁড়িটা লাগাতে পারবে তুমি?'
জেমিসন হাসল। 'চোখের নিমেষে, স্যার, চোখের নিমেষে।'
দশ ডলারের পাঁচটা নোট বাড়িয়ে দিল রানা। 'সেন্ট পিটার্সবার্গে যখন পৌঁছুব আমরা, তোমার সাথে হয়তো আমার দেখাই হবে না।'
নিগ্রো পোর্টারের মুখে নিঃশব্দ হাসি। 'আপনার খুব দয়া, স্যার। গুডনাইট, বস্। গুডনাইট, ম্যাম।' কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল সে।
উঠল রানা, আবার দরজা দুটোর তলায় কাঠের টুকরো গুঁজে দিয়ে এল।
'আচ্ছা,' ফিসফিস করে বলল শিরিন, 'তাহলে এই ব্যাপার!'
'হ্যাঁ, সাবধানের মার নেই,' বলল রানা। 'জেমিসন একটা খবর দিয়েছে আমাকে।'
সব শুনে শিরিনের মুখ শুকিয়ে গেল। 'অবাক হইনি,' বলল সে। 'নিশ্চয়ই ওরা তোমাকে স্টেশনে ঢুকতে দেখেছে। কবীর চৌধুরীর বিরাট একটা গুপ্তচর বাহিনী আছে, তাদের "চোখ" বলা হয়। স্রেফ ইনফরমার, তা মনে কোরো না। প্রত্যেকটা খুনী। অথচ এদের কারও নামেই কোন পুলিস রেকর্ড নেই। তার কারণ কি জানো?'
চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে থাকল রানা।
'কারণ, এদেরকে খুন করার নির্দেশ দিয়েই সংশ্লিষ্ট থানায় মোটা টাকা ভেট পাঠিয়ে দেয় কবীর চৌধুরী,' বলল শিরিন।
'ওর সম্পর্কে আর কি জানো তুমি?' জিজ্ঞেস করল রানা।
'আসলে আমার সম্পর্কে জানতে চাইছ তুমি,' মৃদু হেসে বলল শিরিন। 'কবীর চৌধুরী সম্পর্কে, আমার ধারণা, কিছুই তোমার অজানা নেই।'
'তোমার এরকম ধারণার কারণ?'
'তোমার সম্পর্কে যখন সব জানে কবীর চৌধুরী, কাজেই ধরে নিয়েছি...
'কবীর চৌধুরী আমার সম্পর্কে সব জানে, সেটাই বা তুমি জানলে কিভাবে? এক মিনিট, তার আগে বলো, মি. ওয়াইজ যে কবীর চৌধুরী, কে তোমাকে বলল?'
হেসে উঠল শিরিন। 'দেখলে তো, আমার কথাই ঠিক। ঘুরিয়ে প্রশ্ন করছ, আসলে জানতে চাইছ আমারই সম্পর্কে।'
নিরীহ ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল রানা, 'নিজের স্ত্রী সম্পর্কে জানতে চাওয়া কি অপরাধ?'
জিভের ডগা বের করে রানাকে ভেংচে দিল শিরিন। 'হায় প্রাণেশ্বর! ফুলশয্যার রাতে যে ঘুমিয়ে পড়তে হয় না, সখীরা কি তোমাকে সে-কথাটিও বলে

দেয়নি?'

'আস্তে-ধীরে এগোচ্ছি,' বলল রানা। 'প্রথমে ওই শাল থেকে তোমার গায়ের গন্ধ নিলাম।'

'কি? অ্যাঁ? তুমি জেগে ছিলে···!' বিস্ময়ে, লজ্জায় লালচে হয়ে উঠল শিরিন।

'আমি কি তা বলেছি? হয়তো ঘুমের মধ্যে নিয়েছি গন্ধটা। জানতাম শালটা তুমি আমার গায়ে দিয়ে যাবে।'

'কথার রাজা,' হার মানার ভঙ্গি করল শিরিন, 'তোমার সাথে পারা মুশকিল। বলো, কি জানতে চাও?'

প্রশ্নটা আবার করল রানা।

'একটা তথ্য দিচ্ছি, দেখো এ-থেকে তোমার প্রশ্নের উত্তর পাও কিনা,' বলল শিরিন। 'আমি ড. ফয়সল আক্তারের মেয়ে।'

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। 'প্রফেসর ফয়সল আক্তার? বিখ্যাত বায়োলজিস্ট? বছরখানেক আগে যিনি নিউ ইয়র্কে রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান?'

মাথা ঝাঁকাল শিরিন। চোখ নামিয়ে শুরু করল, 'ইন্টারমিডিয়েট পাস করলাম, মা মারা গেল। বড় ভাইয়ের সংসারে অ্যাডজাস্ট করতে পারছিলাম না।' রানার দিকে তাকাল সে। ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ একটু হাসি ফুটল। 'কারও হাত ধরে বেরিয়ে পড়ব, তাও হলো না। বোধহয় ভবিষ্যৎ বলতে পারি দেখে ছেলেরা আমাকে ভয় করত।'

'যতদূর মনে পড়ে,' বলল রানা, 'হাত দেখাটাকে প্রফেশন হিসেবেই নিয়েছিলে তুমি। কাগজে যেন বিজ্ঞাপনও দেখেছি।'

'ভাবীর বুদ্ধি, কুবুদ্ধিও বলতে পারো,' বলল শিরিন। 'বলল, গুণ যখন একটা আছে, সেটা ব্যবহার করে ভায়ের সংসারে কিছু টাকা ফেলো, তা না হলে নিজের পথ দেখো। বছরখানেক করি কাজটা। এই সময় কবীর চৌধুরী ঢাকায় ফিরল। তার সম্পর্কে খারাপ কিছু ভাবার অবকাশ ছিল না। বাবার সাথে অনেক দিনের সম্পর্ক। নিউ ইয়র্কে বাবা তার ল্যাবরেটরিতেই গবেষণার কাজ করেন বলে জানতাম।'

'তারপর?'

'কবীর চৌধুরী বলল, তোমার বাবা খুব ব্যস্ত, তাই আমিই তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। সরল বিশ্বাসে তার সাথে চলে এলাম। এসে শুনি, দু'দিন আগে মারা গেছেন বাবা। কবীর চৌধুরী আমাকে সান্ত্বনা দিল। বলল, দেশে ফিরে গিয়ে আর লাভ কি, তুমি আমার কাছেই থাকবে। আমিও আপত্তি করলাম না। ভাবলাম, একটা চাকরি জুটিয়ে নেব। কিন্তু কয়েক দিন যেতেই বুঝলাম কবীর চৌধুরী খুনে-বদমাশদের একটা দল পুষছে। একদিন জিজ্ঞেস করতে বলল, প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আমার প্রধান শত্রু। আর শোনো, তোমার কোন অভাব রাখব না, কিন্তু এখন থেকে তুমি আমার বন্দী। শুধু আমি যা করতে বলব তাই করবে তুমি। বুঝলাম, ভয়ঙ্কর এক ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছি। কবীর চৌধুরী পাগল হয়ে গেছে।'

'আমার সম্পর্কে…'

'মাঝে মধ্যে খুব ভাল ব্যবহার করত আমার সাথে,' বলল শিরিন। 'একদিন ওর এক অ্যালবামে একটা ছবি দেখে জিজ্ঞেস করলাম, কার ছবি? ওটা তোমার ছবি ছিল। বলল, আমার জীবনের কাল, মূর্তিমান অভিশাপ। সারা দুনিয়ায় কাউকে যদি ভয় করি তো ওই ছোকরাকে। শত্রু হলেও, ওর প্রশংসা না করলে অন্যায় হবে…'

'মাফ চাই,' হাতজোড় করল রানা। 'প্রশংসাগুলো বয়ান করে লজ্জা দিয়ো না। ধন্যবাদ, প্রায় সব প্রশ্নেরই উত্তর পেয়ে গেছি আমি।'

'তা বললে শুনব কেন?' ফোঁস করে উঠল শিরিন। 'আমার কথা যে এখনও শেষ হয়নি, তার কি?'

'আর কি কথা?'

হঠাৎ কি ভেবে লজ্জা পেল শিরিন। বলল, 'নাহ্ থাক।'

'কেন, থাকবে কেন? বলো।'

'তুমি বিশ্বাস করবে না।'

'করব। তিন কিরে।'

'তোমার ছবি দেখে মনে হলো…'

'মনে হলো, এই ছেলেটাকে আমি ভালবাসব।'

রানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর চুল খামচে ধরল শিরিন। 'মেরেই ফেলব!'

'মজার কথা কি জানো,' শিরিনের হাত দুটো ধরে নিজের দিকে টানল রানা, 'তোমার খেপে যাওয়ায় প্রমাণ হলো, সত্যি তুমি তাই ভেবেছিলে।'

'ভেবেছিলামই তো, ভাববই তো…।' হঠাৎ গা ঢিল করে দিয়ে রানার বুকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল শিরিন। চুমোর ঝড় বয়ে গেল। কে যে কাকে চুমো খাচ্ছে বোঝার যো থাকল না।

ঝড় এক সময় থামল। 'ছি-ছি,' বলে রানার মুখ থেকে রুমাল দিয়ে ঘষে লিপস্টিক মুছে দিল শিরিন। 'এখন যদি পোর্টার বা আর কেউ এসে পড়ে?'

'ওরা জানে,' বলেই শিরিনের কিল এড়াবার জন্যে দ্রুত একটু সরে গেল রানা।

'এই,' রানার দিকে হাত লম্বা করল শিরিন। 'তোমার হাতটা দাও তো, দেখি।'

মহা উৎসাহের সাথে হাতটা বাড়িয়ে দিল রানা। 'দেখো তো, কপালে বিয়ে আছে কিনা।'

রানার হাত দেখতে দেখতে চেহারা কালো হয়ে গেল শিরিনের। হঠাৎ শিউরে উঠল সে।

'কি হলো?' সকৌতুকে জানতে চাইল রানা। 'রেখায় সতীন দেখতে পেলে?'

রানার হাত ছেড়ে দিল শিরিন। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'ঠাট্টা নয়, রানা। তুমি বিয়ে কোরো না।'

'সেকি! কেন?'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল শিরিন। 'কারণ যাকে বিয়ে করবে সে মেয়ে

বাঁচবে না।'

'কি বলছ!' হাসি মিলিয়ে গেল, এ ধরনের কিছু শুনবে বলে আশা করেনি রানা।

'আমি বলছি না,' রানার দিকে ফিরল শিরিন, মায়াভরা চোখে বিষাদের ছায়া, 'তোমার হাতের রেখা বলছে। তোমার স্ত্রী অপঘাতে মারা যাবে।'

নিজের হাতের দিকে তাকাল রানা, আপন মনে কাঁধ ঝাঁকাল ও, বলল, 'শাপে বর বলতে পারি? চুটিয়ে প্রেম করতে পারব, কিন্তু মেয়েরা বিয়ের কথা তুললেই হাতটা বাড়িয়ে বলব এখানে তোমাদের মৃত্যু লেখা আছে। পালাবে, তাই না?'

'খারাপ দিকও আছে, রানা।'

'কি রকম?'

'যাকে বলে পরিপূর্ণ সার্থকতা, সেটা কোনদিন তোমার জীবনে আসবে না,' বলল শিরিন। 'বিশেষ এক ধরনের সুখ-শান্তি, স্বপ্ন-সাধ, আনন্দ-সোহাগ থেকে বঞ্চিত হবে তুমি।'

'অভিশাপ দিচ্ছ?'

আঁতকে উঠে রানার মুখে একটা হাতচাপা দিল শিরিন। 'ছি, একি বললে!'

'তাহলে?'

'ভেবে দেখো না—টুকটুকে লাল একটা বউ, ফুটফুটে কচি একটা বাচ্চা, শান্তির নীড় ছোট্ট একটা বাসা, এ-সবের কোন বিকল্প হয়? এগুলো পাওয়ার মধ্যেই তো জীবনের সার্থকতা।'

শিরিনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রানা। 'বড় নিষ্ঠুর কথা শোনালে।'

'আমার হাত দেখায় যদি বিশ্বাস করো,' বলল শিরিন। 'আমি দুঃখিত, রানা।'

চোখ পিট পিট করে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করল রানা। 'কপালে নেই, কি আর করা। তা, ভাল কিছু শোনাতে পারো না?'

'আগে খারাপগুলো শুনিয়ে নিই,' বলল শিরিন।

আঁতকে উঠল রানা, সভয়ে তাকাল। 'আরও আছে?'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল শিরিন। 'মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ, এই নীতিবাক্যে বিশ্বাস করো তুমি। অর্থাৎ, মানুষের দুঃখে সহজেই কাতর হয়ে পড়ো, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও। এর জন্যেই বেশিরভাগ সময় বিপদে পড়বে।'

'তোমাকে বিশ্বাস করা আমার উচিত হয়নি, এই ইঙ্গিত দিচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

রানার হাতটা আবার নিজের হাতের ভেতর টেনে নিল শিরিন। 'ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে থেকে অন্তত একজন তোমার বিরুদ্ধে চলে যাবে, এমনকি তার দ্বারা তোমার প্রাণ সংশয়ও হতে পারে।'

'সর্বনাশ!'

রানার হাতটা প্রায় চোখে তুলে আনল শিরিন। 'এটাকে ঠিক খারাপ লক্ষণ বলা যায় না। তবে, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, দুনিয়ার সবাই চেনে এমন এক ব্যক্তি তোমার হাতে মারা পড়বে।'

'রাজনীতিক?'
'তা কি করে বলি। দুনিয়ার সবাই চেনে এমন লোকদের মধ্যে শুধু রাজনীতিক কেন—খেলোয়াড়, গায়ক, বিজ্ঞানী, অভিনেতা ছাড়াও আরও অনেক ধরনের লোক থাকতে পারে।'
'খারাপ লক্ষণ নয় বলছ কেন?'
'কারণ, আরেকটা রেখা বলছে, তোমার দ্বারা সমাজের কোন ক্ষতি নেই,' বলল শিরিন। 'ওই লোক হয়তো দুনিয়ার জন্যে হুমকি হয়ে দেখা দেবে।'
'খারাপ কথা আমি আর শুনতে চাই না,' হেসে উঠে বলল রানা। 'ভাল কিছু থাকলে শোনাও।'
'শুনতে না চাইলেও বলতে হবে আমাকে,' বলল শিরিন। 'কারণ আমি চাই তুমি সাবধান হও। তোমার জীবনে এক হাজার একটা ফাঁড়া। তোমাকে দেখলেই খুন করতে চাইবে এরকম লোকের সংখ্যা এত বেশি যে...'
'তারমানে আয়ু খুব কম?'
'ফাঁড়াগুলো যদি কাটিয়ে উঠতে পারো, একশো বছর বাঁচবে তুমি।'
'যদি বাদ দিয়ে কোন সুখবর?'
'আছে,' বলল শিরিন। 'তোমার পুত্র-ভাগ্য দেখে যে-কোন লোকের ঈর্ষা হবে। দুনিয়া জোড়া নাম করবে তোমার ছেলে...'
'আরে-আরে! এই বললে...'
'বিয়ে নেই তা তো বলিনি।'
'কিন্তু বিয়ে আমি করছি না।'
'করো আর না করো,' বলল শিরিন, 'ছেলে একটা তোমার কপালে আছে।'
'এই যদি তোমার ভাল খবরের নমুনা হয়,' বলল রানা, 'আর আমি শুনতে চাই না।'
'অগাধ সম্পত্তির মালিক হবে তুমি, একাধিক লোক তাদের জীবনের সমস্ত সঞ্চয় তোমাকে দান করে যাবে।' হঠাৎ ভুরু কুঁচকে উঠল শিরিনের, হতভম্ব দেখাল তাকে। রানার মুখের দিকে চট্ করে একবার তাকিয়ে নিয়ে আবার হাতের দিকে মনোযোগ দিল।
'কি হলো?'
'অদ্ভুত ব্যাপার!' রুদ্ধশ্বাসে বলল শিরিন। 'এই রেখাটা এতক্ষণ চোখে পড়েনি কেন!'
'কোন্টা?' নিজের হাতের দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা।
তর্জনীর গোড়ার কাছাকাছি একজোড়া রেখা দেখাল শিরিন।
'কি মানে ওগুলোর?' মুখ তুলতেই রানা দেখল চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করছে শিরিন, কি বলছে বোঝা যাচ্ছে না।
'শিরিন?'
ধীরে ধীরে চোখ মেলল শিরিন। 'অনেক দূরে চলে যাবে তুমি, রানা। অনেক, অ-নে-ক দূরে।'

'তারমানে?' তীক্ষ্ণ হলো রানার দৃষ্টি। 'পৃথিবীর প্রায় সবখানেই তো গেছি আমি, আবারও হয়তো যাব। এর মধ্যে এত অবাক হবার কি আছে?'

'পৃথিবীর কোথাও নয়,' চোখ বুজে যেন ধ্যানমগ্ন হলো শিরিন। 'অনেক দূরে, অন্য কোথাও···ইচ্ছে করলেই যেখানে যাওয়া যায় না···'

হেসে উঠল রানা। 'সেরকম জায়গা একটাই আছে। পরপার।'

'না,' দ্রুত মাথা নেড়ে বলল শিরিন। 'সেখান থেকে আবার তুমি ফিরেও আসবে।'

'শিরিন, তুমি সুস্থ তো? নাকি আমার সাথে ঠাট্টা করছ?'

চোখ মেলল শিরিন। 'আর কারও হাত দেখার সময় এতটা সিরিয়াস হইনি, রানা। আমার যদি ভুল না হয়, তুমি চাঁদে কিংবা মঙ্গলে যাবে, কিংবা আরও দূরে কোথাও। কি জানি, সৌরজগতের বাইরেও যেতে পারো। আমার কথা বিশ্বাস না হলে অ্যাস্ট্রোনট যারা চাঁদে গেছে তাদের হাতের রেখা দেখে নিয়ো। ওদের সবার হাতে এই রেখা আছে। সেজন্যেই দেখামাত্র চিনতে পেরেছি আমি।'

'তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক,' বলে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শিরিনের হাত ধরল রানা। 'এবার আমি তোমার হাত দেখব।'

'প্রতিশোধ নেবে, তাই না?' সবজান্তার ভঙ্গি করে হাসল শিরিন।

'আরে-আরে, তোমারও তো দেখছি বিয়ে নেই!'

'জানি। কিন্তু···'

'কিন্তু ছেলে আছে···।'

দু'আঙুলের মাঝখানে রানার কান চেপে ধরল শিরিন, 'তবে রে···।'

শিরিনের ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরল রানা, কথা বন্ধ হয়ে গেল। এক মিনিট পর শিরিনকে ছেড়ে দিয়ে বলল রানা, 'দুঃখিত, আঙুলটা ভীষণ ব্যথা করছে বলে তোমাকে আমি···মানে, তোমার আমি ঠিকমত যত্ন নিতে পারছি না।'

'অভিশাপ দিলাম, কবীর চৌধুরী তুমি মরো!' রানার আহত হাতটা আস্তে করে ধরল শিরিন। 'এখন আমাকে কি করতে হবে বলে দাও। প্রতিশোধের আগুন আমার মনেও জ্বলছে, রানা। সবাই জানে, আমার বাবা রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে, কিন্তু আমি জানি বাবাকে খুন করা হয়েছে। হয়তো কোন ব্যাপারে মতের মিল হচ্ছিল না, তাই বাবাকে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করে কবীর চৌধুরী।'

'তুমি ঠিক জানো?'

'ঘটনাটা শুনলে তুমি বুঝতে পারবে,' বলল শিরিন। 'একদিন আমি কবীর চৌধুরীর বেডরুমে ঢোকার সুযোগ পেয়েছিলাম। একটা ফাইল আনতে পাঠিয়েছিল আমাকে। দেরাজ খুলে কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা তালিকা দেখতে পাই আমি। তিনজন বিজ্ঞানীর নাম ছিল তাতে। একজন জার্মান, একজন ইংরেজ, অপরজন আমার বাবা। গত এক বছরে ওরা তিনজনই কোন না কোন দুর্ঘটনায় মারা গেছে। তিনজনই কবীর চৌধুরীর অধীনে তার ল্যাবরেটরিতে কাজ করত।'

'মাই গড!'

'কাজেই বুঝতে পারছ, মুক্তি যখন পেয়েছি, প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ পেলে

আমি ছাড়ব না। তুমি শুধু বলে দাও কি করতে হবে আমাকে।'

'আপাতত ঘুমাও,' বলল রানা। হাতঘড়ি দেখল ও। দশটা বাজে। 'যতটা সম্ভব ঘুমিয়ে নেয়া দরকার আমাদের। জ্যাকসনভিলে ট্রেন থেকে নেমে যাব আমরা, ধরা পড়ে যাবার ঝুঁকি নিয়ে হলেও। যদি ধরা পড়ি, আমাদের ধাওয়া করা হবে। তারপর বিশ্রামের সুযোগ পাব কিনা জানি না।'

উঠে দাঁড়াল ওরা।

ঠোঁটে একটা আঙুল রেখে চুপ থাকতে বলল রানা শিরিনকে। পা টিপে টিপে পাশের ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। হোলস্টার থেকে ল্যুগার বের করে ডান হাতে নিল। দরজার তলা থেকে কাঠের টুকরোটা নিঃশব্দে সরিয়ে হাতল ঘোরাল, তারপর ধীরে ধীরে খুলে ফেলল কবাট।

খালি ঘর যেন ব্যঙ্গ করল ওকে।

'আমার হয়ে গেলে তোমাকে ডাকব,' বলল শিরিন।

'ঠিক আছে,' বলে পাশের ঘরে ঢুকল রানা, দরজা বন্ধ করে দিল।

করিডরের দিকের দরজায় তালা দেয়া। পাশাপাশি দুটো কামরা একই রকম। এক এক করে দুর্বল জায়গাগুলো পরীক্ষা করল রানা। সিলিঙে শুধু একটা এয়ার-কন্ডিশনিং ভেন্ট রয়েছে, আর কোথাও কোন ফাঁক-ফোকর নেই। বাইরে থেকে ঘরের ভেতর গ্যাস ছাড়ার কোন উপায় দেখল না রানা। বাথরূমে ওয়েস্ট পাইপ রয়েছে, কিন্তু ওদিক থেকে ভয় নেই।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। কেউ যদি আসে তো দরজা দিয়ে আসতে হবে তাকে। রাতটা ওকে জেগেই কাটাতে হবে।

'আমার হয়ে গেছে,' ডাকল শিরিন। ঘরে ঢুকে মিষ্টি সেন্টের গন্ধ পেল রানা। ওপরের বার্থে আধশোয়া ভঙ্গিতে রয়েছে শিরিন, কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে। শালটা কোথাও দেখা গেল না, তার বদলে গায়ে দিয়েছে একটা গোলাপী চাদর। রানা আন্দাজ করল, চাদরের নিচে শিরিন বোধহয় কিছু পরেনি, বা নামমাত্র কিছু পরে আছে। শুধু মাথার পিছনে রিডিং-ল্যাম্প জ্বলছে, ফলে ছায়ায় ঢাকা পড়ে আছে মুখ। খুদে অ্যালুমিনিয়াম মই বেয়ে উঠল রানা। ঝুঁকে পড়ল শিরিনের মুখের দিকে। হাত বাড়িয়ে রানার চুল এলোমেলো করে দিতে গেল শিরিন, অমনি কাঁধ থেকে খসে পড়ল চাদরটা।

রানা যা ভেবেছে! অন্তত ঊর্ধ্বাঙ্গে কিছু পরেনি শিরিন।

তাড়াতাড়ি চাদর দিয়ে আবার বুক ঢাকল শিরিন। 'আমিও যে টিজ করতে পারি, মানো? কেমন পুড়ছ আগুনে? যতদিন না আঙুলটা ভাল হয় তোমার সাথে এই আমার খেলা। ক'দিন লাগবে?'

শিরিনের কড়ে আঙুলটা মুখের সামনে ছিল, সেটা দাঁতের মাঝখানে নিয়ে কামড় দিল রানা। ছোট্ট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল শিরিনের গলা থেকে।

'বেশি দিন না,' বলল রানা। 'তখন তোমার এই খেলাই তোমাকে হঠাৎ করে পেরেকের মত গেঁথে ফেলবে।'

পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলো ওরা। এক সময় বালিশের ওপর নেতিয়ে

পড়ল শিরিন। 'তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাও। এরইমধ্যে খেলাটা একঘেয়ে লাগছে আমার।'

মই বেয়ে নিচে নেমে এসে ওপরের বার্থের পর্দা টেনে দিল রানা। 'ঘুমাতে চেষ্টা করো, ডার্লিং। কাল আমাদের অনেক কাজ।'

বিড়বিড় করে কি যেন বলল শিরিন, তার পাশ ফিরে শোয়ার আওয়াজ পেল রানা।

দরজার তলার টুকরোগুলো আরেকবার পরীক্ষা করল ও। তারপর কোট আর টাই খুলে নিচের বার্থে শুয়ে পড়ল। বেডল্যাম্প নিভিয়ে দিয়ে শিরিনের কথা ভাবছে, আর ট্রেনের একঘেয়ে আওয়াজ শুনছে।

এগারোটা বাজে। কলম্বিয়া আর জর্জিয়ার মাঝখানে, দীর্ঘ রেলপথের শেষ অংশে রয়েছে ওরা। জ্যাকসনভিলে পৌঁছতে আরও প্রায় ছ'ঘণ্টা।

এই ছ'ঘণ্টা অন্ধকার থাকবে। কবীর চৌধুরীর জন্যে যথেষ্ট সময়। তার এজেন্টদের নিশ্চয়ই সে নির্দেশ দেবে। রাতের অন্ধকারে করিডর ধরে কেউ আসা-যাওয়া করলে কেউ দেখার বা বাধা দেয়ার নেই।

ঘুম আসছে না। আলো জ্বেলে খবরের কাগজ পড়ার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু বিদেশী খবর তেমন টানল না। আলো নিভিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকল।

ঘুম এল, কিন্তু বারবার তাড়িয়ে দিল রানা। ওর মন বলছে, কিছু একটা ঘটবে।

রাত তখন একটার মত। চোখ বুজে এসেছে রানার। মৃদু, ধাতব একটা শব্দে ছুটে গেল তন্দ্রা। শব্দটা মাথার দিক থেকে এল। বালিশের তলায় পৌঁছে গেছে হাত। পাশের ঘর থেকে আসছে আওয়াজটা, করিডরের দিকের দরজার তালা খোলার চেষ্টা করছে কেউ।

নিঃশব্দ বিড়ালের মত মেঝেতে নামল রানা। পাশের কামরার দরজার সামনে বসল, কাঠের টুকরো সরিয়ে কবাট খুলল।

পাশের ঘরে ঢুকে করিডরের দিকের দরজাটা দেখল রানা। দরজাটা খুলতে শুরু করল ও। বোল্ট ফিরে আসতেই জোরাল শব্দ হলো ক্লিক করে। যাহ্, সাবধান হয়ে গেল লোকটা! হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলেই করিডরে লাফ দিল ও। এরইমধ্যে দৌড়ে করিডরের শেষ মাথার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে লোকটা।

পিস্তলটা কোমরে গোঁজা না থাকলে গুলি করে লোকটাকে থামাতে পারত রানা। তাল সামলে যখন ওটা হাতে নিল, লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। খুঁজতে যাওয়া বৃথা। অনেক খালি কামরার যে-কোন একটায় লুকিয়ে থাকতে পারে লোকটা।

কমপার্টমেন্ট এইচের দিকে দু'পা এগোল রানা। ঘরের ভেতর থেকে দরজার তলা দিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে রয়েছে সাদা একটা কাগজের কোণ।

দরজা বন্ধ করে নিজেদের কামরায় ফিরে এল রানা। রিডিং লাইটটা জ্বালল। শিরিন এখনও অঘোরে ঘুমাচ্ছে। দরজার তলায়, কার্পেটের ওপর পড়ে রয়েছে কাগজটা। তুলে নিয়ে বিছানার কিনারায় বসল রানা।

কাগজটা মাত্র দু'ভাঁজ করা। ভাঁজ খুলে দু'লাইন ইংরেজী লেখা দেখল রানা।

বাংলা করলে দাঁড়ায়: মৃত্যু-ঘণ্টা বাজছে। অচিরেই দেখা হবে।

মেলোড্রামাটিক! বিছানায় শুয়ে চিন্তা করছে রানা। কাগজটা ভাঁজ করে পকেট-বুকে রেখে দিয়েছে। এসব হুমকির কী মানে?

চিৎ হয়ে শুয়ে চোখ মেলে আছে ও, কিছুই দেখছে না। অপেক্ষা করছে কখন সকাল হবে।

দশ

জ্যাকসনভিলে ওরা যখন ট্রেন থেকে নামল তখন ভোর পাঁচটা।

দিনের আলো ফোটেনি, অথচ বেশিরভাগ বালব জ্বলছে না, নির্জন প্ল্যাটফর্মকে নগ্ন আর পরিত্যক্ত লাগল। দুশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর কার থেকে সাবওয়ে মাত্র কয়েক গজ দূরে, করিডর থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় ট্রেনের কোথাও প্রাণের চিহ্ন দেখা গেল না। জেমিসনকে রানা বলেছে, ওদের কমপার্টমেন্টের দরজায় যেন তালা দেয়া থাকে। আশা করা যায় ট্রেন সেন্ট পিটার্সবার্গে না পৌঁছনো পর্যন্ত ওদের নেমে যাওয়ার খবর কেউ জানবে না।

সাবওয়ে থেকে বুকিং-হলে চলে এল ওরা। জানা গেল, পরবর্তী ট্রেন সিলভার মিটিয়র সেন্ট পিটার্সবার্গে যাবে সকাল ন'টায়। দুটো পুলম্যান সীট বুক করল রানা। শিরিনের হাত ধরে রাস্তার আলো-আঁধারিতে বেরিয়ে এল ও।

এত ভোরেও দু'চারটে রেস্তোরাঁ খোলা দেখা গেল। একটার মাথায় চোখ-ধাঁধানো নিওনে লেখা রয়েছে, ফরগেট ইট নট। ভেতরে ঢুকে মাত্র তিনজন খদ্দের দেখল ওরা, দু'জন আবার টেবিলে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে। একটা কেবিনে বসল ওরা। একজন মেয়ে ওয়েটার অর্ডার নিতে এসে খুঁটিয়ে শিরিনের সালোয়ার-কামিজ দেখল। অরেঞ্জ জুস, কফি, আর সেদ্ধ ডিমের অর্ডার দিল ওরা।

খেতে শুরু করে অনেকটা আপনমনে বলল রানা, 'এত থাকতে কবীর চৌধুরী সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে অপারেট করে কেন?'

'আমি যে শুধুই বোঝা নই, সাহায্যেও আসতে পারি, সেটা প্রমাণ করবার সুযোগ পেলাম,' বলল শিরিন। 'উত্তরটা হলো, সেন্ট পিটার্সবার্গের লোকেরা প্রায় সবাই সাধু।'

পলকের জন্যে ভুরু কুঁচকে উঠল রানার, তারপর উজ্জ্বল হয়ে উঠল চেহারা। 'আর তাই ওখানের পুলিস ফোর্স খুব ছোট, ঠিক?'

'হ্যাঁ,' বলল শিরিন। 'বড়সড় একটা কোস্টগার্ড স্টেশন আছে বটে, কিন্তু ওরা শুধু কিউবা আর টামপার মাঝখানে যে চোরাচালান হয় সে দিকে নজর রাখে।'

'সেন্ট পিটার্সবার্গে কবীর চৌধুরীর কাজটা কি?'

'তা ঠিক বলতে পারব না, তবে ওখানে সানডাক বলে তার এক এজেন্ট আছে। সানডাকের সাথে রেডিওতে কথা বলার সময় কবীর চৌধুরীকে কিউবা শব্দটা বহুবার উচ্চারণ করতে শুনেছি আমি।'

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে স্টেশনে ফিরে এল ওরা। ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করার সময় শিরিনকে একের পর এক অনেক প্রশ্ন করল রানা। সবই কবীর চৌধুরীর অপারেশন সম্পর্কে।

মাঝেমধ্যে নোটবুকে কারও নাম, বা তারিখ লিখল রানা। তবে গুরুত্বপূর্ণ নতুন কোন তথ্য পাওয়া গেল না। কবীর চৌধুরীর সাথে একই বাড়িতে থাকত শিরিন, ওকে পাহারা দিত দু'জন নিগ্রো প্রৌঢ়া। মুহূর্তের জন্যেও তারা শিরিনকে চোখের আড়াল করত না। না, কবীর চৌধুরীর তরফ থেকে শারীরিক কোন হুমকি শিরিনের ওপর আসেনি।

মাথা ঝাঁকাল রানা। ও জানে, নারী সংক্রান্ত ব্যাপারে কবীর চৌধুরীর কোন দুর্বলতা নেই।

দু'একদিন পরপরই অপারেশন রুমে ডাক পড়ত শিরিনের। গিয়ে দেখত, কবীর চৌধুরীর ডেস্কের সামনের চেয়ারে একজন লোককে বেঁধে রাখা হয়েছে। লোকটা সত্যি না মিথ্যে বলছে জিজ্ঞেস করা হত শিরিনকে। কেউ কেউ অশ্রাব্য গালিগালাজ করত কবীর চৌধুরীকে। এরা বেশিরভাগই অপরাধ জগতের কুখ্যাত লোক ছিল, এরা মিথ্যে বললে নির্দ্বিধায় সেটা প্রকাশ করে দিত শিরিন। সেজন্যে তার কোন অপরাধবোধ নেই। অবশ্য কয়েকজন নিরপরাধ চেহারার লোকের ব্যাপারে শিরিন নিজে মিথ্যে কথা বলে তাদেরকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। ওই চেয়ারে বসে বহু লোককে কবীর চৌধুরীর গুলি খেয়ে মরতে দেখেছে শিরিন।

না, সোনার মোহর সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না সে।

সিলভার মিটিয়র সময়মতই ছাড়ল। বনভূমি আর জলার মাঝখান দিয়ে তুমুল বেগে ছুটল ট্রেন। দুপুরে পোর্টারকে ডেকে লাঞ্চের অর্ডার দিল রানা। গালফ অভ মেক্সিকোর কিনারা ঘেঁষে যাচ্ছে ওরা। আরেক পাশে বনভূমি, গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে মোটেল, ক্যারাভান সাইট দেখা গেল। সাগরে অর্ধ উলঙ্গ ছেলেমেয়েরা স্নান করছে।

এক স্টেশন বাকি থাকতে, ক্লিয়ারওয়াটারে ট্রেন থেকে নামল ওরা। ট্যাক্সিতে উঠে ট্রেজার আইল্যান্ডের ঠিকানা বলল রানা ড্রাইভারকে। আধ ঘন্টার পথ।

দুপুর দুটো। আকাশে মেঘ নেই, একাই রাজত্ব করছে সূর্য। স্টেশন থেকে বেরিয়ে শিরিনকে একটা হ্যাট কিনে দিয়েছিল রানা, কিন্তু ট্যাক্সিতে উঠে সেটা খুলে ফেলল সে। শালটাও গায়ে রাখল না। 'ঘেমে যাচ্ছি যে!' বলল শিরিন। 'তাছাড়া, এখানে আমাকে কেউ চিনতে পারবে না।'

পার্ক স্ট্রীট আর সেন্ট্রাল এভিনিউয়ের মোড়ে, ট্রাফিক সিগন্যালে থামল ওদের ট্যাক্সি। ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ফোক্সওয়াগেন। ড্রাইভারের পাশে বসন্তের কুৎসিত দাগে ভরা এক নিগ্রো যুবক সিগারেট ফুঁকছে অলস ভঙ্গিতে। ওদের ট্যাক্সির দিকে চোখ পড়তেই তার মুখ হাঁ হয়ে গেল, সিগারেটটা পড়ে গেল কোলের ওপর। হাত-ঝাপটা দিয়ে সিগারেট ফেলে মাথা নিচু করল সে। 'মাই গড, মাই গড!'

রানা আর শিরিনকে নিয়ে কজওয়ে ধরে ট্রেজার আইল্যান্ডের দিকে চলে গেল ট্যাক্সি। ফোক্সওয়াগেন থেকে নেমে একটা ফোন বুদে ঢুকল নিগ্রো যুবক। সানডাককে ফোন করল সে।

ট্যাক্সিটা কোন কোম্পানীর লক্ষ করেছে যুবক। লক্ষ্য করেছে কজওয়ে ধরে ট্রেজার আইল্যান্ডের দিকে গেল ওটা। সানডাককে রানার চেহারারও নিখুঁত বর্ণনা দিল সে।

ট্যাক্সিটাকে ফলো করেনি বলে যুবককে মা-বাপ তুলে গাল দিল সানডাক। নির্দেশ দিল, 'ওখানেই অপেক্ষা করো, ট্যাক্সিটা ফেরার সময় ড্রাইভারকে ধরবে।'

পাঁচ মিনিট পর নিউ ইয়র্কের সাথে যোগাযোগ করল সানডাক। রানার ব্যাপারে তাকে সাবধান করা হয়েছিল, কিন্তু তার সাথে শিরিনকে দেখতে পাওয়া গেছে শুনে রহস্যটা সে বুঝল না। মি. ওয়াইজের সাথে কথা বলার পরও ব্যাপারটা তার মাথায় ঢুকল না। তবে পরিষ্কার কিছু নির্দেশ পেল সে।

রেডিও অফ করে দিয়ে সিগারেট ধরাল সানডাক। ডেস্কের গায়ে আঙুল দিয়ে বার কয়েক টোকা দিল সে। কাজটার জন্যে পঞ্চাশ হাজার ডলার দেয়া হবে তাকে। বিশালকায় দৈত্য আপনমনে হাসতে লাগল। বার কয়েক ঠোঁট চুষে ফোনের রিসিভার তুলল সে, টামপার একটা বারের নাম্বারে ডায়াল করল।

গোল্ডেন টাওয়ার হোটেলের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল ওরা। সবুজ ঘাসের বেড় দেয়া তেমাথার সবগুলো দিকে সাদা আর হলুদ রঙের কটেজ। তেমাথার মাঝখানে একটা সোনালি রঙের টাওয়ার আকাশ ছুঁয়ে আছে। সবুজ ঘাসবন হাড়-সাদা সৈকতের কিনারা পর্যন্ত বিস্তৃত। গালফ অভ মেক্সিকো আয়নার মত প্রশান্ত, যতদূর চোখ যায়।

শিরিনকে পাশে নিয়ে অফিস লেখা একটা রুমের সামনে দাঁড়াল রানা। বোতামের নিচে লেখা রয়েছে: ম্যানেজারেস—মিসেস কাওয়াসাকা। বোতামটা টিপল রানা।

'কাম ইন,' শুনে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল ওরা। ডেস্কের পিছনে বসে আছে প্রৌঢ়া এক জাপানী মহিলা। 'ইয়েস?'

'মি. গিলটি মিয়া?'

'ও, হ্যাঁ,' ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বলল ম্যানেজার। 'আপনি মি. হায়দার। এক নম্বর কটেজ, বীচের সবচেয়ে কাছেরটা। সেই লাঞ্চের সময় থেকে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন মি. গিলটি মিয়া। কিন্তু...' চশমার ওপর দিয়ে শিরিনের দিকে তাকাল সে, 'উনি?'

'মিসেস হায়দার,' বলল রানা।

'জ্বী, ও, আচ্ছা।' শিরিনের আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখল মিসেস কাওয়াসাকা। 'রেজিস্টারে সই করুন, প্লীজ। পুরো ঠিকানা।' সই করল ওরা। 'ধন্যবাদ।'

ওদেরকে নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল মিসেস কাওয়াসাকা। কংক্রিটের সরু পথ ধরে বাঁ দিকের শেষ কটেজে চলে এল ওরা। দরজায় নক করল মিসেস

কাওয়াসাকা। দরজা খুলে বেরিয়ে এল গিলটি মিয়া।

আনন্দে উচ্ছল গিলটি মিয়াকে আশা করছিল রানা, কিন্তু ওদের দেখে অনেকটা যেন ভূত দেখার মত চমকে উঠল সে। হাঁ করে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে, মনে হলো কেঁদে ফেলবে। চোখ দুটো টকটকে লাল, বোধহয় ঘরের ভেতর বসে কাঁদছিল।

'আমার স্ত্রী,' শিরিনকে দেখিয়ে বলল রানা। 'আগে বোধহয় তোমাদের দেখা হয়নি।'

'না-না, মানে হ্যাঁ। হাউ ডু ইউ ডু?'

গোটা পরিস্থিতিটা, মনে হলো, গিলটি মিয়ার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। শিরিনের কথা ভুলে রানাকে প্রায় টেনে নিয়ে এল ঘরের ভেতর। একেবারে শেষ মুহূর্তে মেয়েটার কথা মনে পড়ল তার, ওরও হাত ধরে ঘরের ভেতর টেনে আনল। হতভম্ব মিসেস কাওয়াসাকার মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করে দিল।

'কি ব্যাপার, গিলটি মিয়া?' চেহারায় রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে জানতে চাইল রানা।

একবার রানার দিকে, আরেকবার শিরিনের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল গিলটি মিয়া। আর মুখে কথা জোগাল না। তারপর, হঠাৎ করে, রানার পায়ের ওপর আছাড়ে পড়ল সে। হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

শশব্যস্ত হয়ে পিছিয়ে গেল রানা। 'আরে, কি হয়েছে বলবে তো!'

চোখের জলে ভাসছে গিলটি মিয়া। অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে লবির মেঝেতে সুটকেসটা নামিয়ে রাখল রানা, বুঝতে পেরেছে বাক-শক্তি ফিরে পেতে আরও কিছুক্ষণ সময় নেবে গিলটি মিয়া।

লবির দু'পাশে দুটো দরজা। একটা দরজা খুলে শিরিনের দিকে তাকাল রানা। ছোট একটা লিভিং রুম, জানালা দিয়ে সৈকত আর সাগর দেখা যায়। বেতের চেয়ার রয়েছে কয়েকটা, মেঝেতে কার্পেট। গোল একটা টেবিলে ফুলদানি আর টেলিফোন। বারান্দার দিকের দরজা খুলে দুটো বেতের চেয়ারে বসল ওরা। প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল রানা। প্যাকেট আর লাইটারটা ছুঁড়ে দিল টেবিলের দিকে।

ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন। সদ্য চোখ মোছা শুকনো চেহারা নিয়ে ভেতরে ঢুকে রিসিভার তুলল গিলটি মিয়া।

'কে, লেফটেন্যান্ট?…হ্যাঁ, বলচি।' রানার দিকে একবার তাকাল গিলটি মিয়া। 'উনি এইমাত্র পৌঁচেচেন। না, আস্তু।' অপরপ্রান্তের কথা শুনল কিছুক্ষণ তারপর রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'ফ্যান্টম থেকে কোতায় নামলেন আপনি, স্যার? উত্তর দিল রানা। 'জ্যাকসনভিল,' রিসিভারে বলল গিলটি মিয়া। 'জ্বী, হ্যাঁ। বলবো সব কতা ভালো করে শুনে লিয়ে তারপর ফের আপনাকে ফোন করবো'খন। জ্বী হোমিসাইডকে বলুন তদন্তের দরকার নেইকো। ধন্যবাদ, লেফটেন্যান্ট গুডবাই।' রিসিভার নামিয়ে রেখে পকেট থেকে রুমাল বের করল সে, কপালের ঘাম মুছল।

হঠাৎ করে শিরিনের দিকে তাকাল গিলটি মিয়া, মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে হাসল। 'মনে কিছু লেবেন না। আপনি বোধায় শিরিন আক্তার, তাই না?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে রানার দিকে ফিরল সে। 'তাহালে শুরু করবো, স্যার?'

'করো,' বলল রানা। 'শিরিন এখন আমাদের দলে।'

'তারমানে চোদরীর পোঁদে আরেকটা লাত মেরেচেন,' বলল গিলটি মিয়া। 'প্রথমে হেডলাইনগুলো শুনুন। আপনাদের ফ্যান্টম ট্রেন জ্যাকসনভিল ছাড়ার পরপরই থেমে যায়, ওয়ালডো আর ওকালার মাজখানে। আপনাদের কমপার্টমেন্টটা টমিগান দিয়ে ঝাঁজরা করে দিয়েচে, কয়েকটা গ্রেনেডও মারা হয়েচে। সব একেবারে চুরমার। করিডরে একজন পোর্টার ছিলো, কী যেন নাম, ও, হ্যাঁ, জেমিসন। মারা গেচে।'

'মাই গড!' ফিসফিস করে বলল রানা।

রানার একটা হাত খামচে ধরল শিরিন।

'মাহা হুলুস্থুল পড়ে গেচে। কাদের কাজ এটা? মি. আর মিসেস হায়দার কে? কোতায় তারা? আমরা ধরে নিলুম, আপনাদের লাস গাপ করে দিয়েচে। অরলানডোর পুলিস তদন্তের দায়িত্ব নিল। এব.বি.আই.-কে সব জানানো হয়েচে। আপনার দোস্ত ফিলিপ ওয়াটসন ফোন করলো আমাকে…'

'বেচারা জেমিসন,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। বিষণ্ন দেখাল ওকে। 'ওর কাছে আমরা ঋণী থাকলাম।'

'ট্রেন থেকে নামার সময় আপনাদের কেউ দেকেচে, স্যার?' জিজ্ঞেস করল গিলটি মিয়া।

'মনে হয় না,' বলল রানা। 'তবু, শিরিনকে যতক্ষণ না নিরাপদ কোথাও পাঠাতে পারছি, সাবধানে থাকতে হবে। কাল ওকে প্লেনে করে জ্যামাইকায় পাঠিয়ে দেয়া যেতে পারে। ওখানে আমাদের লোক ওকে নিরাপদে রাখতে পারবে।'

'সেটাই ভালো বলে মনে করচি,' বলল গিলটি মিয়া। 'কখোন কি রক্তারক্তি কাণ্ড বেদে যায় কিছুই বলা যায় না, ইসবের মধ্যে লেডিস থাকলে অসুবিদে।'

'তুমি কি বলো, শিরিন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

খোলা দরজা দিয়ে সৈকতের দিকে তাকিয়ে আছে শিরিন, কিন্তু কিছুই দেখছে না। এ জগতেই যেন নেই সে। তার চোখের এই দৃষ্টি আগেও ল ় করেছে রানা।

হঠাৎ শিউরে উঠল শিরিন।

ধীরে ধীরে রানার দিকে ফিরল সে। বিষণ্ন একটু হাসি ফুটল গার ঠোঁটে। ঘাড় দোলাল সে। 'ঠিক আছে,' রানার হাত ধরে বলল, 'তুমি যা ভাল মনে করো।' পরিষ্কার বোঝা গেল, অন্য কি যেন ভাবছে সে।

এগারো

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শিরিন। 'যাই, কাপড় ছেড়ে চোখেমুখে পানি ছিটিয়ে আসি,' বলল সে। 'তোমরা তো এখন কথা বলবে।'

'দেকো দিকিন।' ব্যস্ত হয়ে উঠল গিলটি মিয়া। 'কিচু যদি মনে থাকে। আপনি লিচ্চই খুব কেলান্ত। পাশের ঘরটা স্যারের, আপনিও ওকানে থাকবেন।' রানার দিকে চট্ করে একবার তাকিয়ে নিল সে, দৃষ্টিতে শিশুর সারল্য। 'খাতায় যকন নাম লেকানো হয়ে গেচে, একঘরেই থাকতে হবে আপনাদের···' গিলটি মিয়ার পিছু পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল শিরিন।

এক মিনিট পর গিলটি মিয়া একা ফিরে এল।

'আগে পৌঁছে কিছু জানতে পারলে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বহুত কিচু জানা গেচে, স্যার,' বলল গিলটি মিয়া। 'সোনার মোহর এই জায়গা দিয়েই যে ঢুকচে তাতে কোন সন্দো নেইকো। জামাইকা থেকে এসে একানেই নোঙ্গর ফেলে আল-আমিন।'

'আল-আমিন এখন কোথায়?'

'সে-কতায় পরে আসচি, স্যার। আপনি বলেচিলেন একানে স্নেক টেডার্স নামে একটা ফার্ম আচে, শুধু বিষাক্ত সাপের ব্যবসা করে। স্নেক টেডার্সের নিজস্ব জেটি আচে, সেকানেই নোঙর ফেলে আল-আমিন। ফার্মের মালিক্ তুর্কী, ফারাদ বুজে। আর তার ম্যানেজারের নাম সানডাক। শুনেচি, লোক সুবিধের লয়···।'

'সানডাক?' শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার। 'সে-ই তো কবীর চৌধুরীর লোক এখানে!'

'ফার্মের মালিক একানে থাকেই না,' বলল গিলটি মিয়া। 'বছরে একবার এসে হিশেব-নিকেশ দেকে। সে বোধায় জানেই না তার ব্যবসাটাকে ঢাল হিশেবে ব্যভার করচে কবীর চোদরী।'

চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফ দিয়ে উঠল রানা। 'চলো, জায়গাটা একবার দেখে আসি।'

'একুনি যাবেন?' ইতস্তত করল গিলটি মিয়া। 'আল-আমিনকে তো পাবেন না।'

'কোথায় সেটা?'

'হাভানায়। এক হপ্তা আগে চলে গেচে একান থেকে। কাস্টমস আর পুলিস তন্ন তন্ন করে সার্চ করেচে, স্যার। যকন নোঙ্গর ফেলে আর যকন নোঙ্গর তোলে। কিন্তু কিচুই পাওয়া যায়নি। শেষে ওরা ভাবল, নকল তলী থাকতে পারে। খুঁজতে গিয়ে ধরতে গেলে ইয়টটাকে ওরা প্রায় ভেঙেই ফেলে। আবার নোঙ্গর তোলার আগে ডকে পাঠাতে হয়েচিল। কিন্তু অষ্টরম্ভা, সোনার মোহর তো দূরের কতা, রুপোর একটা কণা পর্যন্ত পায়নি।'

হোলস্টার থেকে বের করে ল্যুগারটা পরীক্ষা করল রানা। 'আমার সুটকেসে একটা কোল্ট আছে, পকেটে ভরো,' নির্দেশ দিল ও। 'ফেরার পথে কালকের ফ্লাইটের একটা টিকেট কিনব শিরিনের জন্যে। যাব কিভাবে?'

'আমি একটা গাড়ি ভাড়া করেছি, স্যার।'

'বের করো, আমি শিরিনের সাথে কথা বলে আসছি।'

কিন্তু বাধা দিল শিরিন। একা সে এখানে থাকতে চায় না। 'রানা, হেসো না, কিন্তু এই জায়গাটাই আমার ভাল লাগছে না কেন যেন,' বলল সে। 'আমার মন বলছে...' কথাটা শেষ করল না সে। তাকে চুমো খেলো রানা।

'খুব নির্জন জায়গা তো, তাই এরকম লাগছে,' বলল রানা। 'ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসব আমরা। তারপর তোমাকে প্লেনে তুলে দেয়ার আগে পর্যন্ত একা ছেড়ে কোথাও যাব না। ফিরে এসে যদি ভাল মনে করি তাহলে হয়তো টামপা-তে বেড়াতে যাব আমরা, রাতটা ওখানেই কাটাব, তারপর ভোরের প্লেনে তুলে দেব তোমাকে।'

'হ্যাঁ, প্লীজ,' আবেদনের সুরে বলল শিরিন। 'সেটাই ভাল হবে। এখানে আমার ভয় করছে।' দু'হাত দিয়ে রানার গলা জড়িয়ে ধরল সে। 'মনে হচ্ছে, এখানে থাকলে আমার বিপদ হবে। ভেব না এ-সব আমার কল্পনা।' রানাকে চুমো খেলো সে। 'যাচ্ছ যাও, কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। আমি তোমার পথ চেয়ে থাকব।'

বাইরে গাড়ির হর্ন বাজল।

একটু অন্যমনস্ক ভাব নিয়ে গাড়ি-বারান্দায় বেরিয়ে এল রানা। শান্ত, নির্জন পরিবেশ। এখানে শিরিনের বিপদ হতে পারে বলে বিশ্বাস হয় না। ট্রেজার আইল্যান্ডে এরকম বীচ হোটেল রয়েছে একশোর ওপর, ওরা কোথায় উঠেছে কবীর চৌধুরীর লোকেরা এত তাড়াতাড়ি তা জানবে কিভাবে?

তবু একটু অস্বস্তি বোধ করল রানা। শিরিনের দুর্লভ গুণটার প্রতি ওর শ্রদ্ধা আছে, সেটাই কারণ।

হোন্ডা সিভিক। ড্রাইভিং সীটে বসল রানা।

কজওয়ে পেরিয়ে এসে সেন্ট্রাল এভিনিউতে পড়ল গাড়ি। শহর ছাড়িয়ে ইয়ট বেসিনে চলে এল। মূল বন্দরের আশপাশেই সবগুলো বড় হোটেল। ফুটপাথ ধরে যারা হাঁটছে তাদের বেশিরভাগেরই চুল হয় সাদা নাহয় সোনালি, কিংবা নীলচে-সাদা। রাস্তার পাশেই ছোট ছোট অসংখ্য পার্ক। প্রায় প্রতিটি পার্কে মর্মর-মূর্তি, আর ফোয়ারা দেখা গেল। ভিজে রাস্তা, ধুলো যাতে উড়তে না পারে সেজন্যে প্রতি ঘণ্টায় পানি ছিটানো হয়। রাস্তায় একটা কাগজের টুকরো পর্যন্ত দেখল না রানা।

আর ঢাকার রাস্তায়?

মেয়েরা সব নাদুসনুদুস, তবে শুধু চর্বির ডিপো হলে অমন জোর কদমে হাঁটতে পারত না। রানার মনে হলো, ওদের সাথে পাল্লা দিতে হলে তাকে দৌড়তে হবে। রাস্তার মোড়ে যুবক-যুবতীরা ভিড় করে আড্ডা দিচ্ছে। প্রতিটি জটলা পেরিয়ে আসার সময় প্রাণখোলা হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল। দোকানে প্রচুর খদ্দের,

রাস্তার আরেক পাশে সার সার মোটেল, মোটেলের সামনে গিজগিজ করছে বিভিন্ন মডেলের ঝকঝকে গাড়ি। ঈর্ষা হলো রানার। বড় সুখে আছে এখানকার মানুষ।

সাগরের কাছাকাছি এসে ডান দিকে বাঁক নিল গাড়ি। সি-প্লেন বেস, আর কোস্টগার্ড স্টেশনের কাছে থামল। বন্দর নগরীর ছাপ রাস্তার চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। বুড়ো কোন লোককে দেখা গেল না। রোদে জাল শুকাতে দেয়া হয়েছে, ডাঙায় তুলে উল্টো করে রাখা হয়েছে বোট, মাথার ওপর সিগালের তীক্ষ্ণ চিৎকার, বাতাসে তেল আর মাছের গন্ধ। বিশাল ওয়্যারহাউজগুলো যেমন লম্বা তেমনি উঁচু। কোন কোন ওয়্যারহাউজের জোড়া দরজার ওপর সাইনবোর্ড ঝুলছে। 'ইউজড কারস,' 'বিটুমিন,' 'সেকেন্ড হ্যান্ড ক্লোদস,' ইত্যাদি।

'একান থেকে হেঁটে যাওয়াই ভালো, স্যার,' বলল গিলটি মিয়া। 'সানডাকের আস্তানা কাচেই।'

গাড়ি থেকে নেমে এগোল ওরা। একটা টিমবার ওয়্যারহাউজ, আর অয়েল-স্টোরেজ ট্যাংক পেরিয়ে এসে বাঁ দিকে বাঁক নিল। সাগরের দিকে যাচ্ছে ওরা।

সাইড রোডটা শেষ হয়েছে ছোট একটা পুরানো কাঠের জেটির মুখে। সাগরের ওপর মাত্র বিশ ফিট এগিয়ে থেমে গেছে জেটি। জেটির খোলা মুখের ঠিক উল্টো দিকেই নিচু একটা ওয়্যারহাউজ, করোগেটেড-আয়রন দিয়ে তৈরি। চওড়া জোড়া-দরজার গায়ে সাদা-কালো রঙ দিয়ে লেখা রয়েছে, 'স্নেক ট্রেডার্স'। বিশাল দরজার নিচের দিকের গায়ে ছোট আরও একটা দরজা রয়েছে, চকচকে ইয়েল তালা ঝুলছে তাতে। তালার নিচে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা হয়েছে, 'প্রাইভেট। কীপ আউট।'

কিচেন চেয়ারে বসে আছে এক লোক, চেয়ারটা দরজার গায়ে ঠেস দেয়া। লোকটা একটা রাইফেল পরিষ্কার করছে—রেমিংটন থারটি বলে আন্দাজ করল রানা। লোকটার দুই ঠোঁটের মাঝখান থেকে বেরিয়ে রয়েছে দেশলাইয়ের একটা সাদা কাঠি। মাথায় বেসবল ক্যাপ।

হাতকাটা ফতুয়া ধরনের একটা জামা পরে আছে সে, বগলের নিচে ছাইরঙা লোম দেখা যাচ্ছে। ক্যানভাসের তৈরি ট্রাউজার, তৈরির পর বোধহয় পানির স্পর্শ পায়নি। রাবারের সোল লাগানো জুতোটাও ধুলোমাখা। চল্লিশের মত বয়েস, মনে হলো মুখ-ভর্তি অসংখ্য রেখাগুলো যে-কোন মুহূর্তে কিলবিল করে উঠতে পারে। মুখের আকৃতির সাথে কোদালের মিল রয়েছে। চওড়া চিবুক, খোঁচা খোঁচা দাড়ি। নির্লিপ্ত, ঠাণ্ডা, নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক।

তাকে পাশ কাটিয়ে জেটির দিকে এগোল ওরা, ওদের দিকে মুখ তুলে একবার তাকালও না সে। কিন্তু পাশ কাটিয়ে আসার পর রানা অনুভব করল, একজোড়া চোখ অনুসরণ করছে ওদের।

'ভাল্লুকটা যদি সানডাক না হয়,' ফিসফিস করে বলল গিলটি মিয়া, 'লিচ্চয় তার যমজ ভাই হবে।'

থামের মাথায় একটা পেলিক্যান পাখি দেখা গেল। খয়েরি রঙের গা, হলদেটে মাথা। ওদেরকে কাছে চলে আসতে দেখে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঝটপট ঝটপট ডানা

ঝাপটে সাগরের দিকে উড়ে গেল। তাকিয়ে থাকল ওরা, পানির ঠিক ওপর দিয়ে ধীরগতিতে উড়ে যাচ্ছে পাখিটা। হঠাৎ পানির ওপর ঝাঁপ দিল, পানির নিচে ডুবে গেল লম্বা করে দেয়া গলা। আবার যখন পানির ওপর উঠল পেলিক্যান, তার ঠোঁটে একটা ছোট মাছ দেখা গেল। বার কয়েক ঢোক গিলে পেটে চালান করে দিল মাছটাকে।

চারদিকে ভাল করে তাকাল রানা। এক সময় ফিরে এসে আগের জায়গায়, থামের মাথায়, বসল পেলিক্যান। ফেরার সময় আবার লোকটাকে দেখল ওরা, মাথা নিচু করে তেলতেলে একটা ন্যাকড়া দিয়ে পরিষ্কার করছে রাইফেল।

'গুড আফটারনুন,' বলল গিলটি মিয়া। 'এই জেটির তুমিই ম্যানেজার নাকি গো?'

'হুঁ।'

'ভাবছিলাম আমার বোটটা এখানে নোঙর করানো যায় কিনা,' বলল গিলটি মিয়া। 'বেসিনে যা ভিড়।'

'উঁহুঁ।'

পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল গিলটি মিয়া। 'টাকায় কতা বলে?'

'উঁহুঁ।' গলার ভেতর ঘড়ঘড় আওয়াজ করল লোকটা, তারপর রানা আর গিলটি মিয়ার মাঝখানে একদলা থুথু ফেলল।

'আশ্চর্য!' গিলটি মিয়া চটে গেল। 'এমন ছোট লোক তো জীবনে দেকিনি।'

ঢুলু ঢুলু চোখ তুলে তাকাল লোকটা। গিলটি মিয়াকে একবার দেখে নিয়ে রানার দিকে ফিরল। রানার দিকে চোখ রেখেই গিলটি মিয়ার সাথে কথা বলল সে, 'কি নাম, কি নাম তোমার বোটের?'

'সিগাল।'

'বেসিনে ওই নামের কোন বো'ট নেই,' বলল লোকটা। ক্লিক শব্দের সাথে রাইফেলের ব্রিচ বন্ধ করল সে। তা'পর সেটা কোলের ওপর নামিয়ে সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকল, রাইফেলের মাজল্ সাগরের দিক থেকে ধীরে ধীরে ঘুরে যাচ্ছে।

ধীরে ধীরে আবার রানার দিকে তাকাল লোকটা। হাতটা নড়ে উঠল, রাইফেলের ট্রিগারে চলে গেল আঙুল।

'তুমি একটা কানা,' বলল গিলটি মিয়া। 'সিগাল তিন হপ্তা ধরে বেসিনে রয়েচে। ষাট ফুট ডিজেল। সাদা আর সবুজ রঙ করা। আমি মাচ ধরি।'

বাঁ হাত ট্রিগারে, ডান হাত দিয়ে রাইফেলটা ঘোরাচ্ছে ম্যানেজার সানডাক।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা।

চেয়ারটা এখনও দরজার গায়ে ঠেস দেয়া রয়েছে। গিলটি মিয়ার পেটের ওপর রাইফেল তাক করল লোকটা। তারপর রানার পেটের ওপর। ওরা দু'জন যেন পাথরের মূর্তি, এক চুল নড়ার ঝুঁকি পর্যন্ত নিল না। আবার ঘুরে গিয়ে সাগরের দিকে মুখ করল রাইফেল। নিমেষের জন্যে ওপর দিকে তাকাল সানডাক, চোখ ছোট করল, তারপর টেনে দিল ট্রিগার।

অস্পষ্ট একটা শব্দ বেরিয়ে এল পেলিক্যানের গলা থেকে, ঝপাৎ করে পড়ে গেল পানিতে। বন্দরের চারদিক থেকে প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে এল গুলির আওয়াজ।

রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, 'এটা কি হলো?'

'প্র্যাকটিস,' বলে ব্রিচে আরেকটা বুলেট ভরল সানডাক।

'মনে হচ্চে এই শহরে জংলী একনো দু'একটা আচে, স্যার,' বলল গিলটি মিয়া। 'চলুন থানায় রিপোর্ট করে আসি।'

'অনধিকার প্রবেশের দায়ে উল্টে ফেঁসে যাবে,' বলল সানডাক। 'এটা প্রাইভেট প্রপার্টি। অনেক হয়েছে, লেজ নামিয়ে কেটে পড়ো এবার।' ঘুরে চেয়ারটা দরজার গা থেকে সরাল সে, রাইফেলটা বগলের তলায় রাখল, চাবি বের করে খুলে ফেলল ইয়েল লক। পা দিয়ে কবাট খুলে ভেতরে ঢুকল সে, ঘুরল। 'তোমাদের দু'জনের কাছেই আর্মস রয়েছে,' রানার চোখে চোখ রেখে বলল। 'ওগুলোর গন্ধ পাই আমি। ফের যদি এখানে তোমাদের দেখি, মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়ে বলব, আত্মরক্ষার জন্যে গুলি করতে বাধ্য হয়েছি। শালার টিকটিকিরা জান কেরাসিন করে দিল! সিগাল না কুকুরের পোঁদ। ভাগো!' পিছিয়ে গিয়ে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল সে, কেঁপে উঠল ফ্রেমটা।

চাপা স্বরে হাসল গিলটি মিয়া। 'পুলিস মনে করেচে। আসলে যে কী, ধরতে পারেনি।'

ধুলোয় ঢাকা সাইড রোড ধরে ফিরে আসছে ওরা। মেইন রোডে উঠে এসে পিছন দিকে তাকাল রানা। সূর্য ডুবতে বসেছে, সাগরকে মনে হলো রক্ত ভরা পুকুর। ওয়্যারহাউজের দরজার মাথায় বড় আকারের একটা আর্ক লাইট দেখা গেল। রাতের বেলা ওয়্যারহাউজের সামনে অন্ধকার বা ছায়া থাকে না।

'ভেতরে যদি ঢুকতে হয়,' বলল ও, 'সামনে দিয়ে নয়, পিছন দিয়ে ঢুকতে হবে।'

'পরের বার যকোন আসবো।'

গাড়ি নিয়ে ট্রেজার আইল্যান্ডের দিকে ফিরছে ওরা। সেন্ট্রাল এভিনিউয়ের কাছে এসে একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল। একটা ট্রাকের ওপর পঁচিশ-ত্রিশ জন লোক। ড্রাম, বিউগল, ইত্যাদি বাজনা বাজছে। খোলা ট্রাকে দাঁড়িয়ে আছে সবাই, প্রত্যেকের মুখে মুখোশ। হাতি, ঘোড়া, বাঘ, ভালুক, জিরাফ, উট—এক একজনের এক একরকম। কারও বিয়ের উৎসবে আনন্দ করছে ওরা।

বিশ মিনিট পর গোল্ডেন টাওয়ারে পৌঁছল ওরা। লনে দেখা হলো মিসেস কাওয়াসাকার সাথে। রানাকে দেখে প্রায় ছুটে এল সে। দু'কান পর্যন্ত লম্বা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে চেহারা। 'মি. হায়দার, কংগ্রাচুলেশন্স!'

'কংগ্রাচুলেশন্স? ফর হোয়াট?' আকাশ থেকে পড়ল রানা।

'আপনার যে আজ বিয়ে, আগে কেন বলেননি আমাকে, মি. হায়দার? প্রথমেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম লাজুক মেয়েটা আপনার স্ত্রী নয়, ফিয়াঁসে...'

'বিয়ে?' হাঁ হয়ে গেল রানা।

'ও, এখনও গোপন করে রাখতে চাইছেন!' হাসতে লাগল মিসেস

কাওয়াসাকা। 'আজকালকার ছেলেমেয়েরাই এমন। কাউকে কিছু জানতে দেবে না।' গিলটি মিয়ার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল প্রৌঢ়া।

রানা আর গিলটি মিয়া মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

'প্লীজ, মিসেস কাওয়াসাকা, একটু পরিষ্কার করে বলবেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আপনার লোকেরা, হ্যাঁ, আমোদ-ফুর্তি করতে জানে,' বলল মিসেস কাওয়াসাকা। 'দ্রিম দ্রিম ড্রাম বাজাতে বাজাতে এল ওরা। দরজা খুলে বোর্ডাররা সব বেরিয়ে এল। ওদের মুখোশ দেখে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেল সবার। কনে দরজা খুলতেই তার মুখে একটা ঘোড়ার মুখোশ পরিয়ে দিল...'

'ইয়াল্লা!' মাথার চুল খামচে ধরে কটেজের দিকে ছুটল গিলটি মিয়া।

মরণকামড়-২

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৮৭

এক

গিলটি মিয়াকে নিয়ে স্নেক ট্রেডার্স থেকে ফিরছিল মাসুদ রানা, পথে ট্রাকটাকে দেখতে পায়। পঁচিশ-ত্রিশ জন লোক ছিল ট্রাকে, ড্রাম আর বিউগল বাজাচ্ছিল, প্রত্যেকের মুখে ছিল বাঘ, ভালুক, সিংহ, জিরাফ, বা উটের একটা করে মুখোশ। দলটাকে দেখে কৌতুক বোধ করেছিল ওরা, ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি গোল্ডেন টাওয়ার হোটেল থেকে শিরিন আক্তারকে ধরে নিয়ে ফিরে যাচ্ছে কবীর চৌধুরীর লোকেরা।

বিশ মিনিট পর হোটেলে পৌঁছে জাপানী ম্যানেজার মিসেস কাওয়াসাকার মুখে শুনল, ড্রিম ড্রিম ড্রাম বাজাতে বাজাতে একদল লোক এসেছিল, শিরিন আক্তারকে মুখোশ পরিয়ে নিয়ে গেছে তারা। মিসেস কাওয়াসাকাকে ধারণা দেয়া হয়, রানার সাথে শিরিনের আজ বিয়ে, কনেকে সাজাবার জন্যে নিয়ে যেতে এসেছে তারা।

লনে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল, 'ইয়াল্লা! সর্বনাশ হয়ে গেচে,' বলে কটেজের দিকে ছুটল গিলটি মিয়া। হতভম্ব মিসেস কাওয়াসাকাকে পিছনে রেখে রানাও হন হন করে এগোল, উদ্বেগ আর পরাজয়ের গ্লানিতে থমথম করছে চেহারা।

ট্রাকটা দাঁড়িয়ে ছিল কটেজের পিছনে। বয়-বেয়ারাদের কাছ থেকে জানা গেল, ট্রাক থেকে নেমে কটেজে ঢোকার সময় ড্রাম বাজাতে শুরু করে লোকগুলো। আশপাশের কটেজ থেকে বোর্ডাররা বেরিয়ে আসে, কিন্তু বাদকদের ভিড় ঠেলে কেউ তারা ভেতরে ঢুকতে পারেনি। দরজার বাইরে ড্রিম ড্রিম ড্রাম বাজছে শুনে তালা খুলে বেরিয়ে আসে শিরিন, সাথে সাথে তার মুখে একটা মুখোশ পরিয়ে দেয়া হয়। কি ঘটছে বুঝতে পারলেও, কিছুই করার ছিল না তার। তাকে মাঝখানে নিয়ে ধীরে ধীরে আবার ট্রাকের দিকে ফিরে যায় কবীর চৌধুরীর লোকেরা। সন্দেহ নেই, আগ্নেয়াস্ত্রও দেখানো হয়েছিল তাকে।

শিরিনের কামরায় ঢুকে পায়চারি শুরু করল রানা। নিজেকে তিরস্কার করল ও, মেয়েটাকে একা রেখে যাওয়া উচিত হয়নি ওর। ভেবেই পেল না এত তাড়াতাড়ি ওরা শিরিনের খোঁজ পেল কিভাবে!

পায়চারি থামিয়ে ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল রানা, টামপা-র এফ. বি. আই. হেডকোয়ার্টারের সাথে কথা বলল। রিপোর্ট করার পর কয়েকটা পরামর্শ দিল ওদেরকে। 'সমস্ত এয়ারপোর্ট, রেল স্টেশন, আর হাইওয়ের ওপর নজর রাখুন। এখুনি আমি ওয়াশিংটনের সাথে কথা বলছি, আমার পরামর্শ মত কাজ করার জন্যে ওখান থেকে নির্দেশ পাবেন আপনারা।··· ধন্যবাদ। ফোনের ধারে আছি আমরা।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। 'তবু ভাল যে সহযোগিতা করছে ওরা,' গিলটি

মিয়াকে বলল ও। 'ফোর্স পাঠাতে রাজি হয়েছে, আধ ঘণ্টার মধ্যে হানা দেবে স্নেক ট্রেডার্সে।'

'কিন্তু...'

'আমারও তাই ধারণা,' গিলটি মিয়াকে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা, 'শিরিনকে ওরা স্নেক ট্রেডার্সে নিয়ে যায়নি। কিন্তু আরেকবার হানা দেয়ার সুযোগ এফ. বি. আই. ছাড়তে চাইছে না। তল্লাশি চালিয়ে আবার ওরা দেখতে চায় সোনার মোহর পাওয়া যায় কিনা।'

রানা থামার পর পায়চারি শুরু করেছে গিলটি মিয়া। 'কিচু একটা করতে হয়, স্যার। অমন ফুলের মতন সুন্দর মেয়েটাকে ধরে লিয়ে গেল!' অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশে শার্টের আস্তিন গুটাল সে। 'আমাকে কি করতে হবে বলে দিন!'

'নিউ ইয়র্ক আর ওয়াশিংটনের সাথে কথা বলব আমি,' বলল রানা, 'তুমি দেখো, মিসেস কাওয়াসাকার কাছ থেকে আর কি জানা যায়। ঠিক কখন এসেছিল ওরা, দৈহিক বর্ণনা, ট্রাকের নম্বর, এ-সব জেনে নাও। মিসেস কাওয়াসাকাকে বলবে, এটা একটা ডাকাতির ঘটনা, ডাকাতদের সাথে সহযোগিতা করেছে শিরিন আক্তার। সাধারণ হোটেল ক্রাইম হিসেবে দেখাতে হবে ব্যাপারটাকে। বলবে, পুলিস আসছে, এবং আমরা হোটেল কর্তৃপক্ষকে দায়ী করছি না।'

কামরা থেকে বেরিয়ে গেল গিলটি মিয়া।

ওদের সাথে সহযোগিতা করেছে শিরিন?

একটা সম্ভাবনা বটে। কিন্তু কেন যেন তা রানার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল না।

শিরিনের কামরা এটা। পরীক্ষা করে একবার দেখা দরকার। শিরিন দরজা খোলার সাথে সাথে তার মুখে মুখোশ পরিয়ে দেয়া হয়েছিল, দরজা খোলার সময় নিশ্চয়ই তার হাতে হাতব্যাগটা ছিল না। অন্তত থাকার কথা নয়।

বিছানার নিচে হাতব্যাগটা পাওয়া গেল, শিরিনের পাঁচ হাজার ডলার সবই রয়েছে। লোকগুলোর সাথে শিরিন যদি স্বেচ্ছায় যেত, এই ডলার অবশ্যই রেখে যেত না।

এরপর খাটের নিচে শিরিনের একপাটি স্যান্ডেল দেখতে পেল রানা। কোন সন্দেহ নেই, ওর জন্যে শিরিনের একটা মেসেজ এটা। বিপদ টের পেয়ে পায়ের একটা স্যান্ডেল পিছন দিকে ঠেলে দেয় সে।

না, শিরিনকে বিশ্বাস করে ভুল করেনি ও।

ডলারগুলো পকেটে ভরল রানা। কবীর চৌধুরী যদি শিরিনের কোন ক্ষতি করে, এই টাকা প্রতিশোধ নেয়ার কাজে ব্যয় করবে ও।

আধ ঘণ্টা পর একজন পুলিস অফিসারকে নিয়ে ম্যানেজারের অফিসে ঢুকল রানা। গিলটি মিয়া আগে থেকেই রয়েছে। ওদের জবানবন্দী নিয়ে ফিরে গেল অফিসার। গিলটি মিয়াকে নিয়ে ডাইনিং হলে চলে এল রানা।

সাড়ে আটটায় ডিনার শুরু হয়, পৌনে ন'টা বাজে। হলে প্রচুর লোকজন। ওদেরকে দেখে অনেকেই আড়ষ্ট হয়ে উঠল, যুবা বয়সের দু'একজন চোখে

কৌতূহল নিয়ে তাকাল। সবার মনেই প্রশ্ন, কারা এই বিদেশী? কি কাজ এখানে ওদের? সাথে যে সুন্দরী মেয়েটা ছিল, কোথায় সে? পুলিস এল, অথচ ওদেরকে গ্রেফতার করল না কেন?

প্রায় প্রত্যেকটি টেবিলে একবার করে থামল মিসেস কাওয়াসাকা, ফিসফিস করে ব্যাখ্যা করল পরিস্থিতিটা, 'ওঁরা একটা ইনভেস্টিগেটিং ফার্মের লোক, সরকারের অনুমতি নিয়ে সংঘবদ্ধ একটা ক্রিমিন্যাল দলের বিরুদ্ধে কাজ করছেন।'

নিঃশব্দে খাওয়াদাওয়া সারল রানা। ওর থমথমে চেহারা দেখে গিলটি মিয়াও মুখ খুলল না। কটেজে ফিরে তালা খুলতে যাবে, ভেতর থেকে ফোন বেজে উঠল। রানার কামরায় ঢুকল ওরা।

টামপা-র এফ. বি. আই. হেডকোয়ার্টার থেকে রানাকে জানানো হলো, স্নেক ট্রেডার্সে হানা দিয়ে শিরিনকে পাওয়া যায়নি। স্নেক ট্রেডার্সের ম্যানেজার সানডাক আর তার দু'জন কর্মচারীকে হেডকোয়ার্টারে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে, প্রথম দফা জেরা করে কোন তথ্যই বের করা যায়নি। সারারাত ধরে জেরা চলবে, যদিও তাতে বিশেষ লাভ হবে বলে মনে হয় না। তিনজনই ওরা ঘটনার সময় বন্দর এলাকায় ছিল, লোকজন দেখেছে। এফ. বি. আই. তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনতে পারছে না। ইতোমধ্যে খবর পেয়ে রওনা হয়ে গেছে সানডাকের লইয়ার, সম্ভবত সকাল হবার আগেই সানডাক আর তার লোকদের ছেড়ে দিতে হবে।

আরেকটা খবর, বন্দর এলাকার কুখ্যাত গুণ্ডাপাণ্ডাদের কাউকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ করে তারা যেন সবাই বাতাসে মিলিয়ে গেছে। পুলিসের সাথে একযোগে কাজ করছে এফ. বি. আই., চিহ্নিত অপরাধীদের খুঁজে বের করার জন্যে সারারাত ধরে সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় সার্চ পার্টি পাঠানো হবে।

স্নেক ট্রেডার্সে তল্লাশি চালিয়ে সোনার কোন মোহরও পাওয়া যায়নি, প্রতিবারের মত এবারও বোকা বনে ফিরতে হয়েছে ওদেরকে।

ওয়াশিংটন থেকে জরুরী বার্তা এসেছে হেডকোয়ার্টারে। মি. মাসুদ রানার সাথে সম্ভাব্য সবরকম সহযোগিতা করার নির্দেশ পেয়েছে ওরা।

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা, ভাবল, ঢাকা থেকে মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান কলকাঠি নাড়ায় ফল হয়েছে। এফ. বি. আই.-এর কাছ থেকে সহযোগিতা পেতে আর কোন অসুবিধে হবে না।

একটা সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি শুরু করল রানা। কিছুই করার নেই, তাই অসহায় লাগছে। নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ না থাকায় সানডাককে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে এফ. বি. আই., কিন্তু ও তাকে ছাড়বে না। সকাল হোক, স্নেক ট্রেডার্সে গিয়ে লোকটার গায়ের ছাল তুলে নেবে ও। বাপ বাপ করে সব কথা স্বীকার করতে হবে ব্যাটাকে।

শিরিনকে যে সানডাকের নির্দেশেই কিডন্যাপ করা হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'যাও, তুমি শুয়ে পড়ো,' গিলটি মিয়াকে বলল রানা। 'রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে।'

ম্লান মুখ তুলে, করুণ চোখে তাকাল গিলটি মিয়া। ভাবল, মেয়েটার কতা ভেবে অস্থির হয়ে আচে স্যার। কিচু একটা করা দরকার আমার। কিন্তু এ যে বিদেশ-বিভুঁই! মেয়েটাকে কোতায় লিয়ে গেচে জানলে আমি শালা একলাই···।

ভুরু কুঁচকে রানা তাকাতেই তাড়াতাড়ি কামরা থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল গিলটি মিয়া।

দু'ঘরের মাঝখানের দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। নতুন আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে একটা চেয়ারে বসল, জানালা দিয়ে তাকাল সাগরের দিকে।

সাগর যেন গোঙাচ্ছে। আকাশে চাঁদ আর মেঘের লুকোচুরি খেলা চলছে। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা। শিরিনের ওপর ওরা এখন কি নির্যাতন করছে কে জানে!

বিছানায় শুয়ে বালিশের ওপর কনুই রেখে মাথাটা উঁচু করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল রানা। ঘুম আসবে না জানে। কেসটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা তাগাদা অনুভব করল ও। শুধু শিরিনের খোঁজে নয়, স্বর্ণমুদ্রার খোঁজেও স্নেক ট্রেডার্সের ওয়্যারহাউজে একবার যাওয়া দরকার ওর। কবীর চৌধুরীর ইয়ট আল-আমিন জ্যামাইকা থেকে ফিরে এসে স্নেক ট্রেডার্সের নিজস্ব জেটিতেই নোঙর ফেলে।

পুলিস আর এফ.বি.আই. অবশ্য কয়েকবারই সার্চ করেছে ওয়্যারহাউজ। তবু, কেন যেন মনে হচ্ছে, ওর নিজেরও একবার দেখা দরকার।

স্বর্ণমুদ্রা যদি আল-আমিনে করে নিয়ে আসা হয়, তাহলে নিশ্চয়ই ওয়্যারহাউজে খালাস করা হয় সেগুলো। সার্চ করে কিছুই পাওয়া যায়নি, কারণটা কি? সাপ আনছে আল-আমিন, সাপের পেটে করে কিছু আনা অসম্ভব নয়। দেখতে হবে, খাঁচার মেঝেতে বালি বা মাটি আছে কিনা। বিষাক্ত সাপ, তাই খাঁচার ভেতর হাত দিয়ে দেখে না কেউ? কে জানে, খাঁচার মেঝের নিচে হয়তো ফলস বটম আছে।

কিন্তু এ-সব সম্ভাবনা কি আর এফ.বি.আই. এজেন্টদের মাথায় আসেনি!

সন্দেহ নেই, অদ্ভুত কোন কৌশলে কাজটা করছে ওরা। কাল সকালে গিয়ে নিজের চোখে সব একবার দেখে আসতে হবে। একটু বেলা করে যাবে ও, সানডাককে এফ.বি.আই. ছেড়ে দেয়ার পর। লোকটার সাথে ওর কিছুটা ব্যক্তিগত বোঝাপড়া আছে।

ঘুম এল শেষ রাতের দিকে। ভাঙল আটটারও পরে। বাথরূম থেকে ফিরে মাঝখানের দরজাটা খুলল ও। বিছানা খালি, ঘরে কেউ নেই। টেবিলের ওপর চোখ পড়ল। একটা এনভেলাপ।

এনভেলাপ ছিঁড়ে ছোট্ট একটা চিরকুট বের করল রানা। কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং, দেখেই চিনতে পারল গিলটি মিয়ার হাতের লেখা।

'চোকে যেন লংকা গুঁড়ো পড়েচে। ঘুম আসচে না। একোন ভোর পাঁচটা, সাপের আড়তে একবার ঢুঁ মেরে আসতে যাচ্চি। ত্যাঁদোড় সানডাককে আমার সন্দো হচ্চে। মেয়েটাকে যকোন কিডন্যাপ করা হচ্চিলো, ও ব্যাটা তকোন রাইফেল হাতে লিয়ে বসেছিল জেটির কাচে। গু-খেকোটা যেন জানত আমরা

শহরে এয়েচি, যেন তৈরি হয়েছিলো কিডন্যাপের ঘটনাটা যদি কেঁচে যায় তাহালে সাহায্য করবে বলে। বেলা দশটা নাগাদ না ফিরলে ধরে লেবেন ওরা আমাকে জামাই আদর করচে। আপনার অনুগত গিলটি মিয়া।'

এখুনি রওনা হবে রানা, অপেক্ষা করার ধৈর্য নেই। ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিয়ে দাড়ি কামাল। গরম কফিতে তাড়াতাড়ি চুমুক দিতে গিয়ে জিভ পোড়াল। দশ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি হয়ে গেল, কিন্তু বাধা দিল টেলিফোনটা। ক্রিং ক্রিং শুনে ছুটে নিজের কামরায় ফিরে আসতে হলো।

'মি. হায়দার? সিটি হাসপাতাল থেকে বলছি,' অত্যন্ত মার্জিত একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল রিসিভারে। 'ইমার্জেন্সী ওয়ার্ড। আপনার কি···?'

বাধা দিয়ে রানা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কে বলছেন, প্লীজ?'

'আমি ডাক্তার পিয়ারসন। এখানে এক ভদ্রলোক বলছেন আপনি নাকি তার আপনজন···।'

'কে?' ভুরু কুঁচকে উঠল রানার।

ডাক্তার পিয়ারসন বলল, 'এক মিনিট, প্লীজ।' কিছুক্ষণ কোন আওয়াজ নেই। তারপর শোনা গেল, 'উনি নাম বলছেন, মি. গিলটি মিয়া।'

'মাই গড! ও হাসপাতালে কেন?'

'অস্থির হবেন না, প্লীজ, মি. হায়দার,' তাড়াতাড়ি বলল ডাক্তার পিয়ারসন। 'আপনি কি এখুনি একবার আসতে পারবেন এখানে?'

বুকের ভেতরটা ধক ধক করছে রানার। 'কি হয়েছে ওর?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল। 'কেমন আছে ও?'

'না-না, সিরিয়াস কিছু না, মি. হায়দার,' ডাক্তার পিয়ারসন বলল। 'কার অ্যাক্সিডেন্ট। সামান্য একটু আহত হয়েছেন। আসতে পারবেন কি? আপনাকে দেখার জন্যে একটু অস্থির হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক।'

'আসছি,' বলল রানা। 'এখুনি আসছি।'

কটেজ থেকে বেরিয়ে লনের ওপর দিয়ে ছুটল রানা। ব্যাপারটা আসলে কি? নিশ্চয়ই সানডাকের লোকেরা মারধর করে ফেলে রেখে গিয়েছিল রাস্তায়, কেউ হাসপাতালে নিয়ে গেছে। ভাগ্যই বলতে হবে একেবারে মেরে ফেলেনি।

'সিটি হাসপাতাল,' ট্যাক্সিতে উঠে ড্রাইভারকে বলল রানা। 'জলদি। ডবল ভাড়া।'

তুফানের বেগে ছুটল ট্যাক্সি।

বাঁক নিয়ে ট্রেজার আইল্যান্ড কজওয়ে-তে উঠেছে ওরা, ওঁয়া-ওঁ, ওঁয়া-ওঁ করতে করতে তীর বেগে উল্টো দিকে ছুটে গেল একটা অ্যাম্বুলেন্স। চারদিকে শুধু দুর্ঘটনা, ভাবল রানা।

সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে সেন্ট পিটার্সবার্গ পেরিয়ে এল ওরা। এরপর ডানদিকে বাঁক নিল। গিলটি মিয়াকে নিয়ে এই রাস্তা দিয়েই স্নেক ট্রেডার্সে গিয়েছিল রানা। সিটি হাসপাতাল থেকে স্নেক ট্রেডার্স খুব দূরে নয় দেখে রানার সন্দেহ আরও বাড়ল—অ্যাক্সিডেন্ট হতেই পারে না।

ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে চারতলা হাসপাতাল ভবনের ভেতর ঢুকল রানা। প্রথমেই বিশাল রিসেপশন হল। ডেস্কের পিছনে বসে দৈনিক সেন্ট পিটার্সবার্গ টাইমস পড়ছে সুনয়না এক নার্স।

'ডা. পিয়ারসন কোথায় বলতে পারেন?'

কাগজ থেকে মুখ তুলল নার্স। 'ডা. কে?' আগন্তুকের চেহারা আর বেশভূষা দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ-মুখ।

'ডা. পিয়ারসন, ইমার্জেন্সী ওয়ার্ড,' দ্রুত বলল রানা, ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে। 'আমার রোগীর নাম মি. গিলটি মিয়া। আজ সকালে আনা হয়েছে।'

'পিয়ারসন নামে এখানে কোন ডাক্তার নেই, দুঃখিত, স্যার,' বলল নার্স। 'এক সেকেন্ড, প্লীজ।' ডেস্কের ওপর থেকে একটা তালিকা তুলে চোখ বুলাল সে। 'মি. গিলটি মিয়া নামে কোন রোগীও আজ ভর্তি হননি। তবু, ইমার্জেন্সীর সাথে কথা বলে দেখছি। কি যেন আপনার নাম বললেন?'

'বলিনি,' কর্কশ শোনাল রানার গলা। 'সুজা হায়দার।' ঠাণ্ডা হল, তবু ঘামতে শুরু করেছে রানা। ট্রাউজারে ঘষে ভিজে হাতের তালু মুছল। আতঙ্কটাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করল। মেয়েটা কোন কাজের নয়, ভাবল ও। খুব বেশি সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে এই এক জ্বালা, কোন কাজে এক্সপার্ট হতে পারে না। হাসিখুশি, কৌতুক মেশানো গলায় টেলিফোনে কথা বলছে দেখে পিত্তি জ্বলে গেল রানার।

রিসিভার নামিয়ে রাখল নার্স। 'দুঃখিত, মি. সুজা হায়দার। নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হয়েছে। রাত থেকে এখন পর্যন্ত কোন রোগী ভর্তি হননি। পিয়ারসন নামেও কোন ডাক্তার আমাদের হাসপাতালে নেই। আমার মনে হয়, হাসপাতালের নামটা আপনি ভুল করেছেন...'

কথা না বাড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানা। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। সকৌতুকে রানার পিছনে মুখ ভেংচাল মেয়েটা।

গেটের বাইরে একটা ট্যাক্সি এসে থামল, আরোহীরা নামতেই উঠে বসল রানা। 'গোল্ডেন টাওয়ার হোটেল,' ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল ও।

কোন সন্দেহ নেই, গিলটি মিয়া কবীর চৌধুরীর লোকেদের হাতে গিয়ে পড়েছে। যে-কোন কারণেই হোক, হোটেল থেকে রানাকে সরিয়ে দেয়ার মতলব ছিল ওদের। অনেক ভেবেও কারণটা কি হতে পারে আন্দাজ করতে পারল না রানা।

খেলছে কবীর চৌধুরী। শিরিনকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। গিলটি মিয়াকে আটক করেছে। পরের আঘাতটা কোন্ দিক দিয়ে আসবে কে জানে।

ট্যাক্সি থেকে ওকে নামতে দেখে পড়িমরি করে ছুটে এল মিসেস কাওয়াসাকা। তাকে দেখেই দুঃসংবাদের জন্যে মনটাকে শক্ত করল রানা।

'আহা, কি দুঃখজনক!' বলল বটে, কিন্তু মিসেস কাওয়াসাকার চেহারায় বা কণ্ঠস্বরে সহানুভূতির কোন ছাপ দেখা গেল না। 'আসলে আরও সাবধান থাকা দরকার ছিল ভদ্রলোকের।'

'বলুন!' কটমট করে তাকাল রানা। 'কি ঘটেছে?' প্রায় ধমকের সুরে প্রশ্ন

করল ও।

'আপনার বন্ধু, মিস্টার গিলটি মিয়া!' মিসেস কাওয়াসাকার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে উত্তেজনায়।

'কোথায়?'

'কটেজে,' বলল মিসেস কাওয়াসাকা। 'এই তো খানিক আগে অ্যাম্বুলেন্সে করে দিয়ে গেল...'

হন হন করে এগোতে শুরু করে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'অ্যাম্বুলেন্স?'

'তবে আর বলছি কি!' চোখ বড়বড় করল মিসেস কাওয়াসাকা। 'লোকগুলো আমাকে বলল, মি. গিলটি মিয়া তাঁর গাড়ি নিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন। স্ট্রেচারে করে নামাল ওরা, চাদর ঢাকা ছিল, দেখতে পাইনি। ওরা বলল, সামান্য আঘাত, ঠিক হয়ে যাবে, তবে কেউ যেন ওকে বিরক্ত না করে। চাদর সরে যাওয়ায় শুধু ব্যান্ডেজ দেখতে পেলাম। আহা, বেচারা! একটু যদি সাবধানে গাড়ি চালাতেন...'

লনের ওপর দিয়ে ছুটল রানা। লবি পেরিয়ে ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়ল কটেজে। ঘরে পা দিয়েই চোখ পড়ল গিলটি মিয়ার বিছানায়। চাদর মোড়া মানুষের একটা আকৃতি। গিলটি মিয়া? বিশ্বাস হয় না।

গিলটি মিয়া ছোটখাট মানুষ। কিন্তু চাদরের নিচে প্রকাণ্ড একটা আকৃতি। দম দেয়া পুতুলের মত, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে এগোল রানা। লক্ষ করল, চাদরটা এক চুল নড়ছে না। দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সামলে রাখার চেষ্টা করল ও, ঝুঁকে পড়ল বিছানার ওপর। দুই আঙুল দিয়ে আস্তে করে চাদরের একটা কোণ ধরল। হাতটা কাঁপছে।

ব্যান্ডেজে ঢাকা মুখ। সাদা, জালের মত ফাঁক ফাঁক কাপড়ের নিচে হাড়-মাংস-চামড়া নয়, তুলো। ব্যান্ডেজ সরিয়ে এক টুকরো তুলো ফেলে দিল রানা। রূপালি কপালের খানিকটা উন্মুক্ত হলো। থর থর করে কেঁপে উঠল রানা, দু'চোখ ভরে গেল পানিতে।

আলপিন!

তামাটে কপাল ঢাকা পড়ে গেছে রূপালি আলপিনে। পাতলা চামড়া, তারপরই হাড়, কাজেই পিনগুলো খাড়াভাবে ঢোকানো সম্ভব হয়নি। খুব যত্নের সাথে, প্রচুর সময় নিয়ে একটা একটা করে পিন তেরছাভাবে ঢোকানো হয়েছে চামড়ার ভেতর। পাশাপাশি, প্রায় গায়ে গা ঠেকিয়ে শুয়ে রয়েছে পিনগুলো, বেরিয়ে আছে শুধু খোলা ছাতা আকৃতির মাথা। যেখানে চামড়া ভেদ করেছে পিন, কিনারা ঘিরে ভেজা ভেজা, আর লালচে।

গিলটি মিয়া কিনা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু আর কেই-বা হতে পারে।

ব্যান্ডেজ মাত্র এক প্যাঁচ করে, তারপরই তুলো। ধীরে ধীরে প্যাঁচ খুলে তুলো সরাল রানা। একটু একটু করে উন্মুক্ত হলো গোটা কপাল, ভুরু, চোখ। আর কোন সন্দেহ নেই।

চোখের পাতা থেকে পিন খুলতে গিয়ে ফোঁপাতে শুরু করল রানা। নাকের ফুটোয় তুলো বা ব্যান্ডেজ নেই, বোঝা গেল নাকের ব্রিজ থেকে তুলো সরাবার পর। ফুটো দুটোর কাছে হাত রেখে শ্বাস বইছে কিনা অনুভব করার চেষ্টা করল রানা।

সব হারাবার আতঙ্কে বিকৃত হয়ে উঠল চেহারা।

ধীরে ধীরে, সাবধানে চাদরটা তুলে ফেলল রানা। সারা শরীরেই ব্যান্ডেজ। বিছানার ওপর উঠল ও, গিলটি মিয়ার মাথা কোলে নিয়ে বুকের ব্যান্ডেজ খুলতে শুরু করল।

কিভাবে যেন গিলটি মিয়ার খুলি থেকে বেরিয়ে এসে একটা পিন খোঁচা দিল রানার উরুতে, ব্যথায় উফ্ করে উঠল ও। মানুষটা কি রকম কষ্ট পেয়েছে অনুভব করে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল রানা। কয়েক সেকেন্ড বুদ্ধি হারিয়ে পাথরের মূর্তি হয়ে থাকল। খুলি থেকে পিন তুলতে গিয়ে দেখল, হাত দুটো অসম্ভব কাঁপছে, কাজ এগোচ্ছে না।

আবার বুকের ব্যান্ডেজ খুলতে শুরু করল রানা। খোলার পর দেখল শুধু হৃৎপিণ্ডের চারদিক বাদ দিয়ে বুকেও গায়ে গা ঠেকিয়ে পিন গাঁথা হয়েছে। পিনের ওপর আস্তে করে মাথা নামাল রানা, যেন প্রিয়জনকে আদর করছে।

বোঝা যায় না, অস্পষ্ট, কিন্তু টের পাওয়া যায়। হার্টবিট বন্ধ হয়নি এখনও।

এবার নতুন একটা ভয় গ্রাস করল রানাকে। যে-টুকু দম আছে তাও যদি নাড়াচাড়ায় বন্ধ হয়ে যায়?

ডাক্তার, ডাক্তার চাই! কাঁপা হাতদুটোকে অনেক কষ্টে বশে আনল রানা। কোল থেকে বালিশের ওপর আলতো ভাবে নামাল গিলটি মিয়ার মাথা। বিছানা থেকে নামল ও। পাশের ঘরে ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন।

গিলটি মিয়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রানা। ওর ঠোঁট জোড়া নড়ছে। এখন আর ফোঁপাচ্ছে না ও। চোখের পানিতে শুধু ভিজে আছে গাল।

হঠাৎ সারা শরীরে আশার একটা ঢেউ বয়ে গেল। ভুল দেখেনি তো?

না, ভুল নয়। একটু একটু কাঁপছে গিলটি মিয়ার চোখের পাতা। পিনগুলো তাহলে শুধু পাতা ভেদ করেছিল, মণির কোন ক্ষতি করেনি। চোখ মেলল গিলটি মিয়া। কিন্তু ভাষাহীন দৃষ্টি, কিছু দেখতে পাচ্ছে না। ধীরে ধীরে নড়তে শুরু করল মণি দুটো। এবার দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছে গিলটি মিয়া।

ক্রিং ক্রিং বেজেই চলেছে ফোনের বেল।

রানার দিকে তাকাল গিলটি মিয়া। রক্তাক্ত ঠোঁট জোড়া কাঁপল। বিড়বিড় করে কি যেন বলছে সে। ঝুঁকে, তার ঠোঁটের কাছে কান নামাল রানা।

'চিন্তা করবেন না, স্যার,' অস্ফুটে বলল গিলটি মিয়া। 'মার খাওয়া শরীল, আপনার দোয়ায় ঠিক সামলে লেব।'

রানা সিধে হয়ে দাঁড়াবার আগেই আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলল গিলটি মিয়া।

পাশের ঘরে এসে ফোনের রিসিভার তুলল রানা। 'হ্যালো?'

'এরকম মজাদার কৌতুক আরও অনেক করব আমরা তোমার সাথে!' কথাটা

শেষ হবার সাথে সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল যোগাযোগ।

ভারী, থমথমে কণ্ঠস্বর, বিশুদ্ধ বাংলা—চিনতে অসুবিধে হলো না। লং ডিসট্যান্স কল।

হাত দুটো শক্তমুঠো হয়ে গেল রানার, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, তোমাকে খুন না করে দেশে ফিরব না, কবীর চৌধুরী!

হাতে ধরা রিসিভারের দিকে একবার তাকাল রানা, তারপর ডায়াল করল টামপা-র এফ. বি. আই. হেডকোয়ার্টারে। গিলটি মিয়াকে প্রাইভেট কোন ক্লিনিক বা সাধারণ কোন হাসপাতালে ভর্তি করা নিরাপদ নয়। টামপা হেডকোয়ার্টারের ভেতর ওদের নিজস্ব একটা হাসপাতাল আছে, দেখা যাক সেখানে কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা। গোটা পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে কয়েক মিনিট লেগে গেল। অপরপ্রান্ত থেকে বলা হলো; দু'জন ডিটেকটিভ এখুনি রওনা হচ্ছে, অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে একজন এফ. বি. আই. সার্জেনও যাচ্ছে।

গিলটি মিয়ার ঘরে ফিরে এল রানা। ইচ্ছে হলো ডাক্তারের কাজ কিছুটা কমিয়ে দেয়, ধীরে ধীরে খুলতে শুরু করে ব্যান্ডেজ। কিন্তু আনাড়ি হাতে অজ্ঞান দেহ নাড়াচাড়া করলে হিতে বিপরীত ঘটতে পারে ভেবে চিন্তাটা বাদ দিল ও।

পায়চারি শুরু করল রানা। চোখ এখন ভিজে নয়, আতঙ্কে বা আক্রোশে কাঁপছেও না। শান্ত হয়ে গেছে ও, চোখে সাপের মত নির্নিমেষ ঠাণ্ডা দৃষ্টি। মাঝখানে আর একবার শুধু, মুহূর্তের জন্যে, ভাবাবেগে আক্রান্ত হলো ও। গিলটি মিয়ার দিকে তাকিয়ে পায়চারি করছিল, হঠাৎ থেমে ঝুঁকে পড়ল তার দিকে, হাত বুলিয়ে দিল রক্তাক্ত কপালে। বিড়বিড় করে বলল, 'আমি চাই তুমি ভাল হয়ে ওঠো!'

পনেরো মিনিটের মাথায় পৌঁছে গেল ওরা। গিলটি মিয়ার কাছে সার্জেনকে রেখে পাশের কামরায় চলে এল রানা, পিছু পিছু এল ডিটেকটিভ দু'জন। শান্ত গলায় যা যা ঘটেছে সব তাদেরকে বলল ও।

রানার ফোন পেয়ে, এরই মধ্যে, একটা স্কোয়াড কার পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে স্নেক ট্রেডার্সের ঠিকানায়। আশা করা হচ্ছে সানডাক আর তার সহকারীদের গ্রেফতার করে হেডকোয়ার্টারে নিয়ে আসবে তারা। সকালে নয়, রাত চারটের সময় এফ. বি. আই. হেডকোয়ার্টার থেকে সানডাক আর তার কর্মচারীদের ছেড়ে দেয়া হয়েছিল।

দশ মিনিট পর দরজা খুলে সার্জেন ঘরে ঢুকতেই চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠল রানা।

'আমার ধারণা উনি বাঁচবেন,' রানাকে বলল সার্জেন। 'ফিফটি-ফিফটি চান্স। কিন্তু পিনের ডগায় পয়জন থাকলে...,' কথা শেষ না করে কাঁধ ঝাঁকাল সে।

কি বলবে ভেবে পেল না রানা।

'পিনে বিষ ছিল কিনা টেস্ট করলে বোঝা যাবে,' আবার বলল সার্জেন। 'রোগীকে এখুনি আমি হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাই।' কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে, তার পিছু পিছু পাশের কামরায় ঢুকে রানা দেখল, স্ট্রেচারে তোলা হচ্ছে গিলটি মিয়াকে।

অ্যাম্বুলেন্স চলে যাবার পর ডিটেকটিভদের কাছে, নিজের কামরায় ফিরে এল রানা। নিঃসঙ্গ, একা লাগছে। ফোনে কথা বলছে ডিটেকটিভদের একজন; রিসিভারটা বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। প্রথমে নিউ ইয়র্ক, তারপর ওয়াশিংটনের সাথে কথা বলল রানা। রিসিভার নামিয়ে রাখতেই ফোন এল সেন্ট পিটার্সবার্গ পুলিস দফতর থেকে। তারা জানতে চাইল, বন্দর এলাকায় এ-সব কি ঘটছে? ডিটেকটিভদের একজন জবাব দিল, এটা একটা ফেডারেল কেস, অনুরোধ না করলে পুলিসকে মাথা ঘামাতে হবে না।

এরপর একটা কল-বক্স থেকে স্কোয়াডের ইনচার্জ, লেফটেন্যান্ট রবিনসন রিপোর্ট করল। স্নেক ট্রেডার্সের ওয়্যারহাউজ আবার তারা তন্নতন্ন করে সার্চ করেছে, বিষাক্ত সাপ আর সাপের খাঁচা ছাড়া কিছুই দেখতে পায়নি। ভোর পাঁচটা থেকে সানডাক আর তার কর্মচারীরা বন্দর এলাকার একটা বারে ছিল, একটু আগে গেফতারের আগে পর্যন্ত মুহূর্তের জন্যেও বাইরে কোথাও যায়নি তারা। খবর পেয়ে সানডাকের লইয়ার হেডকোয়ার্টারে এসেছে। কোন অভিযোগ দায়ের করা যাচ্ছে না, কাজেই ওদেরকে বোধহয় আবারও ছেড়েই দিতে হবে।

বন্দর এলাকায়, ইয়ট বেসিনের উল্টো দিকে গিলটি মিয়ার ভাড়া করা গাড়িটা পাওয়া গেছে। গাড়িতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট রয়েছে অনেকগুলো, কিন্তু সানডাক বা তার কর্মচারীদের সাথে মেলে না।

রানার সাথে দীর্ঘ আলোচনা শেষ করে ডিটেকটিভরা যখন ফিরে গেল, বেলা তখন তিনটে। যাবার আগে রানার পরবর্তী প্ল্যান সম্পর্কে জানতে চাইল তারা। কিন্তু রানা স্পষ্ট করে কিছু বলল না। জানাল, ওয়াশিংটন আর ঢাকার সাথে কথা বলতে হবে ওকে। ওর অনুরোধ শুনে ডিটেকটিভরা বলল, ঠিক আছে, গিলটি মিয়ার গাড়িটা ওরা পাঠিয়ে দেবে।

ওদেরকে বিদায় দিয়ে একা বসে চিন্তা শুরু করল রানা। খানিক আগে বেয়ারা স্যান্ডউইচ আর কফি দিয়ে গেছে, কিন্তু খাবারে রুচি নেই।

বেলা সাড়ে তিনটের সময় প্রত্যাশিত ফোনটা এল। ওয়াশিংটন থেকে স্বয়ং সি.আই.এ.-র ডেপুটি ডিরেক্টর কথা বলছেন। কর্নেল অবসন। রানাকে তিনি বললেন, 'আপনার বসের সাথে কথা হয়েছে, মি. রানা। তাঁর মত আমারও ধারণা, মোহর রহস্যের সমাধান নিউ ইয়র্ক বা সেন্ট পিটার্সবার্গে নেই। আপনি বরং জ্যামাইকায় গিয়ে তদন্ত করুন।'

রানা জানে, কাল একটা ফ্লাইট আছে, বলল, 'ঠিক আছে, তাই। আর কোন খবর আছে কি?'

হ্যাঁ, আছে। হারলেমের ভদ্রলোক, মি. ওয়াইজ, তাঁর বান্ধবী মিস শিরিন খান্দোরকে নিয়ে হাভানার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছেন। ইস্ট কোস্টের অত্যন্ত ছোট একটা প্রাইভেট এয়ার লাইন্সের প্লেন চার্টার করেছেন তিনি। ছোট বলেই সম্ভবত এই চার্টার কোম্পানীর ওপর এফ. বি. আই. এজেন্টরা চোখ রাখার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেনি। হ্যাঁ, প্লেনটা পৌঁছে গেছে কিউবায়, ওখানকার সি.আই.এ. এজেন্ট কনফার্ম করেছে খবরটা। হ্যাঁ, খুব খারাপ হলো। হ্যাঁ, আল-আমিন এখনও

ওখানেই রয়েছে। না, কবে নোঙর তুলবে জানা যায়নি। মি. রানা তাহলে কাল পৌঁছে যাবেন জ্যামাইকায়? গুড। বাই।

রিসিভার নামিয়ে রেখে একটা সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় কাত হলো রানা। অপেক্ষা করছে রাত নামার জন্যে।

দুই

সন্ধ্যার পর বিল মেটাবার জন্যে ম্যানেজারের অফিসে ঢুকল রানা, হাতে স্যুটকেস। মূর্তিমান বিপদ বিদায় নিচ্ছে বুঝতে পেরে পরম স্বস্তিবোধ করল মিসেস কাওয়াসাকা। আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করল রানা, 'আমাদের জন্যে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে আপনাকে। সত্যি দুঃখিত...'

'উচিত,' বলে চেকটা দেরাজে রাখল মিসেস কাওয়াসাকা, তারপর খবরের কাগজ তুলে মুখ ঢাকল।

মৃদু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে এল রানা।

এফ. বি. আই. এজেন্ট গিলটি মিয়ার ভাড়া করা গাড়িটা হোটেলের সামনে পৌঁছে দিয়ে গেছে, সেটা নিয়ে শহরে চলে এল রানা। স্টেশনারী আর হার্ডওয়্যারের দোকানে ঢুকে টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস কিনল। খিদেয় চোঁ চোঁ করছে পেট, একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে ফ্রেঞ্চ সালাদের সাথে মস্ত একটা স্টেক খেলো। সবশেষে পরপর দু'কাপ কফি। সিগারেট ধরাবার ফাঁকে রেস্তোরাঁর চারদিকে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিল। ওর পর নতুন কেউ আর ঢোকেনি। দরজা দিয়ে বাইরের ফুটপাথ দেখা যায়, কেউ ঘুর ঘুর করছে বলে মনে হলো না।

পেটে দানা-পানি পড়ায় আত্মবিশ্বাস আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ভাবটা নতুন করে ফিরে এল মনে। কাল ও জ্যামাইকায় চলে যাবে ঠিক, কিন্তু যাবার আগে সানডাকের একটা ব্যবস্থা অবশ্যই করবে। এফ. বি. আই. কয়েকবার তল্লাশি চালিয়েও সোনার মোহরের সন্ধান পায়নি, তাদের এই ব্যর্থতায় হতাশ হওয়া তো দূরের কথা, চ্যালেঞ্জ অনুভব করল রানা। জ্যামাইকা থেকে নিয়ে এসে সোনার মোহর যে ওয়্যারহাউজেই রাখা হয়, এ-ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত ও।

খুব সহজ আর সাধারণ কোন কৌশল হবে, ফলে মোহরগুলো সামনে পড়ে থাকলেও কারও চোখে পড়ছে না। এভাবে চিন্তা করে একটা ধারণা পেয়ে গেছে রানা, এখন দেখা যাক ওর অনুমান সত্যি কিনা।

আটটায় রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে থানায় পৌঁছল রানা। লেফটেন্যান্ট স্যামসন ডিউটি করছে, রানার সাথে হ্যান্ডশেক করল সে। নানা বিষয়ে রাজ্যের কৌতূহল তার—মিস শিরিন আক্তার সত্যিই কি ডাকাত দলের সদস্যা? পুলিসকে হটিয়ে দিয়ে এফ. বি. আই. গিলটি মিয়ার আহত হবার ব্যাপারটা সামলাতে চাইল, অথচ এখন পর্যন্ত কিছুই তারা করেনি। আপনি, মি. হায়দার, কি করবেন বলে ভাবছেন? স্নেক

ট্রেডার্স কি···

'বন্দর এলাকার একটা ম্যাপ দরকার আমার,' লেফটেন্যান্টকে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা। 'সাহায্য করতে পারবেন? এরপরের বার আমি হয়তো জ্যামাইকা থেকে আল-আমিনে করে এখানে আসব, ম্যাপটা তখন দরকার হতে পারে।' মিথ্যে কথা।

লেফটেন্যান্ট বুঝে নিল, কোন তথ্যই পাওয়া যাবে না। এফ. বি. আই. যাকে সাহায্য করছে তার সাথে অসহযোগিতা করার প্রশ্নই ওঠে না। দেরাজ থেকে একটা ম্যাপ বের করে দিল সে।

রানা থানা থেকে বেরিয়ে যেতেই অফিসরুমের দরজা বন্ধ করল লেফটেন্যান্ট স্যামসন। ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল স্নেক ট্রেডার্সের নাম্বারে। 'সানডাক? তোমার বাপ এসেছিল। বন্দর এলাকার ম্যাপ চেয়ে নিয়ে গেল।···তা জানি না, বুঝে নাও!···কাল সকালে যেন বাড়িতে একজোড়া নোট পৌঁছে যায়।'

থানা থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠল রানা। আলো জ্বেলে ম্যাপটা অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখল। গোটা বন্দর দেখানো হয়েছে ম্যাপে। প্রতিটি ইয়ার্ড, ওয়্যারহাউজ, গ্যারেজ, ক্রেন, রেলপথ, এবং এসকেলেটর চিহ্নিত করা আছে। কোনটা কতটুকু জায়গা দখল করে আছে, রাস্তাগুলো কি পরিমাণ চওড়া, একজোড়া লাইটপোস্টের মাঝখানের দূরত্ব, ইত্যাদি তথ্যও পাওয়া গেল।

গাড়ি নিয়ে শহরের দক্ষিণ প্রান্তে চলে এল রানা, একটু খুঁজতেই বড়সড় একটা গ্যারেজ পাওয়া গেল। অফিসে ঢুকে ম্যানেজারকে বলল, একটা মোবাইল ক্রেন ভাড়া করতে চায় সে। সাথে ড্রাইভার-কাম-অপারেটরও দরকার।

দামী স্যুট, অল্প বয়স, বিদেশী লোক—ভুরু কুঁচকে উঠল ম্যানেজারের। 'কি দরকার?'

হাতঘড়ি দেখল রানা, ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে ব্যাখ্যা করল। রাত দশটা থেকে বারোটার মধ্যে নোঙর ফেলবে ওর বোট, কার্গো খালাস করার জন্যে ক্রেন দরকার ওর। নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, ওর সাথে এফ. বি. আই. সহযোগিতা করছে, কার্গো সম্পর্কে কিছু জানতে হলে ম্যানেজারকে টামপা হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

এফ. বি. আই. জড়িত শুনে কৌতূহল দমন করল ম্যানেজার। প্রতি ঘণ্টার জন্যে বিশ ডলার ভাড়া চাইল সে। পাঁচ ঘণ্টার জন্যে একশো ডলার ভাড়া অগ্রিম দিল রানা। ড্রাইভার-কাম-অপারেটরকে অফিস রুমে ডাকা হলো। পকেট থেকে ম্যাপটা বের করে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করল রানা তাকে।

ম্যাপের ওপর আঙুল রেখে কংক্রিট দিয়ে বাঁধানো সাগরের পাড় দেখিয়ে বলল, এই পৌনে এক মাইলের মধ্যে যে-কোন একটা জেটিতে নোঙর ফেলবে ওর বোট। সঠিক সময় জানা নেই, হয়তো এরই মধ্যে নোঙর ফেলে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে ক্যাপটেন। বোটে আলো জ্বলবে, কাজেই দূর থেকে দেখে চিনতে পারবে ও। ম্যাপের ওপর আঙুল বুলাল ও, এই রাস্তাগুলো দিয়ে ট্রাক নিয়ে যেতে হবে ড্রাইভারকে, ক্রেনের ওপর প্ল্যাটফর্মে বসে থাকবে রানা।

ড্রাইভার আপত্তি করল, 'কেন, এত ঘুর পথে যাব কেন?'

রানা বলল, 'এতক্ষণ তাহলে কি বললাম? বোট যদি ইতিমধ্যে নোঙর ফেলে থাকে, সেটাকে আমার দেখতে পেতে হবে না?'

'কিন্তু ওদিকে অনেক উঁচু ওয়্যারহাউজ আছে…'

'সেজন্যেই তো ক্রেনের ওপর বসে থাকব আমি,' বাধা দিয়ে বলল রানা।

মাঝখান থেকে কথা বলল ম্যানেজার, 'উনি যেভাবে চাইছেন সেভাবে যাও, ব্যারেল।'

ড্রাইভার আর কথা বাড়াল না।

বাইরে এসে রানা তাকে বলল, 'গাড়ি নিয়ে পিছু পিছু আসছি আমি, হর্ন বাজালে থামবে।'

বন্দর এলাকায় চলে এল ওরা। স্নেক ট্রেডার্স আধ মাইলটাক দূরে থাকতে হর্ন বাজাল রানা।

একটা গলির ভেতর গাড়ি রেখে ট্রাকের পাশে ফিরে এল রানা। ড্রাইভারকে বলল, 'ক্রেন তোলো এবার। দাঁড়াও, আগে আমি প্ল্যাটফর্মে উঠে বসি। বাহান্ন ফিট তুলবে, কেমন? রাস্তা থেকে পাঁচ ফিটের মত বাঁ দিকে ঘেঁষে থাকবে প্ল্যাটফর্ম।'

বন্দর এলাকার প্রায় প্রতিটি ওয়্যারহাউজ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ফিট উঁচু।

ট্রাকের পিছনে উঠল রানা, সেখান থেকে চড়ে বসল ক্রেনের প্ল্যাটফর্মে। ক্যাব থেকে ক্রেন অপারেট করল ব্যারেল। ধীরে ধীরে বাঁ দিক ঘেঁষে ওপরে উঠল ক্রেন, বাহান্ন ফিট উঠে স্থির হলো। কোন সিগন্যালের জন্যে অপেক্ষা না করে ট্রাক ছেড়ে দিল ব্যারেল।

ক্রেন তোলা রয়েছে, কাজেই এবার খুব সাবধানে আর মন্থরবেগে ট্রাক চালাতে হলো ব্যারেলকে। দূর থেকে স্নেক ট্রেডার্সের ওয়্যারহাউজটা দেখতে পেল রানা। জেটির দিকে মুখ ওটার, সেদিকটা স্পটলাইটের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে আছে। পিছন দিকে সরু একটা গলি, কিন্তু বাঁ পাশের রাস্তাটা যথেষ্ট চওড়া। রাস্তার অপর পাশেও ওয়্যারহাউজ, কোনটাই চল্লিশ ফিটের বেশি উঁচু নয়। একজোড়া ওয়্যারহাউজের মাঝখানে একটা গুমটি-ঘর আছে, সম্ভবত নাইট-গার্ডদের জন্যে।

স্নেক ট্রেডার্সের ওয়্যারহাউজটা পঞ্চাশ ফিট উঁচু, গিলটি মিয়ার সাথে প্রথমবার এসে দেখে গেছে রানা। বাঁক নিয়ে চওড়া রাস্তায় ট্রাক ঢুকতেই দেখল, লাইটপোস্টগুলোর টিউব জ্বলছে না, গোটা রাস্তা অন্ধকার হয়ে আছে। গুমটি-ঘরটাকে পাশ কাটিয়ে এল ট্রাক, দরজা বন্ধ, জানালার ভেতর ঘন অন্ধকার।

হিসেবে ভুল করেনি রানা, স্নেক ট্রেডার্সের ওয়্যারহাউজ ঠিক ওর পায়ের কাছে, মাত্র দু'ফিট নিচে। ঢেউ টিনের ছাদ, ক্রমশ উঁচু হয়ে শিরদাঁড়ার দিকে উঠে গেছে। প্ল্যাটফর্মের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে রানা, ছোট একটা লাফ দিয়ে ওয়্যারহাউজের ছাদে নেমে পড়ল। ওয়্যারহাউজের ভেতর থেকে যান্ত্রিক একটা গুঞ্জন ভেসে আসছে, টিনের ছাদের ওপর ওর পায়ের আওয়াজ চাপা পড়ে গেল।

অন্ধকার গুমটি-ঘরের জানালায় মুখ তুলে উঁকি দিল সানডাক। তার

সহকারীরা মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে। চাপা, উৎফুল্ল গলায় হাসল সানডাক। অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে উঠল তার চোখ জোড়া। বসন্তের দাগে ভরা কুৎসিত চেহারায় নিষ্ঠুর একটা ভাব ফুটে উঠল, দেখে যে-কেউ শিউরে উঠবে।

'মই?' জানতে চাইল সে।

'এনেছি,' সহকারীদের একজন বলল।

'কি করতে হবে শোনো,' ফিসফিস করে কাকে কি করতে হবে বুঝিয়ে দিল সানডাক। নিজে কি করবে তাও ওদেরকে জানাল। 'শালা আগে ভেতরে নামুক, তারপর আমরা বেরুব,' সবশেষে বলল সে।

ট্রাকের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা। তারপর ঢেউ টিনের গায়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এল ছাদের শিরদাঁড়ায়। শিরদাঁড়াটা টিনেরই, তবে সমতল। ফুট তিনেক চওড়া হবে। সেটার ওপর দিয়ে ক্রল করে ছাদের মাঝামাঝি জায়গায় এসে থামল ও। সামনে একটা খুদে কুঁড়েঘরের আকৃতি, ফিট তিনেক উঁচু। মাথার ওপর, আর দু'পাশে টিনের আবরণ, বাকি দু'পাশে ফ্রেমে আটকানো কাঁচ। ছিটকিনি আছে, সরিয়ে চাপ দিলে ফ্রেমগুলো সামনে পিছনে আনা-নেয়া করা যায়। এটা আসলে একটা ভেন্টিলেটর, আলো-বাতাসের প্রয়োজন মেটায়।

একটা ফ্রেমে চাপ দিয়ে দেখল রানা। ছিটকিনি ভেতর থেকে বন্ধ, নড়ল না ফ্রেম। পেন্সিল টর্চ বের করে কাঁচের ওপর আলো ফেলল ও। শুধু কাঁচ নয়, তারের সরু জালও রয়েছে ভেতরে।

তৈরি হয়েই এসেছে রানা। আকাশে চাঁদ আছে, পেন্সিল টর্চ এক পকেটে ভরে আরেক পকেট থেকে হীরে বসানো স্টিক বের করল। এক মিনিটও লাগল না, ফ্রেম থেকে কেটে বের করে আনল কাঁচটা। পিছনে, ছাদের সমতল শিরদাঁড়ার ওপর আস্তে করে নামিয়ে রাখল সেটা। এবার স্টিকের বদলে হাতে বেরিয়ে এল ওয়্যার-কাটার। জালটা তিন দিকে কাটল, তারপর হাতের চাপ দিয়ে না-কাটা দিকে ভাঁজ করে দিল সবটুকু। চৌকো একটা ফাঁক দেখা গেল, ভেতরে মাথা গলিয়ে পেন্সিল টর্চ জ্বালল রানা। গরম বাতাস লাগল চোখে-মুখে।

একটা মই আশা করেছিল রানা, কিন্তু পেন্সিল টর্চের আলো যতদূর গেল তার মধ্যে কিছুই চোখে পড়ল না। জালটা একটা ফ্রেমের সাথে আটকানো, ফ্রেমের কিনারা ধরে ইচ্ছে করলে ঝুলে পড়তে পারে রানা। কিন্তু ছাদ থেকে মেঝে পঞ্চাশ ফিট নিচে, হাত ছেড়ে দিয়ে পড়লে হাড়-গোড় আস্ত থাকবে না। তাছাড়া, সরাসরি মেঝেতে পড়বে কিনা তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। নিচে সাপ আছে, সেগুলো কিভাবে রাখা হয়েছে জানা নেই ওর। সম্ভবত খাঁচার ভেতর আছে ওগুলো, কিন্তু খাঁচাগুলো কি রকম কে জানে। হয়তো পাতলা জাল দিয়ে তৈরি ঢাকনি আছে খাঁচায়। তার একটায় যদি পড়ে, জাল ছিঁড়ে কেউটে বা গোক্ষুরের ঘাড়ে পড়তে হবে।

নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল রানা। শুধু ভয় নয়, ঘৃণাও করে সে সাপকে।

নাইলন রশির গুটানো একটা বল বেরোল কোটের পকেট থেকে, কিন্তু লম্বায় এটা বিশ ফিটের বেশি হবে না। একটা প্রান্ত ধরে রেখে বলটা নিচের দিকে ফেলে দিল রানা, রশি ছাড়তে ছাড়তে সোজা নেমে গেল বল, কিছুর সাথে ঠেকল না। প্রান্তটা কাঠের ফ্রেমের সাথে শক্ত করে গিঁট দিয়ে বাঁধল ও। মসৃণ রশি, পিছলা একটা ভাব আছে, এটা ধরে নামতে শুরু করার পর ইচ্ছেমত থামতে চাইলে পারবে না। এক সেকেন্ড চিন্তা করল ও, তারপর রশিটা টেনে তুলে ফেলল। দু'আড়াই ফিট পর পর একটা করে গিঁট দিয়ে আবার নিচে নামিয়ে দিল সেটা।

ঝুলে পড়ার আগে কান পাতল রানা। যান্ত্রিক গুঞ্জন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

ঝুলে পড়তেই পিছলাতে শুরু করল রশি, মুঠোর ভেতর প্রথম গিঁটটা আটকাল না। দ্বিতীয় গিঁট মুঠোর ভেতর আসতে একটু মন্থর হলো গতি, কিন্তু পতন রোধ করা গেল না। গিঁটটা তালুর খানিকটা চামড়া রেখে দিল। পায়ে জুতো, কাজেই নিচের রশিতে আঙুল বাধাবার কোন উপায় নেই। চারটে গিঁট মুঠো থেকে ফস্কে বেরিয়ে যাবার পর ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল রানা। তালুতে যেন আগুন ধরে গেছে, যে-কোন মুহূর্তে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে রশি ছেড়ে দিতে হবে। আরেকটা গিঁট মুঠো থেকে বেরিয়ে গেল, কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটে পড়ল। ডান হাতের তালু রক্তাক্ত হয়ে গেছে। দু'সারি দাঁতের মাঝখানে ধরা পেন্সিল টর্চের গায়ে গর্ত তৈরি হচ্ছে।

মরিয়া হয়ে উঠল রানা। এভাবে নামতে থাকলে সাপের খাঁচার ওপর পড়তে হবে ওকে। রশি থেকে বাঁ হাত তুলে নিয়ে পেন্সিল টর্চ ধরল। সাত নম্বর গিঁট ঢুকল মুঠোর ভেতর, মুখ হাঁ করে শেষ এবং আট নম্বর গিঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল ও। ঠোঁটের কোণে ঘষা খেয়ে ছিঁড়ে গেল নরম চামড়া, হু হু করে জ্বালা করে উঠল জায়গাটা। ডান হাত আর দাঁতে স্থির হয়ে আছে রশি, প্রায় শেষ প্রান্ত থেকে ঝুলছে রানা।

পেন্সিল টর্চটা কয়েক জায়গায় দেবে গেছে, কাজ করলে হয়। ব্যান্ডেজ বাঁধা হাতে কোন রকমে ধরল সেটা, নিচের দিকে তাক করে বোতাম টিপল। ওর ঠিক নিচেই রয়েছে সাপের খাঁচা। যা ভয় করেছিল তাই, খাঁচার মাথায় জাল লাগানো ঢাকনি। খুদে টর্চের আলো যতদূর যায়, সার সার খাঁচা দেখা গেল। প্রতিটি খাঁচা তিন ফিট উঁচু হবে বলে আন্দাজ করল রানা, একটার ওপর আরেকটা রাখা হয়েছে। সব খাঁচাই চৌকো, বেশিরভাগ একই মাপের। শূন্যে ঝুলে থাকা রানার পা থেকে ফিট পাঁচেক নিচে দেখা গেল খাঁচাগুলোকে, তারমানে একটার ওপর একটা এভাবে ছয়টা করে খাঁচা রাখা হয়েছে। রানার ঠিক নিচের খাঁচাতে চকচকে, লম্বা, আঁকাবাঁকা একটা অস্পষ্ট আকৃতি দেখা গেল।

সার সার খাঁচার মাঝখানে সরু অনেকগুলো প্যাসেজ, প্রতিটি সরু প্যাসেজ চওড়া একটা প্যাসেজে এসে মিলেছে। রানার ডান দিকে একটা চওড়া প্যাসেজ ফিট ছয়েক দূরে। ঝুলন্ত অবস্থায় দোল খেতে শুরু করল ও।

খানিক পর রশির শেষ প্রান্ত থেকে হাত ছেড়ে দিয়ে চওড়া প্যাসেজের মেঝেতে পড়ল রানা। ঘেমে গোসল হয়ে গেছে ও। গরমে সুস্থ থাকে সাপ,

সেজন্যেই এয়ার পাম্প আর হিটিং সিস্টেমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যান্ত্রিক গুঞ্জনে রানার পতনের আওয়াজ চাপা পড়ে গেল। বত্রিশ ডিগ্রীর কম নয় টেমপারেচার, আন্দাজ করল ও।

মেঝে থেকে এক ফিট উঁচু কংক্রিটের অসংখ্য প্ল্যাটফর্ম দেখা গেল, খাঁচাগুলো ওই প্ল্যাটফর্মে রাখা হয়েছে।

প্রথমে চওড়া প্যাসেজের দু'পাশের কয়েকটা খাঁচা পরীক্ষা করল রানা। প্রতিটি খাঁচার চার কোণে চারটে করে লোহার রড, প্রতিটি রডকে ছুঁয়ে আছে ঘন করে বোনা তারের জাল। একটা রডের গায়ে টোকা দিয়ে দেখল রানা—নিরেট, টিং করে একটা আওয়াজ হলো। রডের ভেতরটা ফাঁপা বলে মনে হলো না। প্রতিটি খাঁচার গায়ে খুদে একটা করে টিনের লম্বা পাত, সাদা রঙ করা, তার ওপর লাল অক্ষরে লেখা: ডেঞ্জার, পয়জনাস স্নেকস। খাঁচার মেঝেতে টিকটিকি, তেলাপোকা, কেঁচো, চুনো মাছ ছাড়াও কিছু পোকা-মাকড় দেখা গেল—সাপের খোরাক।

সব খাঁচা একই মাপের নয়, ছোট বড় আছে। পেন্সিলের মত লিকলিকে সাপ আছে, বিশাল আকারের কিং কোবরাও আছে। মেঝেতে ফলস বটম থাকার সম্ভাবনা কম, কারণ তলার পাতলা কাঠ আধ ইঞ্চির মত পুরু হবে। তবে প্রতিটি কাঠের মেঝেতে ইঞ্চি তিনেক পুরু মাটির স্তর রয়েছে।

বিষাক্ত সাপ, কাজেই খাঁচার ভেতর হাত গলিয়ে কেউ সোনার মোহর খুঁজবে বলে মনে হয় না। তবে মাটির নিচে মোহর থাকতে পারে এই ধারণা কাস্টমস্ বা এফ. বি. আই. অফিসারদের মনে উঁকি দেয়নি, এ-কথা বিশ্বাস করা কঠিন। নিশ্চয়ই ওরা পরীক্ষা করে দেখেছে। তবু, সন্দেহ দূর করার জন্যে রানা নিজে একবার পরীক্ষা করবে।

প্রতিটি খাঁচার দরজায় তালা দেয়া রয়েছে। তালা ভাঙার সরঞ্জাম সাথে থাকলেও দরজা খুলবে না বলে ঠিক করল রানা। অনেক খাঁচায় একাধিক সাপ রয়েছে, একটা সাপ রয়েছে এরকম একটা খাঁচা বেছে নিল ও। এটা একটা জ্যামাইকান কোবরা, লম্বায় হাত দুয়েক, গায়ে কালচে সবুজ আর মেটে রঙের ডোরা। সাপটাকে অসুস্থ বলে সন্দেহ হলো রানার। পেন্সিল টর্চের আলো ফেলতেও নড়ল না, কুণ্ডলী পাকানো শরীরের ভেতর মুখ লুকিয়ে যেমন পড়েছিল তেমনি পড়ে থাকল।

দস্তানা পরল রানা। ওয়্যার-কাটার বের করে তারের জাল কাটল। লম্বা করে ইঞ্চি চারেক কাটার পর পকেট থেকে এবার আধ হাত লম্বা হাতলসহ একটা ছুরি বের করল। হাতলের গায়ে বোতাম রয়েছে, তাতে চাপ দিতেই বেরিয়ে এল ছুরির ধারাল ফলা, সে-ও প্রায় আধ হাত লম্বা।

দস্তানা পরা হাত দিয়ে সদ্য কাটা তারের জাল ফাঁক করল রানা। ধীরে ধীরে ছুরি ধরা ডান হাতটা ঢুকিয়ে দিল খাঁচার ভেতর। সাপটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ও।

পেটে আলতো একটু স্পর্শ পেয়েই গুটানো শরীরের ভেতর থেকে মাথা বের করল গোক্ষুর। ছুরির ফলাটা সবেগে সেটার ঘাড়ের ওপর নামিয়ে আনল রানা।

দু'টুকরো সাপের ধড়টা খাঁচার ভেতর ছটফট করতে লাগল। অস্থির ধড়টাকে বের করে সরু প্যাসেজের দিকে ছুঁড়ে দিল ও, তারপর ছুরির ডগা দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করল।

খাঁচার বাকি তিন দিকের জালও কাটল রানা। মেঝের সমস্ত মাটি খুঁড়ে আলগা করে ফেলল। সোনা কেন, ইঁটের একটা টুকরো পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

কপাল খারাপ? যে-সব খাঁচায় মোহর নেই, এটা তার একটা?

এভাবে সাপ মারতে যাওয়া বিপজ্জনক, মুহূর্তের ভুলে ছোবল খেতে হতে পারে। তারচেয়ে খাঁচার তলা ফুটো করা কিছুটা নিরাপদ বলে মনে হয়। ওখান থেকে সরতে যাবে রানা, তীব্র আলোয় ধাঁধিয়ে গেল চোখ। একসাথে জ্বলে উঠল একশো পাওয়ারের পঁচিশ-ত্রিশটা বালব। 'এক ইঞ্চি নড়বে না! তিন দিকে আছি আমরা!'

বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে, ডাইভ দিয়ে পাশের সরু প্যাসেজে চলে এল ও, সাথে সাথে রাইফেলের গুলি হলো। রানা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক সেখান দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেটটা, একটা খাঁচার দু'দিকের জালে একটা করে ফুটো দেখা গেল।

আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেছে, কয়েক সেকেন্ড চোখে হাত চাপা দিয়ে থাকল রানা। ইতোমধ্যে পেন্সিল টর্চটা অদৃশ্য হয়েছে, হাতে এখন ল্যুগার। গলার আওয়াজ শুনে বুঝে নিয়েছে, গেটের দিকে রয়েছে সানডাক, ওর কাছ থেকে বিশ গজ দূরে।

পরিবেশ আর পরিস্থিতির কথা ভেবে অনেক দিন পর আজ সত্যিই ভয় পেল রানা। ছয়-সাত সারি খাঁচার ভেতর থেকে ওকে হয়তো সানডাক দেখতে পাবে না, কিন্তু তিন-চার সারি খাঁচার ভেতর থেকে ঠিক দেখতে পাবে। আশপাশে নিশ্ছিদ্র কিছু নেই যে লুকাবে।

সত্যিই কি দলবল নিয়ে ভেতরে ঢুকেছে সানডাক? তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে কথাটার মানে কি?

'নোড়ো না!' খুশিতে উৎফুল্ল শোনাল সানডাকের গলা। 'তাহলে দেখে ফেলব!' রানা জানে, কথাটা মিথ্যে নয়। 'তোমাকে কষ্ট করতে হবে না, আমরাই তোমার কাছে আসছি। নিক, ফাঁদটা আমরা ছোট করছি—সুযোগ মত তুমিও আমাদের সাথে যোগ দেবে।'

সানডাকের শেষ কথাটায় অদ্ভুত একটা তাৎপর্য আছে, উপলব্ধি করলেও তাৎপর্যটা ধরতে পারল না রানা। সানডাক এমনভাবে কথাটা বলল, যেন নিক এই মুহূর্তে ওয়্যারহাউজে নেই।

বালবগুলো ভেঙে ফেলা সম্ভব নয়। ল্যুগারে আটটা গুলি আছে, পকেটে আছে স্পেয়্যার একটা ম্যাগাজিন। তাছাড়া, পঁচিশ-ত্রিশটা বালব ভাঙার সময় ওরা তাকে দেবে কেন!

অবশ্য একটা সুবিধে রানাও পাবে। মাথা একটু উঁচু করে পিছন দিকে তাকাতেই ডান চোখের কোণে ক্ষীণ একটু নড়াচড়া ধরা পড়ল। তিন সারি খাঁচার ছয়টা জালের ফাঁক দিয়ে লোকটার অস্পষ্ট কাঠামো দেখতে পেল ও। অস্পষ্ট,

কিন্তু আকৃতিটা পরিষ্কার চেনা গেল।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল রানার মাথায়।

সব কিছু এখন নির্ভর করছে অব্যর্থ লক্ষ্যের ওপর। একটু এদিক ওদিক হলে প্ল্যানটা কাজে লাগবে না।

আন্দাজ করল, অন্তত দু'জন লোক নিয়ে ভেতরে ঢুকেছে সানডাক। নিজে ঢুকেছে সামনের গেট দিয়ে, আরেকজন নিশ্চয়ই পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকেছে, কিন্তু তৃতীয় লোকটা?

তৃতীয় লোকটার কথা আপাতত ভুলে থাকার চেষ্টা করল রানা। সানডাককে দেখা যাচ্ছে না, কাজেই সে-ও ওকে দেখতে পাচ্ছে না। এখন যদি প্ল্যাটফর্মের ওপর মাথা তোলে ও, পিছনের লোকটা ওকে দেখতে পাবে। দেখা দেয়ায় বিপদ আছে, সাথে সাথে গুলি করতে পারে লোকটা। কিন্তু ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই। তৈরি হয়ে নিল রানা, তারপর প্ল্যাটফর্মের কিনারা পর্যন্ত হামাগুড়ি দিয়ে এসে ধীরে ধীরে মাথা তুলল। সরু আরেকটা প্যাসেজের মুখে চলে এসেছে রানা, উঁকি দিয়ে লোকটার দিকে তাকাল।

রানা দেখা দেবে এই আশায় অপেক্ষা করছিল লোকটা। তিন সারি খাঁচার পিছনে রয়েছে সে, অকস্মাৎ সরু প্যাসেজে বেরিয়ে এসে রাইফেল তুলল। কিন্তু ট্রিগার টেনে ধরার আগেই বিস্ফারিত হয়ে গেল তার চোখ। ব্যাপারটা কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে এক সেকেন্ড সময় নিল। ইতোমধ্যে দু'জনের মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছে গেছে রানার ছুঁড়ে দেয়া সাপটা। মরা সাপ, কিন্তু লোকটার তা জানার কথা নয়। চাবুকের মত সপাং করে বাড়ি খেল সাপটা তার গলায়। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল সে, লাফ দিল পিছন দিকে। বুকে গুলি খেয়ে গতি বেড়ে গেল, পিছনের খাঁচার গায়ে সজোরে ধাক্কা খেলো সে, তারপর হুড়মুড় করে পড়ে গেল। সাপটা তখনও লাশের গলায় পেঁচিয়ে রয়েছে।

ল্যুগার থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, লোকটার দিকে পিছন ফিরল রানা। লম্বা, সরু প্যাসেজের শেষ মাথা থেকে বেরিয়ে এল রাইফেলের লম্বা একটা ব্যারেল। ডাইভ দিয়ে আবার ডান দিকের সরু প্যাসেজে পড়ল রানা। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মত শোনাল রাইফেলের আওয়াজ, বাঁ পায়ের জুতোর গোড়ালি থেকে খানিকটা চামড়া তুলে নিয়ে গেল বুলেটটা।

'নিক! আসছ না কেন!' হুঙ্কার ছাড়ল সানডাক।

দ্রুত চিন্তা করছে রানা। কোত্থেকে আসবে নিক? সানডাক যেন বাইরে থেকে ভেতরে আসতে বলছে তাকে। কোথায় সে?

হঠাৎই বিদ্যুৎ চমকের মত ব্যাপারটা ধরা পড়ল। ওপর দিকে মুখ তুলতেই লোকটাকে দেখতে পেল রানা। ওয়্যারহাউজের বাইরেই রয়েছে নিক, ছাদে। ভেন্টিলেটর গলে নিচের দিকে ঝুলে পড়ার পাঁয়তারা করছে সে। ওর নাইলন রশি ধরে নিচে নামতে চাইছে।

টুঁ-শব্দ না করে অপেক্ষায় থাকল রানা।

রশি ধরে ঝুলে পড়ল নিক। তাকে কাভার দেয়ার জন্যে এলোপাতাড়ি গুলি

করতে করতে এগোতে শুরু করল সানডাক।

প্ল্যাটফর্ম ঘেঁষে প্যাসেজে শুয়ে রয়েছে রানা, ওকে দেখতে না পেলে একটা গুলিও লাগাতে পারবে না সানডাক। গিঁটগুলোয় না থেমে সড়সড় করে নেমে এল নিক। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা করল, অন্তত একটা গিঁট মুঠোর ভেতর আটকাতে পারবে, ফলে খাঁচা থেকে দূরে লাফিয়ে পড়ার কথা ভাবল না। রশির শেষ প্রান্ত থেকে খসে পড়ল সে। সোজা নেমে এসে একটা খাঁচার কিনারা ঘেঁষে পড়ল, চকচকে রডের মাথায়।

পুরোপুরি জালের ওপর পড়েনি, জাল তাই ছিঁড়ল না। তবে রডের ওপর শিরদাঁড়া দিয়ে পড়েছে। খাঁচার কিনারায় এক সেকেন্ড স্থির হয়ে থাকল সে, তারপর খাঁচা সহ নেমে এল মেঝেতে।

এবার রানার আতঙ্কিত হবার পালা। নিমেষের জন্যে লক্ষ করল ও, রডটা বেঁকে গেছে। বিস্মিত হবার অবসর মিলল না, বাঁকা রডের পাশ দিয়ে, ছেঁড়া জাল গলে, বেরিয়ে এল ফণা তোলা একটা আফ্রিকান মাম্বা। কালো মোটা রডের মত শরীর, নকশা করা ফণা। মাথা তুলল নিক, ভাঙা কোমরের ব্যথায় গোঙাচ্ছে, চোখে আতঙ্ক আর অবিশ্বাস নিয়ে দেখল বিশাল একটা ফণা এ-পাশ ও-পাশ দুলছে তার মুখের সামনে।

ছোবল দিয়েই বিদ্যুৎগতিতে রানার দিকে ফিরল বিষধর সাপটা। তিনটে চোখ স্থির হয়ে আছে ওটার দিকে। এক সেকেন্ড ইতস্তত করল সর্পরাজ। চামড়ার চোখ জোড়ার সাথে পরিচয় আছে তার, জানে ওগুলো কোন অস্ত্র নয়। কিন্তু ল্যুগারের কালো মাজ্‌ল্ তাকে দোটানায় ফেলে দিল। হঠাৎই ফণা গুটিয়ে নিয়ে নিচু হলো সে, মেঝেতে লম্বা হয়ে সড়সড় করে আরেক দিকে এগোল।

পরমুহূর্তে একই সাথে গর্জে উঠল রাইফেল আর পিস্তল।

হাতটা লম্বা করে দিয়ে মাম্বাকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টানল রানা। প্যাসেজের কোণ থেকে বেরিয়ে আসা ল্যুগারের মাজ্‌ল্ লক্ষ্য করে রাইফেল চালাল সানডাক।

দু'জনেই লক্ষ্য ভেদ করল। মাম্বার মাথা থেঁতলে গেল, এবং রানার হাত থেকে ল্যুগারটা ছোঁ দিয়ে নিয়ে গেল বুলেট।

নিরস্ত্র রানা উফ্ করে কাতরে উঠল। দ্রুত পিছাতে পিছাতে সরু প্যাসেজের শেষ মাথায়, আরেক প্যাসেজের কোণে চলে এল ও। ছুটল সানডাক, রানার মতলব টের পেয়ে গেছে সে।

প্ল্যাটফর্মের ওপর মাথা তোলার সাহস নেই রানার। ক্রল করে এগোতে হচ্ছে ওকে। টের পেল, গলায় সাপ জড়ানো লোকটার কাছে সানডাকই আগে পৌঁছবে। হতাশ হয়ে আবার পিছিয়ে আসতে শুরু করল ও। এমন কি দু'জন একসাথে পৌঁছলেও লাভ নেই। লোকটার রাইফেল হাতে পাবার আগেই সানডাক ওকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দেবে।

পিছাতে শুরু করেও শেষ রক্ষা করা গেল না, গলায় সাপ নিয়ে লোকটা যে প্যাসেজের মুখে পড়ে আছে, তার সামনের প্যাসেজ থেকে বেরোল সানডাক। রানা আর তার মাঝখানে মাত্র দু'সারি খাঁচা। রানার পা দুটো প্যাসেজের কোণে

অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে দেখে তাড়াহুড়ো করে রাইফেল তুলেই গুলি করল সানডাক।

আর্তনাদ করে উঠল রানা।

বিজয়ের উল্লাসে পৈশাচিক অট্টহাসি বেরিয়ে এল সানডাকের গলা থেকে। 'ভয় পেয়ো না, বাছাধন। গুলি করলাম আর পটল তুললে সেটি হচ্ছে না। তোমাকে আমি খেলিয়ে মারব।'

ঠোঁটে নিষ্ঠুর হাসি নিয়ে দু'সারি খাঁচাকে পাশ কাটাল সে। কিন্তু প্যাসেজের মুখে এসে হতভম্ব হয়ে গেল।

প্যাসেজে কয়েক ফোঁটা রক্তের দাগ রয়েছে, কিন্তু রানা নেই। প্যাসেজের শেষ মাথায় নিকের লাশ দেখা গেল। সানডাকের চেহারায় সবজান্তার একটা ভাব ফুটে উঠল, সেই সাথে সতর্ক হয়ে উঠল দৃষ্টি। নিক যেমন পড়েছিল তেমনি পড়ে আছে, কিন্তু হলপ করে বলতে পারে সানডাক, ওর পকেটে পিস্তলটা নেই।

'রানা?'

চওড়া প্যাসেজের কোথাও থেকে অস্ফুট, কাতর একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল।

'আমি জানি, নিকের পিস্তলটা এখন তোমার হাতে,' বলল সানডাক। 'ভাল চাও তো ফেলে দাও ওটা। তা না হলে আমি গ্রেনেড ছুঁড়ব।'

পিস্তলের আওয়াজ হলো, একটা খাঁচা ভেদ করে বেরিয়ে গেল পরপর দুটো বুলেট।

ক্রল করে নিকের কাছে চলে এল সানডাক। প্যাসেজের কোণ দিয়ে রাইফেলের ব্যারেলটা বাড়িয়ে দিল। আবার গুলি করল রানা। নিকের পিস্তলে আর চারটে গুলি থাকল।

চাপা গলায় খিক খিক করে হাসল সানডাক। 'হাঁদারাম,' বিড়বিড় করে বলল সে। রানা বোকার মত গুলি খরচ করছে দেখে পুলকিত হবারই কথা তার।

'তুমি আসবে আমরা জানতাম,' এবার গলা চড়িয়ে বলল সানডাক। 'সব রকম প্রস্তুতি নেয়া আছে।'

আবার দুটো গুলি করল রানা।

'তুমি নার্ভাস হয়ে পড়েছ,' বলল সানডাক। 'পিস্তল ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এসো, কথা দিচ্ছি গুলি করব না।'

মুখ খুলে হাঁপাচ্ছে রানা, ওর নিঃশ্বাসের আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেল সানডাক। প্যাসেজের কোণ থেকে উঁকি দিতে গেল সে, কিন্তু পিস্তলের গুলি হতেই সরিয়ে নিল মাথা।

'পিস্তলে আর একটা গুলি আছে,' বলল সানডাক। 'তারপর কি করবে?'

'কুত্তার বাচ্চা!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রানা। ব্যথায় কাতর একটা আওয়াজ করল। 'কাপুরুষের মত পায়ের গোড়ালি ভেঙে দিয়েছিস, তা না হলে…'

হো হো করে হেসে উঠল সানডাক। তারপর বলল, 'মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে না এলে গোড়ালি, হাঁটু, কনুই সব একটা একটা করে ভাঙব। লক্ষ্মী ছেলের মত ছুঁড়ে দাও পিস্তলটা…'

'মাগো!'

'আসছ?'

'শোনো, মি. ওয়াইজের সাথে কথা বলতে চাই আমি,' বলল রানা।

'বেশ তো, ভাল কথা,' প্রস্তাবটা মেনে নিয়ে বলল সানডাক, গালভরা হাসিতে কুৎসিত চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার। 'খবরদার, কোন রকম চালাকি করতে যেয়ো না।'

নিকের পিস্তলটা প্যাসেজের মুখে ছুঁড়ে দিল রানা।

প্যাসেজের কোণ থেকে বেরিয়ে এল সানডাকের হাত, পিস্তলটা তুলে নিয়ে পকেটে ভরল সে। সিধে হয়ে দাঁড়াল, বেরিয়ে এল ফাঁকা জায়গায়।

সানডাকের সামনে, চওড়া প্যাসেজে পনেরো ফিট দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। ধীরে ধীরে এগোল ও, ডান পা ঠিকমত মেঝেতে ফেলতে পারছে না। হাত দুটো কাঁধের কাছে তুলে রেখেছে ও। পাঁচ ফিট এগিয়ে থামল।

সতর্কতার সাথে, একটু একটু করে ওর দিকে এগোল সানডাক, রাইফেলটা ওর বুকের দিকে তাক করা। হঠাৎ রাইফেলের ব্যারেলটা নাড়ল সানডাক, বলল, 'হাত আরও ওপরে তোলো।'

হাত দুটো আরও একটু ওপরে তুলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আবার এগোতে শুরু করল রানা, বাধা দিল সানডাক।

ক্রূর হাসি ফুটল তার মুখে। 'দুঃখিত, রানা। মি. ওয়াইজের সাথে দেখা হবে না তোমার।'

চেহারায় অবিশ্বাস আর আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে থাকল রানা। 'কিন্তু তুমি যে বললে...'

'বসের নির্দেশ, সেন্ট পিটার্সবার্গেই তোমাকে কবর দিতে হবে,' বলল সানডাক, ট্রিগার ধরে থাকা তার আঙুলের ডগা সাদা হয়ে উঠল। 'বুলেটটা কোথায় চাও, দোস্ত?'

আর এক সেকেন্ডও বাকি নেই, বুঝতে পেরে ডান হাতের মুঠো খুলে দিল রানা।

ঝন ঝন শব্দে মেঝেতে পড়ল মুঠোভর্তি সোনার মোহর। রানার জুতোয় লেগে গড়াতে শুরু করল কয়েকটা। খুদে চাকার মত গড়িয়ে কাছে চলে আসছে ওগুলো, মুহূর্তের জন্যে সেদিকে তাকাল সানডাক।

এই একটা মুহূর্তই দরকার ছিল রানার। মুঠো আলগা করেই কোটের পকেটে হাত ভরে দিয়েছিল ও, পকেট থেকে বের না করেই ট্রিগার টেনে দিল ল্যুগারের।

বুকের ঠিক মাঝখানে একটা ধাক্কা খেলো সানডাক, তার বসন্তের দাগে ভরা মুখটা যন্ত্রণায় কুঁচকে উঠল। বুকের বাঁ দিকে, হার্টের ওপর আরেকটা ধাক্কা খাবার আগে হিসেবের ভুলটা ধরতে পারল সে। মারা যাবার আগে বুঝল, শুধু নিকের নয়, নিজের পিস্তলটাও কুড়িয়ে নিয়েছিল রানা।

সোনার মোহরগুলো এক এক করে কুড়িয়ে পকেটে ভরল রানা। গেটের কাছে এসে দেখল তালা খোলা, কবাট দুটো ভেড়ানো রয়েছে। বেরোবার আগে পিছন

দিকে একবার তাকাল ও। বাঁকা রড সহ খালি খাঁচাটা ওর হাতে রয়েছে। রড না বলে ফাঁপা পাইপ বলা উচিত ওটাকে। প্রতিটি পাইপ এমনভাবে রঙ করা, দেখে লোহার তৈরি রড বলে মনে হয়।

ওরা তিনজন ছাড়াও কবীর চৌধুরীর আরও লোক আছে সেন্ট পিটার্সবার্গে, পিছন দিকে ফিরে ভাবল রানা। কাল সকালে এসে লাশগুলো পাবে তারা। পুলিসও খবর পেয়ে ছুটে আসবে। ওর ল্যুগারের বুলেট পাবে পুলিস। কিন্তু স্বর্ণমুদ্রা রহস্য সম্পর্কে কিছুই জানতে পারবে না কেউ। এখানে এক হাজারের ওপর খাঁচা রয়েছে, তার মধ্যে থেকে একটা খোয়া গেলে কারও চোখে পড়ার কথা নয়।

গুমোর ফাঁস হয়ে গেছে, কিন্তু ব্যাপারটা আপাতত চেপে রাখতে চায় রানা। জ্যামাইকায় গিয়ে কতটুকু কি করতে পারবে কিছুই জানে না। ওখানে গিয়ে যদি সুবিধে করতে না পারে, আল-আমিনকে আবার এখানে আসতে দেবে ও। এখনই যদি সেন্ট পিটার্সবার্গে ওয়্যারহাউজ পুলিস বা এফ.বি.আই.-এর দখলে চলে যায়, কবীর চৌধুরী সাবধান হয়ে যাবে। হয়তো কিউবা থেকে তখন জ্যামাইকাতে আসতেও সাহস পাবে না সে।

কিন্তু রানা তাকে পেতে চায় জ্যামাইকায়।

তিন

ট্রাউজারের ডান পকেটটা ফুলে আছে সোনার মোহরে, হাঁটার সময় ঝন ঝন করে আওয়াজ করছে। ওয়্যারহাউজে নামার সময় রশির ঘষা খেয়ে ঠোঁটের কোণ থেকে বেশ খানিকটা চামড়া উঠে গেছে, জ্বালা করছে এখনও। আহত জায়গাটা মুখের ভেতর পুরে চুষতেই খানিকটা রক্ত বেরোল, থো করে থুথু ফেলল রানা। কব্জি বাঁকা করে চোখের সামনে তুলল ও, ঘণ্টার কাঁটা দুই আর মিনিটের কাঁটা বারোর ঘর ছুঁয়ে আছে। রাস্তা থেকে কয়েকটা পাথর কুড়িয়ে নিল। সাগরের কিনারায় এসে খাঁচার ভেতর পাথরগুলো ভরে, পানিতে ফেলে দিল খাঁচাটা।

গাড়ি নিয়ে বন্দর এলাকা ছেড়ে এল রানা। শহর ছাড়িয়ে একচল্লিশ নম্বর স্ট্রীট অর্থাৎ হাইওয়ে ধরে টামপার দিকে ছুটল। রাস্তার দু'পাশে সার সার মোটেল, ট্রেইলর ক্যাম্প, আর হোটেল-রেস্তোরাঁ। মাইল তিনেক এগিয়ে নাইট হেভেন রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড বারের সামনে গাড়ি থামাল ও। বারম্যানকে হুইস্কি দিতে বলে ওয়াশরূমে ঢুকে হাত-মুখ ধুলো ভাল করে। বাঁ হাতের ব্যান্ডেজটা নোংরা হয়ে গেছে, ব্যথায় দপ দপ করছে আঙুলটা। সম্ভবত রশি বেয়ে ওয়্যারহাউজে নামার সময় স্প্লিন্টটা ভেঙে গেছে। এই মুহূর্তে কিছুই করার নেই ওর। উত্তেজনা আর অনিদ্রায় লাল হয়ে আছে চোখ দুটো। সাথে পেইনকিলার ট্যাবলেট নেই, দু'ঢোক হুইস্কি খেয়ে একটু যদি আরাম পাওয়া যায়। বারে ফিরে এসে গ্লাসটা খালি করল ও, তারপর আবার অর্ডার দিল। সদ্য জাহাজ থেকে নামা কয়েকজন নাবিক ছাড়া

আর কোন খদ্দের নেই। বারম্যান গল্প জমাবার চেষ্টা করলেও উৎসাহ দেখাল না রানা। নানা চিন্তায় ভারী হয়ে আছে মাথাটা। গিলটি মিয়ার জন্যে মন খারাপ। এফ.বি.আই. হসপিটালে নিরাপদেই থাকবে সে, তবু খারাপ লাগছে এই কথা ভেবে যে একা ফেলে রেখে চলে যেতে হচ্ছে ওকে।

ধরা যাক, একটা হিসেব করার চেষ্টা করল রানা, কম করেও এক হাজার খাঁচা রয়েছে ওয়্যারহাউজে। তারমানে চার হাজার পাইপ। প্রতিটি পাইপে গড়ে যদি একশো করে মোহর থাকে, খাঁচা প্রতি চারশো মোহর। এক হাজার খাঁচায় চার হাজার পাইপ, চার হাজার পাইপে চার লাখ মোহর। প্রতিটি মোহর এক ভরি, দাম ধরা যাক একশো ষাট ডলার। হিসেব করতে গিয়ে গলা শুকিয়ে গেল রানার। ছয় কোটি চল্লিশ লাখ ডলারের সোনা রয়েছে কবীর চৌধুরীর ওয়্যারহাউজে। ডলার প্রতি যদি বত্রিশ টাকা ধরা হয়; চার লাখ মোহরের দাম দাঁড়ায় দুশো চার কোটি আশি লাখ টাকা।

কয়েক মাস ধরে মোহরগুলো আনছে কবীর চৌধুরী। যেখান থেকেই আনুক, সেখানে নিশ্চয়ই আরও অনেক মোহর আছে। মোহরের সেই উৎসটা যেভাবেই হোক আবিষ্কার করতে হবে।

পেটে হুইস্কি পড়ায় আঙুলের ব্যথা কমেছে, বিল মিটিয়ে দিয়ে বার থেকে বেরিয়ে এল রানা। গাড়ি নিয়ে আবার গ্যান্ডি ব্রিজ পেরোল, বাঁক নিল এয়ারপোর্টের দিকে। পথে প্রথম যে মোটেলটা খোলা দেখল সেখানেই থামল ও।

মোটেলের মালিক প্রৌঢ় এক দম্পতি, অফিস রুমে বসে রেডিও কিউবার যন্ত্র-সঙ্গীত শুনছিল। রানা বলতে চেষ্টা করল: বিদেশী, দূর পথের যাত্রী, কোথাও না থেমে গন্তব্যে পৌঁছতে চেয়েছিল, কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—কিন্তু এসব বানানো গল্প শোনার কোন আগ্রহ দেখা গেল না তাদের মধ্যে। সকালে রানা ভাড়া না দিয়ে ভেগে যাবে সন্দেহ করে পঞ্চাশ ডলার চেয়ে নিল। আট নম্বর কামরা পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে এল রানা, প্রৌঢ় তালা খুলে দিয়ে আলো জ্বালল। ঘরে ডাবল বেড, সংলগ্ন বাথরুম, একটা চেস্ট-অভ-ড্রয়ার, দুটো চেয়ার। সুটকেস নামিয়ে প্রৌঢ়কে শুভরাত্রি জানাল রানা, বন্ধ করে দিল দরজা। কাপড়চোপড় সব খুলে রেখে বাথরুমে ঢুকল ও। শাওয়ার সেরে, দাড়ি কামিয়ে বিছানায় উঠল। এবং প্রায় সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়ল।

দুপুরে ঘুম ভাঙল। রাস্তা পেরিয়ে ছোট একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে লাঞ্চ সারল। মোটেলে নিজের কামরায় ফিরে এসে বিশদ একটা রিপোর্ট লিখল ও। মোহরগুলো কোথায় রাখা হয়েছে সে-সম্পর্কে কিছু লিখল না। এরপর বি.সি.আই. ঢাকা হেডকোয়ার্টারে পাঠাবার জন্যে একটা মেসেজ লিখল ও। রাহাত খানকে অনুরোধ করল, গুপ্তধন উদ্ধার করার আগেই তিনি যেন সংশ্লিষ্ট ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সাথে একটা চুক্তিতে আসার চেষ্টা করেন।

প্লেন ছাড়তে আর কয়েক মিনিট বাকি, এই সময় এয়ারপোর্টে পৌঁছল রানা। পার্কিং স্পেসে গিলটি মিয়ার ভাড়া করা গাড়িটা রেখে টার্মিন্যালে ঢুকল ও। এফ. বি. আই.-কে লেখা রিপোর্টে জানিয়ে দিয়েছে, কোথায় পাওয়া যাবে গাড়িটাকে।

টার্মিন্যালের ভেতর বইয়ের দোকানের সামনে রেনকোট পরা এক লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আপনমনে হাসল রানা—রিপোর্টে গাড়ির কথা না লিখলেও চলত। ইতোমধ্যে ওর জানা হয়ে গেছে, রেনকোট আসলে এফ. বি. আই.-এর ট্রেড মার্কের মত। সন্দেহ নেই, ওরা নিশ্চিতভাবে জানতে চায় আপদটা সত্যি সত্যি দূর হলো কিনা। এফ. বি. আই. যে ওর উপস্থিতিতে উদ্বিগ্ন বোধ করবে তাতে আর আশ্চর্য কি। আমেরিকার যেখানেই গেছে ও, পিছনে লাশ রেখে এসেছে। প্লেনে চড়ার আগে এফ. বি. আই. হসপিটালে ফোন করল রানা। মনে হলো, না করলেই ভাল হত। ভাল কোন খবর নেই, এখনও জ্ঞান ফেরেনি গিলটি মিয়ার। হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবে কিছু জানা গেলে সাথে সাথে রানাকে ওরা খবর দেবে।

পাঁচটার সময় টামপা বে-কে একবার চক্কর দিয়ে পুব দিকে যাত্রা করল প্লেন। দিগন্ত ছুঁই ছুঁই করছে সূর্য। শহর ছাড়িয়ে আসার পর নিচে দেখা গেল জলা, ফাঁকা মাঠ, আর জঙ্গল। বিশাল এলাকা, অথচ কোথাও কোন জনবসতি নেই। আমাদের দেশটা খুব ছোট, মনে একটা খেদ নিয়ে ভাবল রানা। জায়গার তুলনায় লোকসংখ্যা অনেক আগেই বেশি হয়ে গেছে। জমি নেই, কাজ নেই, শিল্প নেই, সম্পদ নেই, ব্যবসা নেই, বাণিজ্য নেই—তবু ঘরে ঘরে নতুন মুখ আসছে তো আসছেই। শেষ পর্যন্ত আমরা কি তবে নিজেদের মাংস নিজেরাই ছিঁড়ে খাব?

দেশের কথা বেশিক্ষণ একটানা ভাবতে পারে না রানা, মাথা ধরে যায়। বাংলাদেশের সারা গা যেন পচা ঘায়ে ভরে গেছে একজন সার্জেন দরকার, অপারেশন লাগবে। সেই সার্জেনের জন্যে প্রতীক্ষা আর প্রার্থনা ছাড়া কারই বা কি করার আছে!

মায়ামির ওপর চলে এল প্লেন, নিচে নিওন-লাইট গিজগিজ করছে। নাসাউ-এ কিছুক্ষণ যাত্রাবিরতি, তারপর কিউবার ওপর দিয়ে উড়ে যাবে ওরা। কবীর চৌধুরী, বিশেষ করে শিরিনের কথা মনে পড়ল রানার। হয়তো শিরিনকে যেখানে আটকে রাখা হয়েছে ঠিক তারই ওপর দিয়ে উড়ে যাবে প্লেনটা। প্লেনের আওয়াজ শুনতে পাবে শিরিন, সম্ভবত তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে বলে দেবে খুব কাছাকাছি চলে এসেছে রানা।

কে জানে, শিরিনের সাথে আর কখনও দেখা হবে কিনা। রানা উপলব্ধি করল, আকর্ষণটা সুন্দরী বলে নয়। দুঃখিনী একটা মেয়ে, মনটা ভাল। তাকে উদ্ধার করার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করবে ও।

নাসাউ দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী দ্বীপগুলোর একটা। ক্যাসিনোগুলোর টেবিলে পাঁচ ঘণ্টায় কয়েক মিলিয়ন ডলার হাতবদল হয়। রাতে বা দিনে যে-কোন সময় সৈকতে বিবস্ত্র তরুণীদের সাঁতার কাটতে দেখা যায়। বাংলোগুলো ছবির মত সুন্দর।

নাসাউ-এ মাত্র আধ ঘণ্টার যাত্রাবিরতি। পনেরো হাজার ফিট ওপর দিয়ে কিউবা পেরিয়ে এল প্লেন। তারপরই একটা ঝড়ের মুখে পড়ল। বাতাসের ধাক্কায় বারবার কাত হলো প্লেন, গড আর তার পুত্র যীশুকে ডাকাডাকি শুরু করে দিল বিমান আরোহীরা। রানার মনে পড়ল কোরান শরীফের একটা পংক্তি, বাংলা

করলে দাঁড়ায়: 'যখন তোমরা উত্তাল সমুদ্রে ঝড়ের কবলে পড়ো, তখন কাকে ডাকো, কে তোমাদের সাহায্য করে?' হাহ্-হা, হাসল রানা। সত্যিই কি তুমি সাহায্য করো, প্রভু? যারা ডুবে যায় তাদের করো না কেন? ডাকে তো সবাই। বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে ঝাপসা হয়ে গেল জানালার কাঁচ, প্যান্ট্রি থেকে থালা-বাসন ভাঙার আওয়াজ ভেসে এল। নিজের অজান্তেই বাঁ হাত দিয়ে চেয়ারের হাতল চেপে ধরল রানা, উফ্ করে উঠল ব্যথায়।

মৃত্যুর কথা ভাবছে রানা। জন্মের পরমুহূর্ত থেকেই মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছ তুমি। কাজেই ব্যাপারটাকে সহজভাবে নিতে হবে। একটা সিগারেট ধরিয়ে আয়েশ করে টান দাও, এই ভেবে কৃতজ্ঞবোধ করো যে এখনও তুমি বেঁচে আছ। অনেকদিন তো বাঁচলে, আজ হঠাৎ মারা গেলে দুঃখ কি? সত্যি বটে, অনেক কাজ বাকি আছে। কিন্তু তোমার অসমাপ্ত কাজ করার জন্যে আরও লোক থাকবে দুনিয়ায়। কত রানা এল, কত রানা গেল। কারও অভাবে আসলে কিচ্ছু ক্ষতি হয় না কারও।

বেশ, আজ হঠাৎ মরে গেলাম, তারপর?

সৃষ্টি অর্থহীন, এ-কথা বিশ্বাস করতে চায় না রানা। কিন্তু মানুষের জন্ম যদি অর্থপূর্ণ হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তার একটা গন্তব্যও থাকা উচিত। জন্মালাম, কিছুদিন দুঃখ-সুখ ভোগ করে মরে গেলাম, ব্যস? নাহ্, মনে হয় আরও কিছু মানে থাকা উচিত ছিল।

এ শুধুই নিজের সাথে নিজের আলাপচারিতা। কোনও সমাধান পায়নি কোনদিন, জানে আজও পাবে না। কল্পনার লাগাম ছেড়ে দিয়ে মাঝে মধ্যে অনেক দূর চলে যায় রানা। জানে, বিশ্বাসের দাড়ি ধরে ঝুলে পড়তে পারলেই শান্তি। কিন্তু এ শান্তি কি ওর কপালে আছে? শুনেছে, খোদা না চাইলে মানুষের মনে বিশ্বাস আসতে পারে না। কোনদিন চাইবেন কি তিনি? ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে বাড়াবাড়ি একদম পছন্দ নয় ওর। কিছু লোক আছে বটে, ধর্মের নামে ব্যবসা ফেঁদে বসেছে, পর্দার নামে মেয়েদের বন্দী করতে চায় তারা ঘরের কোণে, ইসলামের নামে অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর আঘাত হানতে চায়, আর সবাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। এ-ধরনের গোঁড়ারা যুগে যুগে দেশে দেশে মাথাচাড়া দেয়ার চেষ্টা করেছে। লক্ষণ দেখে বোঝা যায়, বাংলাদেশেও ওরা ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে। দেশটাকে চোদ্দশো বছর পিছিয়ে দিতে চায় তারা।

যে-কোন মূল্যে ওদের রুখতে হবে।

হঠাৎ আপনমনে হাসতে লাগল রানা। টেরও পায়নি কখন থেমে গেছে ঝড়, পালিসাডোজ এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করতে যাচ্ছে প্লেন।

ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের একজন এজেন্ট, লংফেলো, অপেক্ষা করছিল রানার জন্যে। বি.সি.আই. হেডকোয়ার্টার ঢাকা থেকে লন্ডনের সাথে যোগাযোগ করে রাহাত খান, তাঁর অনুরোধে জ্যামাইকায় রানার সাথে সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস। হাসি-খুশি, রসিক, বয়স্ক লোক লংফেলো, তার উপস্থিতিতে রানাকে কাস্টমস্, ইমিগ্রেশন, আর ফাইন্যান্স কন্ট্রোলে কোন রক

ঝামেলায় পড়তে হলো না।

রাত প্রায় এগারোটা, বাতাস নেই, বেশ গরমও পড়েছে। এয়ারপোর্ট রোডের দু'পাশ থেকে ঝিঁঝি ডাকছে। একটা পিকআপে চড়ে ব্লু মাউন্টেনের দিকে যাচ্ছে ওরা। আপাতত লংফেলোর বাড়িতে যাচ্ছে।

বাড়িটা জাংশন রোডে, স্টোনি হিলের নিচে। বাইরে সাদা, ভেতরটা ঝকঝকে পরিষ্কার। বাঁ হাতের কথা ভেবে লংফেলোর সাদা হুইস্কির গ্লাসটা নিল রানা, কিন্তু খেলো মাত্র দু'ঢোক। বারান্দায় দুটো ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসল ওরা। কেসটা সম্পর্কে মোটামুটি জানে লংফেলো। গল্পের জ্যামাইকা অংশটুকু রানাকে বলতে শুরু করল সে।

আইল অভ সারপ্রাইজে গুপ্তধন আছে, এটা একটা পুরানো গুজব। ব্লাডি মরগ্যান সম্পর্কে যা কিছু জানা গেছে তা থেকে মনে হয় গুজবটা ভিত্তিহীন না-ও হতে পারে।

খুদে দ্বীপটা শার্ক বে-র ঠিক একেবারে মাঝখানে। জাংশন রোডের শেষ মাথায় ছোট্ট একটা হারবার। এই জাংশন রোড কিংস্টন থেকে বেরিয়ে জ্যামাইকার সরু কোমর ধরে আরেক প্রান্তে, উত্তর উপকূল পর্যন্ত চলে গেছে।

দস্যু চূড়ামণি ব্লাডি মরগ্যান শার্ক বে-তে তার হেডকোয়ার্টার বসিয়েছিল। দ্বীপের সম্পূর্ণ চওড়া দিকটা পোর্ট রয়্যাল-এর গভর্নর আর নিজের দখলে রাখতে চেয়েছিল সে, তাহলে কারও চোখে ধরা না পড়ে জ্যামাইকার জলসীমায় আসা-যাওয়া করা তার জন্যে ভারি সুবিধে হয়ে যায়। তার এই ইচ্ছেয় গভর্নর বাদ সাধেনি। তখনকার ব্রিটিশ রাজতন্ত্র চেয়েছিল, স্প্যানিয়ার্ডরা যত দিন না ক্যারিবিয়ান থেকে উৎখাত হয় ততদিন তারা ব্লাডি মরগ্যানের অপকর্ম চোখ বুজে সহ্য করে যাবে।

বেশ অনেকদিন বিনা বাধায় জলদস্যুতা চালিয়ে গেল মরগ্যান। তার উপস্থিতিতে স্প্যানিয়ার্ডরা টিকতে পারল না। এই সাফল্যের জন্যে ব্রিটিশ রাজ তাকে নাইট খেতাবে ভূষিত করল। শুধু তাই নয়, জ্যামাইকার গভর্নরও বানানো হলো তাকে।

ভক্ষক রক্ষক হবার আগে, অর্থাৎ জলদস্যু থাকার সময়, শার্ক বে-র আশপাশে তিনটে বাড়ি বানিয়েছিল মরগ্যান। বাড়ি তিনটের নাম—মরগ্যান'স, ডক্টর'স, এবং লেডি'স। ওগুলোর ধ্বংসাবশেষ থেকে এখনও মাঝে মধ্যে দু'একটা সোনার মোহর পাওয়া যায়।

তার জাহাজ সব সময় শার্ক বে-তে নোঙর ফেলত। পরিষ্কার করার জন্যে আইল অভ সারপ্রাইজে কাত করা হত জাহাজগুলো, যেদিকে সরাসরি বাতাসের ধাক্কা লাগত না। আইল অভ সারপ্রাইজ বে-র মাঝখানে খাড়াভাবে মাথা তুলে আছে, কোরাল আর লাইমস্টোনের বিশাল একটা স্তম্ভ। খুদে দ্বীপটাকে ঘিরে রেখেছে এক একর চওড়া সবুজ জঙ্গলের একটা বেড়।

ষোলোশো তিরাশিতে মরগ্যানের ভাগ্যে বিপর্যয় নেমে এল। নজরবন্দী অবস্থায় শেষবারের মত জ্যামাইকা ত্যাগ করল সে। তার সমপর্যায়ের কর্তাব্যক্তিরা

অভিযোগ করল, মরগ্যান রাজতন্ত্রের অবমাননা করেছে।

জ্যামাইকার কোথাও পড়ে থাকল লুঠ করা অগাধ ধন-সম্পদ, সে-সবের হদিস কাউকে না দিয়ে মারা গেল মরগ্যান। তার গুপ্তধন যে বিশাল, এ-ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে বহু জনপদে লুঠতরাজ চালিয়েছে সে, দখল করেছে অসংখ্য ট্রেজার-শিপ। কিন্তু সবই কোন সূত্র না রেখে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হয়তো আইল অভ সারপ্রাইজেই আছে রহস্যের চাবিকাঠি। কিন্তু তিনশো বছর ধরে পানিতে ডুব দিয়ে আর মাটি খুঁড়ে কিছুই পাওয়া যায়নি। তারপর হঠাৎ, লংফেলো বলল, মাত্র মাস ছয়-স্যাত আগে, কয়েক হপ্তার ভেতর দুটো ঘটনা ঘটল। শার্ক বে গ্রাম থেকে এক তরুণ জেলে নিখোঁজ হলো। সেই থেকে আজও তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। কয়েক হপ্তা পর নিউ ইয়র্কের একটা সিন্ডিকেট দশ হাজার ডলারে আইল অভ সারপ্রাইজ কিনে নিল। পুরানো মালিক এই দ্বীপ থেকে তেমন কিছু আয় করত না, জ্যামাইকার অন্য জায়গায় বড়সড় একটা কলা বাগান আছে তার। নগদ দশ হাজার ডলার পেয়ে সে ভাবল, খুব জিতেছে।

আইল অভ সারপ্রাইজ বিক্রি হয়ে যাবার কিছুদিন পর শার্ক বে-তে দেখা গেল ইয়ট আল-আমিনকে। মরগ্যানের পুরানো অ্যাংকোরেজেই নোঙর ফেলল আল-আমিন। ইয়টে কোন শ্বেতাঙ্গ ছিল না। বেশিরভাগই নিগ্রো, তবে তুর্কী আর এশীয় কিছু লোকও ছিল। পাথর কেটে সিঁড়ি বানাল তারা, চূড়ায় তৈরি করল কয়েকটা কুঁড়েঘর। প্রয়োজনীয় রসদ-পত্র সব তাদের সাথেই ছিল, জেলেদের গ্রাম থেকে কিনল শুধু তাজা ফল আর মিষ্টি পানি। প্রতি রাতে দ্বীপটা থেকে ড্রাম বাজাবার আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল।

শান্তশিষ্ট, সুশৃংখল একদল লোক; কারও সাথে তাদের বিরোধ বাধল না। প্রতিবেশী বন্দর পোর্ট মারিয়া থেকে কাস্টমস্ ক্লীয়ার্যান্স নিল আল-আমিন, ক্যাপটেন জানাল মার্কিন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান স্নেক ট্রেডার্সের জন্যে বিষাক্ত সাপ ধরবে বলে এসেছে তারা। দেখা গেল, শার্ক বে, পোর্ট মারিয়া, এবং অন্যান্য জায়গা থেকে প্রচুর সাপ কিনছে তারা।

পুরো এক হপ্তা ধরে আইল অভ সারপ্রাইজে ডিনামাইটের বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। জ্যামাইকান পুলিস নাক গলাতে চাইলে তাদের বলা হলো, মাছ চাষের জন্যে বিরাট একটা ট্যাংক তৈরির কাজ চলছে। পানির নিচে বিস্ফোরণ ঘটানো সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়া হলো, নতুন জেটি তৈরির পরিকল্পনা আছে, তাই ডুবো-পাহাড়ের মাথা ভেঙে ফেলা হলো।

গালফ অভ মেক্সিকো দিয়ে পনেরো দিন পর পর আসা-যাওয়া শুরু করল আল-আমিন। জ্যামাইকায় যাদের বিনকিউলার আছে তারা দেখল, প্রতিবার ফিরে যাবার আগে সাপ সহ খাঁচা তোলা হয় ইয়টে। ইয়ট চলে গেলেও, কিছু লোক দ্বীপে থেকে যায়। খাড়া পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ি, সিঁড়ির গোড়ায় একটা জেটিতে সব সময় কেউ না কেউ পাহারায় থাকে। লোকটা মাছ ধরে, কিন্তু তার কাজ হলো নৌকো নিয়ে আইল অভ সারপ্রাইজের দিকে কেউ এগোলে তাকে সাবধান করে

দেয়া।

দিনের বেলা আইল অভ সারপ্রাইজে পা রাখা সম্ভব নয়। জেলেরা রাতের বেলা চেষ্টা করেছিল, দু'বার; পারেনি। এরপর তারা হাল ছেড়ে দেয়।

জেলেদের ধারণা হলো, সাপ-টাপ বাজে কথা, আল-আমিনের ক্রুরা আসলে গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে। অসমসাহসী এক যুবক কৌতূহলী হয়ে উঠল। এক অন্ধকার রাতে সাঁতার কেটে সারপ্রাইজের দিকে এগোল সে। পরদিন তার লাশ ভেসে এল রীফ-এ। ধড় আর ঊরুর খানিকটা বাদে তার আর কিছু রাখেনি হাঙররা। রওনা হবার পর ঠিক যখন তার দ্বীপে পৌঁছনোর কথা, গোটা শার্ক বে গ্রাম ড্রামের গম্ভীর আওয়াজে থরথর করে কেঁপে উঠেছিল। সারপ্রাইজ থেকেই ড্রাম বাজানো হচ্ছিল। পাঁচ মিনিট পর আওয়াজটা থামে।

লংফেলো এবার উদ্বিগ্ন হলো। সব কথা জানিয়ে লন্ডনে রিপোর্ট পাঠাল সে। ঠিক তখন ওয়াশিংটন থেকেও একটা রিপোর্ট পৌঁছল লন্ডনে। জানা গেল, নিউ ইয়র্কের যে সিন্ডিকেট সারপ্রাইজ কিনেছে তার মালিক মি. ওয়াইজ।

লংফেলোকে মাস তিনেক আগে নির্দেশ দেয়া হলো, যেভাবে হোক সারপ্রাইজে কি ঘটছে জানতে হবে। জ্যামাইকার সামরিক গুরুত্ব কম নয়, কেউ যদি গোপনে সাবমেরিন ঘাঁটি বানিয়ে ফেলে, তখন?

অপারেশনের জন্যে প্রস্তুতি নিল লংফেলো। শার্ক বে-র পশ্চিম বাহুর খানিকটা জায়গা ভাড়া করল সে, বিউ ডেজার্ট নামে একটা এস্টেট। ওখানে জ্যামাইকার বিখ্যাত ভবনগুলোর একটার ধ্বংসাবশেষ আছে, আর আছে আধুনিক একটা বীচ-হাউস—সারপ্রাইজে আল-আমিন যেখানে নোঙর ফেলে ঠিক তার উল্টোদিকে।

বারমুডা থেকে দু'জন দক্ষ সাঁতারুকে আনা হলো। রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখা হলো দ্বীপটার ওপর। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই ধরা পড়ল না। তারপর, এক রাতে, চুপিচুপি পানিতে নামল দুই সাঁতারু। তাদের ওপর নির্দেশ থাকল, দ্বীপটার চারপাশে আন্ডারওয়াটার সার্ভে করবে তারা। ওরা রওনা হবার এক ঘণ্টা পর, এবারও ড্রাম বাজতে শুরু করল দ্বীপে।

সে-রাতে লোক দু'জন ফিরল না।

পরদিন বে-র দু'জায়গায় পাওয়া গেল দু'জনকে। দ্বীপের কত কাছে তারা যেতে পেরেছিল, কেউ জানল না। শুধু জানা গেল, হাঙর আর ব্যারাকুডারা ওদেরকে মেরে ফেলেছে।

'এক মিনিট,' লংফেলোকে বাধা দিল রানা। 'হাঙর আর ব্যারাকুডা প্রসঙ্গ আসছে কিভাবে? এদিকের পানিতে ওগুলোর সংখ্যা খুব কম। তাছাড়া, পানিতে রক্ত না থাকলে মানুষকে ওরা আক্রমণ করবে না। কৌতূহল হলে বড়জোর সাদা একটা পা কামড়ে ধরতে পারে। এর আগে কখনও ওগুলো এ-ধরনের আচরণ করেছে কিনা জানেন?'

লংফেলো জানাল, উনিশশো বিয়াল্লিশ সালের পর আর এ-ধরনের ঘটনা ঘটেনি। সেবার যুবতী এক ট্যুরিস্টের একটা পা খেয়ে ফেলে হাঙর। রশির শেষ প্রান্তে ছিল মেয়েটা, একটা স্পীডবোট তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। পা ছুঁড়ছিল

মেয়েটা, তার সাদা পা নিশ্চয়ই হাঙরের খিদে বাড়িয়ে দেয়। হ্যাঁ, রানা যা বলল তার সাথে সবাই একমত। তাছাড়া, লংফেলোর লোক দু'জনের সাথে হারপুন আর ছোরা ছিল। ওগুলোই ওদেরকে রক্ষা করার জন্যে যথেষ্ট বলে ধরে নিয়েছিল সে।

স্বভাবতই মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছে লংফেলো। ওদের মৃত্যুর জন্যে দায়ী করছে নিজেকে।

'মুশকিল হলো, দ্বীপের বর্তমান মালিক একটা বন্ধু রাষ্ট্রের নাগরিক,' বলল লংফেলো। 'তাছাড়া, তার বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগও নেই। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ওয়াশিংটনের প্রভাবশালী মহলের সাথে মি. ওয়াইজের দহরম-মহরম আছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লইয়ার নিয়োগ করেছে লোকটা। আমরা যদি গায়ের জোরে দ্বীপে যেতে চাই, কেস ঠুকে দেবে।' অসহায়ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে হুইস্কির গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিল সে।

'আল-আমিনের গতিবিধি সম্পর্কে কি জানেন বলুন,' জানতে চাইল রানা।

'এখনও কিউবায় রয়েছে। সি. আই. এ.-র রিপোর্ট, এক হপ্তার মধ্যে নোঙর তুলবে।'

'ইতিমধ্যে ক'টা ট্রিপ দিয়েছে?'

'প্রায় বিশটা।'

দুশো চার কোটি আশি লাখ টাকাকে বিশ দিয়ে পূরণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করল রানা। অঙ্ক মেলাতে হলে ক্যালকুলেটর লাগবে।

'আপনার জন্যে সব ব্যবস্থা করা আছে,' বলল লংফেলো। 'বিউ ডেজার্টে বাড়ি। গাড়ির ব্যবস্থাও হয়েছে—একটা সানবীম ট্যালবট কুপে। নতুন টায়ার। আপনাকে সাহায্য করতে পারবে এরকম একজন লোক ঠিক করে রেখেছি। মাধু গোপালান। বাপ-দাদারা ভারতীয় ছিল, কিন্তু মাধু পুরোপুরি জ্যামাইকান হয়ে গেছে।'

'গুণ?'

'ক্যারিবিয়ানের শ্রেষ্ঠ সাঁতারু। ভয়-ডর কাকে বলে জানে না। অথচ বিনয়ী এবং কর্মঠ। ম্যানাটি বে-তে একটা রেস্টহাউজ ভাড়া করেছি, দ্বীপের উল্টোদিকে। আল-আমিন না আসা পর্যন্ত ওখানে আপনি বিশ্রাম নিতে পারবেন, দরকার মনে করলে দৌড় ঝাঁপ সাঁতার যা খুশি প্র্যাকটিসও করতে পারবেন ওর সাথে। আপনার জন্যে আর কি করতে পারি বলুন।'

'আমার ধারণা ছিল, আপনাকেও আমি পাশে পাব,' বলল রানা।

'নিশ্চয়ই পাবেন,' তাড়াতাড়ি বলল লংফেলো। 'কিন্তু বেশিরভাগ সময় আমাকে কিংস্টনে থাকতে হবে আর কি। লন্ডন আর ওয়াশিংটন থেকে কি খবর আসে না আসে সেদিকে নজর রাখতে হবে তো। তাছাড়া, আমরা এখানে কি করছি না করছি, সব ওরা জানতে চাইবে। আপনার কি কি লাগবে জানলে...'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল রানা। বলল, 'লন্ডন থেকে আমাকে একটা ফ্রগম্যান স্যুট আনিয়ে দিন। সাথে কমপ্রেসড-এয়ার বটল থাকতে হবে। প্রচুর

স্পেয়ার।' নোট করতে শুরু করল লংফেলো। 'একজোড়া ভাল আন্ডারওয়াটার হারপুন গান চাই। আন্ডারওয়াটার টর্চও দরকার। আর একটা কম্যান্ডো ড্যাগার।'

'আর কিছু?'

'হাঙর আর ব্যারাকুডার বিরুদ্ধে কিছু ওষুধ-পত্র বেরিয়েছে, আমেরিকানরা প্যাসিফিকে ব্যবহার করে,' বলল রানা। 'যদি সম্ভব হয়, অন্তত, শার্ক-রিপেলেন্ট কিছু একটা আনাবার ব্যবস্থা করুন।' একটু থেমে আবার বলল রানা, 'আপনাদের বি. ও. এ. সি.-কে বলুন জিনিসগুলো নিয়ে যেন সরাসরি উড়ে চলে আসে।'

'ঠিক আছে।'

'ও, আরেকটা জিনিস,' হেসে ফেলে বলল রানা। 'লিমপেট মাইন, অ্যাসরটেড ফিউজ সহ।'

নোটবুক বন্ধ করে লংফেলো বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, মি. রানা।'

চার

শর্টস আর স্যান্ডেল পরে বারান্দায় বসে আছে রানা, টেবিলে ব্লু মাউন্টেন কফি। সকালের প্রথম রোদে ঝলমল করছে কিংস্টন আর পোর্ট রয়্যাল। নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য মুগ্ধ করে দিল ওকে। বিপজ্জনক আর ঝুঁকিবহুল পেশা বেছে নেয়ায় এই একটা মস্ত লাভ হয়েছে। কোথায় না গেছে ও, আকণ্ঠ পান করেছে প্রকৃতির রূপ-সুধা। দূর-দূরান্তের জনপদে পায়ের ধুলো পড়েছে, মায়ায় জড়িয়েছে অচেনা মানুষকে, তাদের মনে রেখে এসেছে মধুর স্মৃতি। সৃষ্টি বৈচিত্র্যময় সেই বৈচিত্র্য আস্বাদন থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেনি ও।

দুনিয়ার সেরা কফির কাপে চুমুক দিয়ে রানা ভাবল, জন্মেছি সেজন্যে আমি ধন্য!

জ্যামাইকায় আগেও এসেছে ও, ভাল করে চেনে। ভেবে খুশি হয়ে উঠল, আবার মারামারি কাটাকাটিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠার আগে পুরো একটা হপ্তা উপভোগ করতে পারবে সে এই সৌন্দর্য।

একটু পর দীর্ঘদেহী এক যুবককে সাথে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল লংফেলো। যুবকের গায়ের রঙ তামাটে, পরনে হালকা নীল শার্ট আর ব্রাউন ট্রাউজার।

দ্বীপবাসী মাধু গোপালান। দেখার সাথে সাথে তাকে পছন্দ হয়ে গেল রানার। বড়বড় চোখে বুদ্ধির ছটা, কৌতুক আর কৌতূহলে ভরপুর। হ্যান্ডশেক করল ওরা।

'গুডমর্নিং, ক্যাপটেন,' বলল মাধু। দুনিয়ার সেরা নাবিকদের কাছে মানুষ হয়েছে সে, এরচেয়ে বেশি মর্যাদাকর সম্বোধন তার জানা নেই। বলার মধ্যে খুশি করার প্রবণতা নেই, নেই অতি বিনয়ী ভাব। মুহূর্তের মধ্যে ওদের সম্পর্কটা গাঢ় হয়ে গেল।

প্ল্যান সম্পর্কে আলোচনা শেষ করে কুপের ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল রানা, কিংস্টন থেকে আসার সময় গাড়িটা নিয়ে এসেছে মাধু। জাংশন রোড ধরে রওনা হলো ওরা। রানার জিনিস-পত্র যোগাড় করতে হবে, তাই লংফেলো রয়ে গেল।

বেলা ন'টায় রওনা হয়েছে ওরা, পাহাড় সারির মাঝখান দিয়ে যাবার সময় তবু শীত শীত করতে লাগল। পাহাড়গুলোকে বেড় দিয়ে রেখেছে ঘন বনভূমি, চারদিকে নিবিড় সবুজের সমারোহ আর মিষ্টি ছায়া। পাহাড় থেকে সমতল উত্তর প্রান্তরে নামতে শুরু করল গাড়ি। রাস্তার ধারে কখনও বাঁশঝাড়, কখনও সেগুন বন, মাইলের পর মাইল। প্রান্তরে নেমে এসে চারদিকে শুধু সবুজ আখ গাছ দেখল ওরা। তারপর কলা বাগান।

আলাপচারিতায় মাধুর তুলনা পাওয়া ভার। ক্যাসেলটনের বিখ্যাত নারকেল-বীথি পেরোবার সময় একজোড়া কাঁকড়া বিছের গল্প করল সে। ওগুলোর মারামারির রোমহর্ষক বর্ণনা দিতে গিয়ে নিজেই শিউরে উঠল বারবার। এরপর শুরু হলো সাপের গল্প। জ্যামাইকায় প্রায় সব ধরনের সাপ পাওয়া যায়, বেশিরভাগই বিষাক্ত। কথায় কথায় জানাল, জ্যামাইকায় কারও অসুখ-বিসুখ করলে ডাক্তার দেখাবার রেওয়াজ নেই, বুনো গাছ-গাছড়া থেকে ওষুধ বানাতে পারে ওরা। শুধু হাতের চাপ দিয়ে কিভাবে নারকেল ভাঙতে হয়, জ্যামাইকানদের কাছ থেকে শিখতে হবে দুনিয়াকে।

পথে যাকেই দেখল, হাত তুলে শুভেচ্ছা জানাল মাধু। তারাও সহাস্যে হাত নাড়ল।

'তোমাকে দেখছি এদিকের সব মানুষই চেনে,' মন্তব্য করল রানা। লোক ভর্তি একটা বাসকে পথ ছেড়ে দিল ও, বাসের গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা—রোমান্স।

'তিন মাস ধরে সারপ্রাইজের ওপর নজর রাখছি, ক্যাপটেন,' বলল মাধু। 'হপ্তায় দু'বার করে এই পথ দিয়ে আসা-যাওয়া করতে হয়েছে আমাকে। ক'দিন থাকুন, জ্যামাইকার সবাই আপনাকে চিনে ফেলবে। ওদের যা চোখ না! গতকাল এই সময় রোদ কড়া ছিল কিনা তাও বলে দিতে পারবে।'

সাড়ে দশটায় পোর্ট মারিয়াকে পাশ কাটাল ওরা, একটা শাখা রোড ধরে শার্ক বে-র দিকে ছুটল গাড়ি। একটা বাঁক নিতেই হঠাৎ করে গন্তব্যে পৌঁছে গেল ওরা। গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল রানা।

আধখানা চাঁদ আকৃতির বে, বাহু সহ চওড়ায় এক মাইলের তিন ভাগের এক ভাগ। নীল শরীর ভাঁজ হয়ে আছে, উত্তর-পুব থেকে আসা মৃদুমন্দ বাতাসে।

ওদের কাছে থেকে মাইলখানেক দূরে পানিতে লম্বা একটা সাদা ফেনার রেখা দেখে রীফ চেনা গেল। রীফটা বে-র ঠিক বাইরেই। রীফের মাঝখানে সরু প্যাসেজ, ওই শান্ত পানিপথই অ্যাংকোরেজে আসার একমাত্র উপায়। অর্ধবৃত্তের ঠিক মাঝখানে আইল অভ সারপ্রাইজ, পানি থেকে সোজা একশো ফিট ওপর দিকে উঠে গেছে—ওটার পুব প্রাচীরে ছোট ছোট মাখন রঙা ঢেউ খেলা করছে, উল্টোদিকের পানি নিস্তরঙ্গ।

প্রায় গোলাকারই বলা যায় ওটাকে। যেন লম্বা একটা খয়েরি কেক, মাথার

দিকে সবুজ রঙা বরফের আবরণ, নীল চীনা প্লেটে সাজানো।

সৈকতটাকে ঘিরে আছে নারকেল আর সুপারি গাছ, পিছনে জেলেদের ঘর, ঘরগুলো থেকে একশো ফিট ওপরে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা—সারপ্রাইজের সবুজ সমতল মাটির সাথে একই লেভেলে। মাত্র আধ মাইল দূরে দ্বীপটা।

দ্বীপের মাঝখানে, গাছপালার ফাঁকে কয়েকটা কুঁড়েঘর দেখা গেল। রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাধু বলল, 'আল-আমিনের লোকজন ওখানেই থাকে।'

মাধুর বিনকিউলার নিয়ে ঘরগুলো ভাল করে দেখল রানা। প্রাণের কোন চিহ্ন নেই, শুধু ক্ষীণ একটু ধোঁয়ার রেশ দেখা গেল।

ওদের নিচে বে-র পানি ম্লান সবুজাভ, ধূসর বালি পরিষ্কার দেখা যায়। রঙটা বদলে গেছে ধীরে ধীরে, ইনার রীফের কাছাকাছি গাঢ় নীল দেখাল। সারপ্রাইজের কাছ থেকে রীফের দূরত্ব হবে একশো গজ বা তার কিছু বেশি। মাধুর কাছ থেকে জানা গেল, আল-আমিনের অ্যাংকোরেজ ত্রিশ ফিটের মত গভীর হবে।

ওদের বাঁ দিকে, বে-র পশ্চিম বাহুর মাঝখানে, গাছপালা ঘেরা খুদে একটা বালি চিকচিকে সৈকত রয়েছে। ওটাই বিউ ডেজার্ট, ওদের অপারেশন্যাল হেডকোয়ার্টার। জায়গাটার লে-আউট সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে শুরু করল মাধু। সেদিকে কান থাকলেও, ঝাড়া দশ মিনিট ধরে বিউ ডেজার্ট আর আল-আমিনের অ্যাংকোরেজের মধ্যবর্তী তিনশো গজ লম্বা সাগর খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল রানা।

সব মিলিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে গোটা এলাকা পরীক্ষা করল ও। তারপর, ওদের বাড়ি বা গ্রামের দিকে না গিয়ে, গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে মেইন কোস্ট রোডের দিকে ফিরে চলল।

পোর্ট অরাকাবেসার ভেতর দিয়ে ছুটল গাড়ি। এই বন্দর থেকে জ্যামাইকার কলা রফতানী হয়। সাগরের উত্তর কিনারা ধরে দু'ঘণ্টার পথ মন্টেগো বে-তে চলে এল। আশপাশে ছোট ছোট অনেক গ্রাম, বেশ ক'টা বড় বড় হোটেলও আছে। চওড়া বে-র শেষ মাথায় রেস্ট-হাউজ, এখানে লাঞ্চ খেলো ওরা। বিকেলের রোদ মাথায় নিয়ে আবার বেরোল, আরও দু'ঘণ্টার পথ দ্বীপের পশ্চিম ডগায় যাবে।

পশ্চিম প্রান্তে শুধু বিস্তীর্ণ জলাভূমি, কলম্বাস ম্যানাটি বে-কে অ্যাংকোরেজ হিসেবে ব্যবহার করার পর থেকে সময় যেন একই জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আরওয়াক ইন্ডিয়ানদের জায়গায় অবশ্য জ্যামাইকান জেলেরা এসেছে, তাছাড়া আর কোন পরিবর্তন চোখে পড়ে না।

রানার মনে হলো এত সুন্দর সৈকত আর বুঝি দেখেনি। পাঁচ মাইল লম্বা সাদা বালি ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে ছোট বড় পাথরের রাজ্যে নেমে গেছে, সাগরের নীল পানি থেকেও মাথা তুলে আছে কিছু পাথর। সৈকতের পিছনে উঁচু ভিটেতে সারি সারি পাম গাছ। গাছের নিচে জেলেদের উপুড় করা নৌকো। কোথাও কোথাও জাল শুকাচ্ছে। ছোট ছোট কুঁড়েঘর থেকে পাক খেয়ে উঠছে হালকা ধোঁয়া। উঁচু ভিটের পর শুরু হয়েছে জলা।

কুঁড়েঘরগুলো ছড়ানো ছিটানো, মাঝখানে ঝোপ-ঝাড় কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে চওড়া খানিকটা জায়গা। জায়গাটার চারদিকে বাহামা ঘাসের বেড়া,

কটেজটা মাঝখানে তৈরি করা হয়েছে। একটা ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানির কটেজ এটা, অফিসাররা মাঝেমধ্যে অবসর বিনোদনের জন্যে ব্যবহার করে। কংক্রিট পিলারের ওপর তৈরি করা হয়েছে, মশা-মাছি ঠেকাবার জন্যে চারদিকে নেট দেয়া আছে। উঁচু-নিচু পথ ধরে কটেজের নিচে এসে গাড়ি থামাল রানা।

দুটো ঘর বেছে নিয়ে ঝাড়ামোছা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মাধু, আর কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে পাম গাছের ভেতর দিয়ে সাগরের দিকে এগোল রানা।

গরম পানিতে এক ঘণ্টা সাঁতার কাটল ও। সারপ্রাইজ আর তার রহস্য নিয়ে ভাবল। তিনশো গজ দূরত্ব। শুধু হাঙরই নয়, ব্যারাকুডাও আছে। তা থাক, প্রশ্ন হলো, আর কি আছে?

সোনার মোহর নেই?

বিশ গজ হেঁটে কাঠের বাংলোতে ফেরার সময় প্রথম স্যান্ড-ফ্লাই-এর কামড় খেলো রানা। ওর পিঠের ফোলাটা লক্ষ করে হাসল মাধু। জানে, একটু পরই উন্মাদের মত চুলকাতে শুরু করবে রানা।

'ওগুলোর হাত থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই, ক্যাপটেন,' বলল সে। 'তবে চুলকানি বন্ধ করার ওষুধ আছে আমার কাছে। আগে শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে গা থেকে লবণ ধুয়ে ফেলুন।'

শাওয়ার সেরে বাথরুম থেকে বেরোল রানা, ফোলা জায়গাটায় খয়েরি মলম লাগিয়ে দিল মাধু। ফোলাটা ধীরে ধীরে বড় হলো, তবে চুলকানির ভাব বাড়ল না।

জানালার সামনে বসে সূর্যাস্ত দেখল রানা। খানিক পর একটা দুটো করে তারা জ্বলল আকাশে, পাহাড়ের মাথা থেকে উঁকি দিল আধখানা চাঁদ। বাতাস পড়ে গেল, শান্ত হলো সাগর। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবার ফিসফিস, খসখস করতে লাগল পাম গাছের পাতাগুলো।

ঝট করে বাইরে তাকাল মাধু। 'আন্ডারটেকার'স উইন্ড,' আপনমনে বলল সে।

'কি বললে?' চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল রানা।

'ছ'টা থেকে ছ'টা পর্যন্ত এর আয়ু,' বলল মাধু। 'সাগর থেকে আসে, দ্বীপের সমস্ত দূষিত বায়ু বের করে দেয়। জেলেরা এর নাম দিয়েছে আন্ডারটেকার'স উইন্ড। তারপর সকালে আসে ডক্টর'স উইন্ড, ঠাণ্ডা আর তাজা বাতাস দিয়ে যায় আমাদের।'

'ও, আচ্ছা।'

'আপনার কাজ অনেকটা ওই আন্ডারটেকার'স উইন্ডের মত, ক্যাপটেন,' হাসতে হাসতে বলল মাধু।

'শুধু আমার নয়, মাধু,' বলল রানা। 'মানুষ হয়ে জন্মালে আপনাআপনি তার কাঁধে এই দায়িত্ব চাপে—নোংরামি আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাকে দাঁড়াতে হবে। তা না হলে সে মানুষ কিসের!'

বাইরে ঝিঁঝি আর ব্যাঙেরা ডাকাডাকি শুরু করেছে। নেটের গায়ে পোকা বসছে, খুদে ফাঁকগুলো ঢাকা পড়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। কটেজের সামনে দিয়ে

মাঝেমধ্যে হেঁটে যাচ্ছে কখনও নিঃসঙ্গ কোন যুবক, কখনও দলবেঁধে মেয়ের দল। অকস্মাৎ নারীকণ্ঠের মিষ্টি হাসির শব্দে পুলক জাগে মনে।

ছুটন্ত একজোড়া পায়ের আওয়াজে সচকিত হয়ে উঠল রানা। পাম গাছের ফাঁকে দেখা গেল কালো একটা ছায়ামূর্তি। বাতাসে পতাকার মত উড়ছে তার এলোচুল। নারীমূর্তি। চাঁদের আলোয় মুহূর্তের জন্যে তার ফর্সা মুখ দেখা গেল। কটেজের সামনে দিয়ে ছুটে গেল সে, গুরুনিতম্বে ঢেউ খেলতে দেখে একটা ঢোক গিলল রানা। তারপর হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়েটা। বোধহয় কোন পাম গাছের আড়ালে লুকাল।

চোরের মত চুপিচুপি এল ছেলেটা। এক পা এগোয়, এদিক ওদিক তাকায়। বলিষ্ঠ গড়ন, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। পরনে ট্রাউজার, খালি গা। কটেজের সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল সে। তারপর শিস দিল।

সুর করে ডাকল মেয়েটা, 'এই যে আমি এখানে।'

ছেলেটার পায়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে সাগরের দিকে ছুটল মেয়েটা। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় পরিষ্কার কিছু দেখা গেল না। হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠল মেয়েটা। তারপর আর কোন শব্দ নেই। কয়েক সেকেন্ড পর পরিষ্কার শোনা গেল মেয়েটার গলা, 'অসভ্য! ছোঁচা! রাক্ষস!' তারপরই আবার সেই খিলখিল হাসি।

'ভাগ্যিস আপনি আমাদের ভাষা বোঝেন না!' একটু বিব্রত হাসি হাসল মাধু।

'অল্পস্বল্প বুঝি,' হেসে বলল রানা। 'না বুঝলে ঠকতাম!'

খানিকপর সাগরের দিক থেকে ফিরল ওরা। দু'জন দু'জনের হাত ধরে আছে। মেয়েটা তাকিয়ে আছে চাঁদের দিকে, কিন্তু ছেলেটার দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে সঙ্গিনীর মুখে। ঝিঁঝি পোকার একটানা আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল রাতজাগা পাখির ডাক।

রাতের খাবার তৈরির জন্যে কিচেনে চলে গেল মাধু। স্থানীয় লোকদের ভূতের ভয় খুব বেশি, রাত একটু বাড়লে কেউ আর একা বাইরে বেরোয় না। ল্যাম্পের সামনে বই নিয়ে বসল রানা। বইগুলো জ্যামাইকা ইনস্টিটিউট থেকে আনিয়ে দিয়েছে লংফেলো। পানির নিচে শিকার এবং সাগর সম্পর্কে লেখা ওগুলো। তিনশো গজ পেরিয়ে সারপ্রাইজে যাবার আগে সম্ভাব্য সমস্ত বিপদ সম্পর্কে সচেতন হতে চাইছে রানা। কবীর চৌধুরীর বুদ্ধিমত্তার ওপর শ্রদ্ধা আছে ওর, সে যে সারপ্রাইজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে চমৎকার কিছু কৌশল ব্যবহার করছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুধু আগ্নেয়াস্ত্র আর বিস্ফোরক তার একমাত্র সম্বল হতে পারে না। পুলিসের চোখে যাতে কিছু ধরা না পড়ে সেদিকে নিশ্চয়ই কড়া নজর রাখছে কবীর চৌধুরী। আইনকে কাঁচকলা দেখাবার ব্যবস্থা আছে তার। রানা আন্দাজ করল, সাগরের শক্তিকে ব্যবহার করে নিজের কাজ হাসিল করছে লোকটা। কাজেই ওর চিন্তাভাবনা এই খাতে বইল।

হাঙর আর ব্যারাকুডা। সাগরের দুই সন্তান। কবীর চৌধুরী ব্যবহার করছে ওদের।

রাতে ঘুমের মধ্যে অক্টোপাসের স্বপ্ন দেখল রানা। শুঁড়গুলো ওকে পেঁচিয়ে ধরে গভীর সাগরে টেনে নিয়ে চলেছে। ঘেমে একাকার হয়ে গেল ও, ঘুমের মধ্যে ফোঁপাতে লাগল।

পরদিন থেকে প্রস্তুতি নিতে শুরু করল রানা। সাগরের সাথে পরিচয় আছে ওর, ভাল সাঁতারু, কিন্তু অনেকদিন চর্চা না থাকায় নতুন করে ট্রেনিং নেয়ার দরকার হলো। রোজ সকালে ব্রেকফাস্টের আগে সাঁতরে দু'মাইল চলে যায়, বিরতি না দিয়ে ফিরে আসে আবার। প্রথম দু'দিন একটু কষ্ট হলো, তারপর খাটুনিটা গা-সওয়া হয়ে গেল। কিন্তু অবাক করল মাধু, তার দম দেখে রীতিমত ঈর্ষাবোধ করল রানা। একনাগাড়ে সারাদিন সাঁতার কেটেও ক্লান্ত হয় না ছোকরা।

বেলা ন'টার দিকে নৌকো নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ে ওরা। তেকোনা একটা মাত্র পাল বাতাসে ফুলে থাকে, তর তর করে পানি কেটে ছুটে চলে নৌকো। ব্লাডি বে আর অরেঞ্জ বে পেরিয়ে এসে পানি থেকে মাথাচাড়া দিয়ে থাকা পাহাড়-প্রাচীরের গোড়ায়, কখনও খুদে বালিময় সৈকতে, কখনও পাথুরে গুহার ভেতর, ঠাঁই নেয়। তটরেখা এখান থেকে বেশি দূরে নয়, রীফও খুব কাছে। এখানে পৌঁছবার পর নেতৃত্ব চলে যায় মাধুর হাতে। স্পিয়ার, মাস্ক, আর পুরানো একটা আন্ডারওয়াটার হারপুন গান নিয়ে পানির নিচে অভিযানে নামে ওরা। শার্ক বে আর এখানকার পানির সাথে অনেকদিক থেকে অনেক মিল আছে, সে-কথা ভেবেই এই অভিযান।

পানির নিচে ট্রেনিং নেয়া আছে রানার, পুরানো অভ্যেস আর কৌশলগুলো শুধু ঝালিয়ে নেয়া দরকার। সাগরে নেমে পানির সাথে কখনও যুদ্ধ করতে নেই, ঢেউ আর স্রোতে নিজেকে ছেড়ে দিতে হয়। জুডোর কৌশলগুলো পানির নিচে খুব কাজে দেয়।

প্রথম দিন রানা বাড়ি ফিরল বিষাক্ত কোরালে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে। ওর গায়ে ধন্বন্তরি মলম লাগিয়ে দিয়ে দাঁত বের করে হাসল মাধু গোপালান। রোজ সন্ধ্যায় আধ ঘণ্টা ধরে রানার শরীর পাম অয়েল দিয়ে ঘষে ঘষে ম্যাসেজ করে দিল সে। এই সময়টায় তার মুখ খুলে যায়।

সেদিন যে-সব মাছ দেখেছে সেগুলোর গল্প শোনায় মাধু। কোন্ মাছের কি অভ্যেস, কখন তারা খায় বা ডিম পাড়ে, কোন কোন মাছ কেন বহুরূপী সাজে, কিভাবে তারা গায়ের রঙ বদলায়, এক এক করে ব্যাখ্যা করতে থাকে সে। নিরক্ষর যুবক, তাকে শিক্ষিত করে তুলেছে স্বয়ং প্রকৃতি। তার জ্ঞানের বহর দেখে মনে মনে তাজ্জব বনে যায় রানা।

বই না পড়েও মাধু জানে, একান্ত মরিয়া হয়ে না উঠলে, বা পানিতে রক্তের গন্ধ না পেলে কোন মাছ মানুষকে আক্রমণ করে না। ট্রপিক্যাল ওয়াটারে প্রায় কখনোই খালি পেটে থাকে না ওগুলো। ওগুলোর বেশিরভাগ অস্ত্র আত্মরক্ষার জন্যে, হামলা করার জন্যে নয়। তার ধারণা, একমাত্র ব্যতিক্রম হলো ব্যারাকুডা। 'বজ্জাত মাছ,' রানার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল সে। 'ওদের মত নিষ্ঠুর দাঁত সাগরে আর কারও নেই।'

একদিন ওরা বিশ পাউন্ড ওজনের একটা ব্যারাকুডা মারল। অনেকক্ষণ ধরেই ওদের চারপাশে ঘুরঘুর করছিল। হুট করে ধূসর পানিতে অদৃশ্য হয়ে যায়, খানিক পর আবার ফিরে আসে। নিচে নেমে ওদের লেভেলে আসে না, খানিকটা ওপরে ঝুলে থাকে—চুপচাপ, নিঃসাড়। শুধু বাঘের মত চোখ জোড়া জ্বলজ্বল করে, এত কাছে যে পিচুটি পর্যন্ত দেখা যায়। হাঁ করে থাকে ওটা, যেন গপ্ করে গিলে ফেলার মতলবে আছে, ভেতরে দেখা যায় সারি সারি ধারাল দাঁত।

বিরক্ত হয়ে রানার কাছ থেকে হারপুন গান নিয়ে গুলি করল মাধু। জায়গামত লাগল না হারপুন, পেটে গিয়ে বিঁধল। এবার পুরোপুরি খুলে গেল ব্যারাকুডার মুখ, বিদ্যুৎবেগে ওদের দিকে ছুটে এল। মাধুর ওপর এসে পড়েছে, এই সময় স্পিয়ার ছুঁড়ল রানা। মেরেছিল মাথা লক্ষ্য করে, কিন্তু ঢুকে গেল হাঁ করা মুখের ভেতর।

ইস্পাতের বর্শা ভেতরে নিয়ে মুখ বন্ধ করল ব্যারাকুডা। এক ঝটকায় বর্শাটা রানার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। ওদিকে মাধু ওটার গায়ে এলোপাতাড়ি ছোরা মেরে চলেছে।

উন্মাদ হয়ে গেল ব্যারাকুডা। পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে নাড়িভুঁড়ি, দড়ি-দড়ার মত ঝুলছে সে-সব। বর্শাটা মুখের ভেতর, দাঁত আর শক্ত মাংসে আটকে গেছে। গায়ে গাঁথা রয়েছে হারপুন। বিদ্যুৎবেগে ডিগবাজি খেতে শুরু করল ওটা, দিগ্বিদিক্ লাফ দিয়ে পড়ছে। লাইন ধরে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল, মাছের সাথে সাথে একটা ডুবোপ্রাচীরের দিকে এগোল মাধু। পাথরে লাইন পেঁচিয়ে হাঁফ ছাড়ল সে। কাহিল হয়ে পড়ল মাছটা, লাইন টেনে সেটাকে কাছে আনল মাধু। রানা ওটার গলা কাটার পর, মোচড় দিয়ে চোয়াল থেকে বের করা হলো স্পিয়ারটা। ইস্পাতের গায়ে চকচকে, গভীর দাগ বসে গেছে।

ডাঙায় নিয়ে এসে মুণ্ডুটা ধড় থেকে আলাদা করা হলো। মুখ খুলে, চোয়ালে একটা কাঠের টুকরো আটকাল মাধু। দু'দিকের চোয়ালে সারি সারি ধারাল দাঁত দেখে শিউরে উঠতে হয়, এমনকি জিভের কিনারাতেও ছোট ছোট ছুরির ফলার মত অনেক দাঁত রয়েছে। মুখের সামনে একজোড়া ফণা দেখা গেল, ঠিক সাপের মত। মাত্র বিশ পাউন্ডের মত ওজন হলে কি হবে, লম্বায় প্রায় ছয় ফিট ওটা। লোহার মত মাংস, তারের মত পাকানো পেশী।

হপ্তার শেষ দিকে রোদে পুড়ে রানার গায়ের রঙ তামাটে হয়ে গেল, পেশীগুলো আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্ত। সিগারেট খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে ও, মদ একেবারেই ছোঁয় না। ক্লান্ত না হয়ে ছয় মাইল সাঁতার কাটতে পারে। বাঁ হাতটা সেরে গেছে। শহুরে মাসুদ রানার কোন দুর্বলতাই এখন নেই ওর মধ্যে।

মাধু পুরোপুরি সন্তুষ্ট। 'সারপ্রাইজ ভিজিট দেয়ার জন্যে এখন আপনি সম্পূর্ণ তৈরি, ক্যাপটেন,' মন্তব্য করল সে।

আট দিনের দিন সন্ধ্যার পরপরই রেস্ট-হাউজে পৌঁছল ওরা। ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল লংফেলো। প্রথমেই রানা জানতে চাইল, 'টামপা থেকে কোন খবর পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল লংফেলো। 'আপনার সহকর্মী মি. গিলটি মিয়া ভাল আছেন। তাঁর কোন অঙ্গহানি হয়নি। তবে, আরও কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হবে। উনি আপনাকে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন। আর, লন্ডন থেকেও একটা খবর এসেছে। ব্লাডি মরগ্যানের গুপ্তধন আপনি যদি উদ্ধার করতে পারেন, বাংলাদেশ তার অর্ধেক ভাগ পাবে।'

'গুড,' বলল রানা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। 'আর সব খবর বলুন।'

'সারপ্রাইজে আসার জন্যে কাল নোঙর তুলবে আল-আমিন,' বলল লংফেলো। 'পোর্ট মারিয়া থেকে রওনা হয়ে রাত নামার আগেই পৌঁছে যাবে বলে আশা করছি। মি. ওয়াইজ ইয়টেই রয়েছেন—এবার নিয়ে দু'বার এখানে এলেন তিনি। ও, ভাল কথা, আল-আমিনে এবার একটা মেয়েও আছে। সি. আই. এ. তার নামও জানিয়েছে—শিরিন আক্তার। মেয়েটা সম্পর্কে কিছু জানেন নাকি, মি. রানা?'

'সামান্য,' বলল রানা। 'তবে ওকে আমি শয়তানটার কাছ থেকে উদ্ধার করতে চাই। ওদের দলের কেউ নয় সে।'

লংফেলোর চেহারায় রোমান্টিক ভাব ফুটে উঠল। 'বন্দিনী রাজকন্যাকে তো রাজপুত্রই উদ্ধার করবে। বাই দ্য ওয়ে, সি. আই. এ. রিপোর্ট করেছে, মেয়েটা নাকি অপরূপা সুন্দরী। সত্যি নাকি?'

কিন্তু রানা ইতোমধ্যে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে। মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল ও, নীলচে তারা দেখছে। সামনে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ। শুধু গুপ্তধন রহস্য উন্মোচন করলেই কাজ শেষ হচ্ছে না, পরম শত্রু কবীর চৌধুরীকে শায়েস্তা করতে হবে। নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে হবে শিরিনকে।

তারাগুলো মিটমিট করছে। কি যেন সঙ্কেত দিচ্ছে রানাকে। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল ও। এই সাঙ্কেতিক ভাষার অর্থ উদ্ধার করা ওর সাধ্যের বাইরে।

পাঁচ

ডিনারের পর বিদায় নিল লংফেলো। ঠিক হলো, ভোরের প্রথম আলোয় ওরাও রওনা হয়ে যাবে। হাঙর আর ব্যারাকুডার ওপর আরও কিছু বই দিয়ে গেছে লংফেলো, বিছানায় শুয়ে আগ্রহের সাথে সেগুলোর পাতা উল্টে গেল রানা। নতুন তেমন কিছু জানা না গেলেও, ভুলে যাওয়া অনেক তথ্য ফিরে এল মনে।

পানির ওপর যারা সাঁতার কাটে, বিপদের সম্ভাবনা তাদেরই বেশি। ব্রিদিং ইকুইপমেন্ট নিয়ে যারা পানির নিচে নামে তাদের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। যদিও যে-কোন হাঙর পরিবারের সদস্য যে-কোন সাঁতারুকে যখন-তখন আক্রমণ করতে পারে। বিশেষ করে পানিতে যদি রক্ত থাকে বা খুব

বেশি আলোড়ন তোলা হয়। পানিতে রক্ত নেই, সাঁতারু বিশেষ নড়াচড়া করছে না, এরকম অবস্থায়ও আসতে পারে হাঙর, সাঁতারুর গায়ের গন্ধ তাকে টেনে আনতে পারে। কখনওসখনও হাঙরকে তাড়ানো সম্ভব, খুব জোরাল শব্দ ওরা সহ্য করতে পারে না। এমনও দেখা গেছে, সাঁতারু এগোলে ওরা কেটে পড়ে।

সবচেয়ে কাজের শার্ক রিপেলেন্ট তৈরি হয়েছে ইউ.এস. ন্যাভাল রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে, কপার অ্যাসিটেট আর গাঢ় নাইগ্রোসিন ডাই সহযোগে তৈরি কেক। ওয়াশিংটন থেকে সেই কেক আসছে, কিন্তু চব্বিশ ঘন্টার আগে পৌঁছবে বলে মনে হয় না। রিপেলেন্ট না পেলেও কিছু এসে যায় না, ভাবল রানা। সারপ্রাইজে যাবার জন্যে পানিতে নামলেই ওর দিকে হাঙরের দল ছুটে আসবে, এরকম মনে করার কোন কারণ নেই।

পরদিন ভোরে রওনা হয়ে সাড়ে দশটায় বিউ ডেজার্টে পৌঁছে গেল ওরা। বিশাল এস্টেট, গ্রেট হাউস নামে খ্যাত ভবনের ধ্বংসাবশেষ বিরাট একটা আকর্ষণ। ফল-মূলের ভাল ফলন হয় এদিকে। একটা মেঠো পথ ধরে এগোল গাড়ি, সারপ্রাইজ থেকে দেখা যায় না। গাছপালার ফাঁক দিয়ে ছোট্ট বীচ-হাউজ চোখে পড়ল। ম্যানাটি বে-তে এক হপ্তার পিকনিক শেষ করার পর বাথরুম আর আরামদায়ক বেতের ফার্নিচার বিলাসিতা মনে হলো। গাঢ় রঙের কার্পেট রানার শক্ত পায়ের তলায় মখমলের মত লাগল। জানালার খড়খড়ি তুলে বাগানে তাকাল ও। ফুলে ফুলে লাল, হলুদ, নীল আর বেগুনি আগুন ধরে আছে। বাগানের শেষ মাথায় ত্রিভুজ আকৃতির বালি চিকচিকে সৈকত, পাম গাছে অর্ধেকটা ঢাকা পড়ে আছে। চেয়ারের হাতলে বসে সাগরের প্রতি ইঞ্চি খুঁটিয়ে দেখল ও। পানি কোথাও সবুজ, কোথাও নীল, আবার কোথাও খয়েরি। পানি থেকে লম্বা একটা কালো রেখা মাথা তুলে আছে—রীফ। আরও খানিক সামনে দ্বীপ, আইল অভ সারপ্রাইজ। বিষাক্ত সরীসৃপের আস্তানা। কবীর চৌধুরীর ঘাঁটি।

দ্বীপের ওপরের অংশ পাম গাছের ডালপালায় বেশিরভাগ ঢাকা পড়ে আছে, তবে খাড়া পাহাড় কেটে বানানো সিঁড়িটা পরিষ্কার দেখা গেল। পাহাড়ের গা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, অমঙ্গলের প্রতীক।

যাতে ধোঁয়া না হয়, স্টোভে লাঞ্চ তৈরি করল মাধু। বিকেলে ছোট্ট একটা ঘুম দিয়ে উঠে লন্ডন থেকে পাঠানো ইকুইপমেন্ট পরীক্ষা করতে বসল রানা। কালো, পাতলা রাবারের ফ্রগম্যান'স স্যুটটা পরল ও। হেলমেটটা একটু টাইট হলো মাথায়। হেলমেটের সাথেই মাস্ক, মাস্কের গায়ে রঙিন কাঁচ লাগানো জানালা। পা ছড়িয়ে অনেকটা লম্বা হয়ে আছে কালো ফ্লিপার।

একজোড়া সিলিন্ডার, প্রতিটিতে এক হাজার লিটার বাতাস, কমপ্রেস করে দুশো অ্যাটমোসফিয়ারে আনা হয়েছে। ডিমান্ড ভালব আর রিজার্ভ মেকানিজম সহজেই অপারেট করা যায়। পানির যে গভীরতায় কাজ করবে ও, সেখানে দু'ঘন্টার জন্য এই বাতাস যথেষ্ট।

চ্যাম্পিয়ন কোম্পানীর হারপুন গান আর একটা কমান্ডো ড্যাগার পরীক্ষা করল

রানা। সবশেষে খুলল ডেঞ্জার লেখা একটা বাক্স। ভেতর থেকে বেরোল ভারী লিমপেট মাইন। চ্যাপ্টা, মোচাকৃতি ভীতিকর বিস্ফোরক, এমনভাবে ম্যাগনেটাইজ করা যে যে-কোন ধাতব খোলে আটকে থাকবে মাইনের সাথেই বাক্সে এক ডজন পেন্সিল আকৃতির ধাতব আর কাঁচের তৈরি ফিউজ রয়েছে, দশ মিনিট থেকে আট ঘণ্টা, বিভিন্ন মেয়াদে সেট করা। আন্ডারওয়াটার টর্চ, লাইন, ইত্যাদি আরও কিছু জিনিস পরীক্ষা করল রানা। সন্তুষ্ট হলো ও, আর কিছুর দরকার নেই।

মাধুকে সব গুছিয়ে রাখতে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল রানা। গাছপালার ভেতর দিয়ে বেশ খানিকটা হেঁটে সৈকতের কাছাকাছি চলে এল। সাগর আর দ্বীপের দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল ও। রীফের ফাঁক দিয়ে কোন্ পথে এগোবে সেটা আন্দাজ করার চেষ্টা করল। চাঁদটা তখন কোন্ পথ ধরে এগোবে, কোথায় থাকবে, হিসেব করে মিলিয়ে নিল দৃশ্যটা। আসল শত্রু সাগর বা মাছ নয়, মানুষ, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল ও। গোপনে যেতে হবে ওকে।

বেলা পাঁচটায় আল-আমিনের খবর নিয়ে এল লংফেলো।

'পোর্ট মারিয়া থেকে রওনা হয়ে গেছে ওরা,' বলল সে। 'খুব বেশি হলে আর দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে এখানে। মি. ওয়াইজের কাছে সিদ্দিক নামে একটা পাসপোর্ট রয়েছে।'

'মেয়েটা সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'শিরিন আক্তার নাকি অসুস্থ,' বলল লংফেলো। 'নিগ্রো ক্যাপটেনের ভাষায়, সী-সিকনেসে ভুগছে, তাই কেবিন থেকে বেরুতে পারছে না। হতেও পারে।'

'ইয়টে তল্লাশি চালিয়ে কি দেখল কাস্টমস্?'

ঠোঁট ওল্টাল লংফেলো। 'প্রতিবার যা দেখে, শূন্য খাঁচা। তবে এবার খাঁচার সংখ্যা কম, মাত্র দুশো। সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি, কাজেই ক্লিয়ার‍্যান্স সার্টিফিকেট দিতে হয়েছে কাস্টমস্‌কে। একবার ভেবেছিলাম কাস্টমস্ টীমের সাথে আমিও ইয়টে উঠি, কিন্তু ওদের সন্দেহ হতে পারে মনে করে গেলাম না। অফিসারদের মি. ওয়াইজের কেবিনে যেতে হয়, কারণ মি. ওয়াইজ তখন বই পড়ছিলেন। ইকুইপমেন্টগুলো কেমন দেখলেন?'

'সব ঠিক আছে,' বলল রানা। 'সম্ভবত আগামীকাল রাতেই যাব আমি। এক-আধটু বাতাস থাকলে নিশ্চিন্ত হতে পারি। ওরা যদি বুদ্বুদ দেখতে পায়...' কথা শেষ না করে কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

ঘরে ঢুকল মাধু। 'রীফের ভেতর দিয়ে আসছে,' রুদ্ধশ্বাসে বলল সে।

সৈকতের প্রায় কিনারায় এসে গাছের আড়ালে দাঁড়াল ওরা, চোখে বিনকিউলার তুলে আল-আমিনের দিকে তাকাল। ইয়টটা ভারি সুন্দর দেখতে। কালো, কিন্তু সুপারস্ট্রাকচার খয়েরি। সত্তর ফিট লম্বা। অন্তত বিশ নট স্পীড তোলা যায়, আন্দাজ করল রানা। আল-আমিনের ইতিহাস জানা আছে ওর। উনিশশো সাতষট্টি সালে একজন মিলিওনেয়ারের অর্ডারে তৈরি করা হয়েছে। জেনারেল মোটরের জোড়া ডিজেল ইঞ্জিন। ইস্পাতের খোল। আধুনিক

ওয়্যারলেস সিস্টেম। সেই সাথে শিপ-টু-শোর টেলিফোন, আর ডেকা নেভিগেটর। বিশ ফুট লম্বা রীফের ফাঁক দিয়ে তিন নট স্পীডে আসছে ওটা।

রীফ পেরিয়ে এসে তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিল আল-আমিন, দ্বীপটা যেদিকে খোলা সাগরের দিকে মুখ করে আছে সেদিকে এগোল। দ্বীপের নিচে পৌঁছে, দ্রুত হাল ঘুরিয়ে দ্বীপের বাঁ পাশে চলে এল। ওদিকে দ্বীপের মাথায় ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেছে। তিনজন নিগ্রোকে দেখা গেল, পাথরের সিঁড়ি ভেঙে তরতর করে নেমে আসছে। জেটির শেষ মাথায় এসে থামল তারা, লাইন ধরার জন্যে তৈরি। জোড়া নোঙর ফেলা হলো ইয়ট থেকে। ওখানে পানির গভীরতা হবে বিশ ফুটের মত, আন্দাজ করল রানা।

লম্বা-চওড়া মি. ওয়াইজকে দেখা গেল আল-আমিনের ডেকে। কোন দিকে না তাকিয়ে ধীর, মাপা পা ফেলে এগোল সে। তার ভারে কেঁপে উঠল জেটি। পাথরের সিঁড়ি খাড়া উঠে গেছে, মুখ তুলে ওপর দিকে একবার তাকাল। সিঁড়ি ভাঙার সময় একবারও থামল না। একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছে, কিন্তু তা শুধু রানার চোখেই ধরা পড়ল। এই বয়সে এত দম, ভেবে অবাকই হলো ও।

ইয়ট থেকে এবার হালকা একটা স্ট্রেচার নামানো হলো। কবীর চৌধুরীর পিছু পিছু দু'জন তাগড়া নিগ্রো বয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেটা। বিনকিউলারে শিরিনের নীলচে-কালো চুল দেখতে পেল রানা। শিরিনকে ওরা স্ট্র্যাপ দিয়ে স্ট্রেচারের সাথে বেঁধে রেখেছে। শিরিন এত কাছে, অথচ খবর নেয়ার উপায় নেই, মনটা খারাপ হয়ে গেল রানার। শিরিন কি সত্যি অসুস্থ? নাকি তীর থেকে তাকে কেউ দেখে ফেলবে ভেবে স্ট্রেচারে শুইয়ে দ্বীপে তোলা হলো?

এরপর পনেরো জন লোকের একটা সারি তৈরি হয়ে গেল সিঁড়ির গোড়া থেকে মাথা পর্যন্ত। ওদের হাতে হাতে উঠতে শুরু করল খাঁচা, একটা একটা করে।

গোনা শেষ করে মাধু বলল, 'দুশো চল্লিশটা।'

এরপর রসদ-পত্র তোলা হলো। নিগ্রোদের কাজ শেষ হতে লংফেলো বলল, 'ব্যাপার কি, এবার রসদ-পত্র খুবই কম দেখছি। মাত্র বারোটা বাক্স। অন্যান্য বার পঞ্চাশ-ষাটটা থাকে। এবার বোধহয় বেশিদিন থাকবে না ওরা।'

তার কথা শেষ হতে না হতে নিগ্রোদের হাতে ফিরে এল প্রথম খাঁচাটা। এখন আর সেটা খালি নয়। কালচে, লম্বা একটা আকৃতি দেখা গেল খাঁচার ভেতর—সাপ। সিঁড়ি দিয়ে নামানো হলো সেটা, জেটি থেকে তোলা হলো ইয়টে। শুধু এই একটাই নয়, একের পর এক আসছে। আড়াই মিনিট পর পর।

'মাই গড!' বিমূঢ় দেখাল লংফেলোকে। 'এরই মধ্যে লোডিং শুরু করেছে ওরা!'

'তারমানে সকালেই ওরা রওনা হয়ে যাবে,' বলল রানা।

'কোন সন্দেহ নেই,' সায় দিল লংফেলো। 'এর মানে কি জায়গাটা ছেড়ে শেষবারের মত চলে যাচ্ছে ওরা?'

গভীর মনোযোগের সাথে আরও কিছুক্ষণ নিগ্রোদের তৎপরতা লক্ষ করল রানা,

তারপর গাছের ভেতর দিয়ে ফিরে এল রেস্টহাউজে। চিন্তিত দেখাল ওকে। কিছু বলতে গিয়েও কি ভেবে চুপ করে থাকল লংফেলো।

সৈকতে একা থাকল মাধু. পরে রানাকে রিপোর্ট করবে সে।

ফিরে এসে লিভিং রুমে বসল ওরা। স্টোভে পানি গরম হচ্ছিল. তাড়াতাড়ি কফি তৈরি করে আনল লংফেলো। দেখল. জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অন্য এক জগতে চলে গেছে রানা। ওর সামনে টেবিলের ওপর একটা কাপ নামিয়ে রেখে নিজের কাপে ছোট ছোট চুমুক দিল লংফেলো।

দেখতে দেখতে ছ'টা বেজে গেল. ছায়ার ভেতর একটা দুটো করে জ্বলতে শুরু করেছে জোনাকি। ম্লান আধখানা চাঁদ এরই মধ্যে পুব আকাশের অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে। দ্রুত ফুরিয়ে আসছে দিনের আলো। বাতাস খুব জোরাল নয়. কিন্তু একটানা বইছে—বে-র পানিতে সাদা ফেনা দেখা যাচ্ছে অল্প-স্বল্প. সৈকতের বালিতে মৃদু শব্দ করে আছড়ে পড়ছে ঢেউগুলো। আকাশে কিছু মেঘ দেখা গেল. কমলা রঙের, ধীরে ধীরে উঠে আসছে মাথার দিকে। বাতাসে খস খস করছে পাম গাছের পাতা।

বাতাসের নামটা মনে পড়ল রানার, আন্ডারটেকার'স উইন্ড। ক্ষীণ একটু হাসি ফুটল ঠোঁটে। গেলে আজ রাতেই যেতে হবে ওকে। পরে আর কোন সুযোগ পাওয়া যাবে না। পরিস্থিতি ওর অনুকূলেই বলা চলে. প্রস্তুতিও নেয়া আছে। একটাই খুঁত থেকে গেল, শার্ক রিপেলেন্ট সময় মত এসে পৌঁছায়নি।

প্রায় দু'হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে. পিছনে পাঁচ-সাতটা লাশ ফেলে এখানে এসে পৌঁছেছে রানা, এখন আর ইতস্তত করার কোন মানে হয় না। তবু অন্ধকার সাগরের তলা দিয়ে বাঘের খাঁচায় ঢুকতে হবে ভেবে একবার শিউরে উঠল ও। কাল রাতে যাবে বলে মানসিকভাবে তৈরি ছিল, সময়টা হঠাৎ করে এগিয়ে আসায় একটু যেন নার্ভাস ফিল করছে। বারবার মনে হতে লাগল, সাগরের নিচে ওর জন্যে অচেনা সব বিপদ ওত্ পেতে আছে। শুধু ব্যারাকুডা আর হাঙর নয়. বিষাক্ত পোকা-মাকড় আর সাপ রয়েছে পানির নিচে। অন্ধকার কোণ থেকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকবে সেগুলো। গায়ে অক্টোপাসের শুঁড়, কল্পনা করে আরেকবার শিউরে উঠল ও।

কিন্তু গোটা পৃথিবীতে সবচেয়ে হিংস্র প্রাণী মানুষ। কবীর চৌধুরীর নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে জানে রানা। পানির তলা দিয়ে অনুপ্রবেশ ঠেকাবার জন্যে কি ব্যবস্থা সে করে রেখেছে কে জানে।

মাত্র তিনশো গজ দূরত্ব। পেরোনো এমন কিছু কঠিন নয়। কিন্তু যদি পদে পদে বাধা দেয়া হয়? সবাই জানে, পানিতে রক্ত না থাকলে হাঙর আক্রমণ করে না। কবীর চৌধুরী হয়তো দ্বীপের চারদিকে রক্ত ছিটাবার ব্যবস্থা করে রেখেছে।

দরজায় নক করে ভেতরে ঢুকল মাধু গোপালান। টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে একটা বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজে রয়েছে লংফেলো। কফির কাপটা হাতে নিয়ে চেয়ার ছাড়ল রানা, তার পাশে এসে দাঁড়াল।

'আলো জ্বেলে কাজ করছে ওরা,' রিপোর্ট করল মাধু। 'প্রতি আড়াই মিনিটে এখনও নামছে একটা করে খাঁচা। হিসেব করে দেখলাম, দশ ঘণ্টা লাগবে ওদের লোড শেষ করতে। ভোর চারটের দিকে শেষ হবে। তারমানে ছ'টার আগে নোঙর তুলতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'কেন?'

'ভাল করে আলো না ফুটলে রীফ পেরোবে কিভাবে? প্যাসেজটা সরু না!' চকচকে চোখে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল মাধু, নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে ও।

'দশটায় রওনা হব আমি,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'বীচের বাঁ দিকে কিছু পাথর আছে, ওখান থেকে।'

উত্তেজনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মাধুর চেহারা। মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল লংফেলো। রানাকে বাধা দিল না সে, উৎসাহও দিল না।

'ডিনারের ব্যবস্থা করো, মাধু,' বলল রানা। 'তারপর ইকুইপমেন্টগুলো লনে নিয়ে গিয়ে রাখো। ওখানে পৌঁছুতে আধ ঘণ্টা লাগবে আমার।' আঙুলের গাঁট গুনল ও। 'ফিউজগুলো সেট করবে পাঁচ থেকে আট ঘণ্টা মেয়াদে। শুধু একটা ফিউজ ইমার্জেন্সীর জন্যে পনেরো মিনিটে সেট করো। ঠিক আছে?'

'ইয়েস, ক্যাপটেন,' বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল মাধু। 'সব আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন, ক্যাপটেন।' কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে।

টেবিলে কফির কাপ নামিয়ে রাখল রানা, লংফেলোকে বলল, 'কফির বদলে আমাকে খানিকটা হুইস্কি দিতে পারেন?'

'অবশ্যই,' বলে তাড়াহুড়ো করে একটা গ্লাসে এক আউন্স হুইস্কি ঢালল লংফেলো। গ্লাসটা তার কাছ থেকে নিয়ে এক চুমুকে খেয়ে ফেলল রানা।

'এবার বলুন,' জানতে চাইল ও, 'ফেরার সময় হলে ঠিক কি করে ওরা। দ্বীপ থেকে সরে গিয়ে রীফ পেরোতে কতটা সময় নেয়? এবার যদি সত্যি ওরা পাততাড়ি গুটিয়ে কেটে পড়তে চায়, তাহলে অতিরিক্ত বারোজন নিগ্রোকেও ইয়টে তুলে নেবে। গোটা ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করে বলুন।'

কাজে একবার মন দেয়ায়, সমস্ত ভয় কোথায় উবে গেল নিজেও বলতে পারবে না রানা। কঠোর বাস্তববাদী হয়ে উঠল ও, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে লংফেলোর কাছ থেকে যা জানার জেনে নিল সব।

কাঁটায় কাঁটায় রাত দশটায় একটা ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে নেমে পড়ল পানিতে। কাছে পিঠে অনেক পাথর ছড়িয়ে রয়েছে, সেগুলোর পাশ দিয়ে হেঁটে গেল রানা। তারপর ডুব দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল পানির তলায়।

হাত দুটো শক্ত মুঠো হয়ে আছে মাধুর, একটা পাথরের আড়ালে বসে বিড়বিড় করল সে, 'প্রার্থনা করি আপনি সফল হোন, আপনার মঙ্গল হোক।' চোখ বুজে বুকে ক্রস চিহ্ন আঁকল সে। চোখ মেলে দেখল পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে পিছু হটছে লংফেলো, তাকে অনুসরণ করল সে।

বাড়িতে ফিরে এসে ঘুমাতে গেল মাধু, প্রথম দু'ঘণ্টা পাহারায় থাকবে

লংফেলো।

জানালার সামনে বসে বাইরে তাকিয়ে আছে লংফেলো, উদ্বেগে থমথম করছে তার চেহারা। বিছানায় ছটফট করছে মাধু, ঘুম আসছে না।

ছয়

লিমপেট মাইনগুলো টেপ দিয়ে বুকে আটকে নিয়েছে রানা। পিঠে কমপ্রেসড-এয়ার সিলিন্ডার রয়েছে, ওটাকে ঠিকমত ব্যাল্যান্স করার জন্যে কোমরে একটা লেড-বেল্ট পরতে হয়েছে ওকে। এ-সব সাথে থাকায় ডুব দেয়ার পরপরই তলিয়ে গেল ও।

কোথাও মুহূর্তের জন্যে থামল না রানা, বালিময় খোলা মাঠ ধরে প্রথম পঞ্চাশ গজ ক্রল করার ভঙ্গিতে পেরিয়ে এল। পায়ে রাবারের ফিন থাকায় সাঁতারের গতি বেড়ে দ্বিগুণ হবার কথা, কিন্তু অন্যান্য বোঝার সাথে বাঁ হাতে হারপুন গান থাকায় গতি বাড়ল না। তবু প্রথম মিনিটে অনেক দূর চলে এল ও। লম্বা লম্বা প্রবাল প্রাচীরের সামনে এসে থামল, বিশ্রাম নেয়ার ফাঁকে চারদিকটা ভাল করে দেখে নেবে।

চারপাশে ছোট ছোট মাছের ঝাঁক, ওকে ঘিরে ঘুরছে। দু'একটা মাছের গায়ে বৈদ্যুতিক আলো দেখা গেল। আপনমনে হাসল রানা। কোথায় হাঙর! নিজের অজান্তেই ঢিল পড়ল পেশীতে।

রাবার স্যুটের ভেতর শরীরটা বেশ গরম লাগছে। পিঠে রোদ নিয়ে সাঁতার কাটলে যতটুকু গরম লাগে তারচেয়ে বেশি। হাত-পায়ে আড়ষ্ট কোন ভাব নেই, শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক। লক্ষ করল, রূপালি বুদ্বুদগুলো ঝাঁক বেঁধে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে। ওগুলোকে থামাবার কোন উপায় নেই, শুধু আশা করা যেতে পারে সারফেসের ঢেউ ওগুলোকে লুকিয়ে রাখবে।

খোলা জায়গায় বেশ ভাল দেখতে পাচ্ছে ও। চাঁদের আলো ম্লান আর দুধের মত ঘোলাটে হলেও, সাদা বালিতে প্রতিফলিত হয়ে সাগরের তলা মৃদু আলোকিত করে রেখেছে। কিন্তু সারি সারি প্রবাল প্রাচীরের ভেতর, চাঁদের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে না—পাথরের নিচে ছায়াগুলো কালো আর নিবিড়, দৃষ্টি চলে না।

কয়েক সেকেন্ডের জন্যে একটু ঝুঁকি নিল রানা। পেন্সিল টর্চ জ্বেলে দ্রুত চোখ বুলাল চারদিকে। চাঁদোয়ার মত ঝুলে থাকা প্রবালের সিলিং সাথে সাথে জ্যান্ত হয়ে উঠল। সাগরের গোছা গোছা রক্ত লাল ফুল ওর দিকে ঢেউ খেলিয়ে বাড়িয়ে দিল সারি সারি মখমল শুঁড়। ঝাঁক ঝাঁক সি-এগ হঠাৎ চমকে উঠে নাড়তে শুরু করল ইস্পাত-কঠিন শিরদাঁড়া। প্রকাণ্ড একটা লোমশ সাগরবিছার একশো পা স্থির হয়ে গেল, চোখহীন মাথাটা প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে উঁচু করল সে। ঝাড়বাতির মত ঝুলে

থাকা প্রবালঝুরির নিচে, বালিতে, কাছিম আকৃতির একটা ব্যাঙ কুৎসিত গলাটা ধীরে ধীরে মাংসের ভাঁজে লুকিয়ে ফেলল। ফুলের মত দেখতে ঝাঁক ঝাঁক সাগর-পোকা সহস্র ফাঁক-ফোকর দিয়ে ঢুকে গেল প্রবালের ভেতর। অলঙ্কার পরা এক ঝাঁক প্রজাপতি, আর অ্যাঞ্জেল ফিশ আলোর সামনে দিয়ে ছুটে গেল। একটা লম্বা স্টার-ফিশ দেখল রানা, তার শিরদাঁড়া লম্বা, বাঁকানো সিঁড়ির মত, কিন্তু চ্যাপ্টা।

টর্চ নিভিয়ে বেল্টে গুঁজে রাখল রানা।

মাথার ওপর সাগরের সারফেস যেন রূপালি পারদের তৈরি শামিয়ানা। রূপালি চাদরে প্রতি মুহূর্তে নরম রেখা ফুটছে, যেন সসপ্যানে ফুটছে সাদা চর্বি। সামনে, খানিক দূরে, গভীর উপত্যকায় ম্লান চাঁদের আলো নেমেছে। ওদিকে ক্রমশ নিচে নেমে গেছে সাগর-তল, ওই পথেই যেতে হবে রানাকে। প্রবালের আশ্রয় থেকে ধীরে ধীরে বেরোল ও, এক পা এক পা করে সামনে এগোল। এখান থেকে পথ আর সহজ নয়। যত নিচে নামবে, ততই কমে আসবে আলো। নিবিড় ছায়া আর গাঢ় অন্ধকারে দৃষ্টি চলে না। পথ মনে করে বিপথে চলে যাওয়া বিচিত্র নয়। সারি সারি প্রবাল অনেক ফাঁদ পেতে রেখেছে, অনেকদূর হেঁটে যাবার পর দেখা যাবে সামনে যাবার আর পথ নেই, বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীর।

মাঝে মধ্যে সারফেসের কাছাকাছি উঠে আসতে হলো রানাকে, প্রবাল প্রাচীর ডিঙিয়ে আবার নামতে হলো বালি চিকচিকে তলদেশে। প্রতিবার সারফেসের কাছাকাছি এসে চাঁদটা কোথায় দেখে নেয়ার সুযোগ হলো। এগোবার পথে কয়েকটা পাথুরে ডুবো-পাহাড় পেল রানা, প্রতিটির গায়ে হেলান দিয়ে দু'চার মিনিট করে বিশ্রাম নিতে পারল।

এখনও বড় কোন মাছের দেখা নেই, তবে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসা গলদা-চিংড়িগুলোকে বিশাল এবং প্রাগৈতিহাসিক বলে মনে হলো, পানি আসলে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের কাজ করছে। ওগুলোর লাল চোখ কটমট করে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে, এক ফুট লম্বা দাঁড়া নেড়ে যেন পাসপোর্ট আছে কিনা জিজ্ঞেস করল। দু'একটা খুব ভয়-তরাসে, রানার বাদুড়-আকৃতি দেখে সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে গর্তের দিকে পিছু হটল, আটটা লোমশ পা দাগ রেখে গেল বালিতে। একবার পর্তুগীজে ম্যান-অভ-ওয়রের বিশাল একটা ঝাঁক ধীরগতিতে ভেসে গেল সামনে দিয়ে। ঝাঁকের একটা প্রান্ত পানির গা ছুঁয়ে আছে; অপর প্রান্তটা রানার মাথার কাছাকাছি। এদের একটা শুঁড় গায়ে লাগায় ম্যানাটি বে-তে তিন দিন ধরে অসহ্য জ্বালা সইতে হয়েছে রানাকে, মাধুর ধন্বন্তরি মলমও কোন কাজে লাগেনি। তাড়াহুড়ো করে একটা গুহার ভেতর ঢুকে পড়ল রানা, ঢুকেই বুঝল, ভুল করে ফেলেছে। স্রেফ অন্যায় অনুপ্রবেশ, গুহার মালিক সেটা এখন সহ্য করলে হয়।

কিন্তু না, দু'হাত লম্বা বান-মাছটা বিনা প্রতিবাদে রানার পায়ের ফাঁক গলে বেরিয়ে গেল।

খানিকপর বাইরে বেরিয়ে এসে আবার এগোল রানা। আরও কিছু ঈল মাছ দেখল ও—কোনটা সবুজ, কোনটা হলুদ। হঠাৎ দেখলে এগুলোকে সাপ বলে ভুল

হয়। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ব্লোফিশগুলো খয়েরি প্যাঁচার মত দেখতে. বিশাল সবুজ চোখে কোমল দৃষ্টি। হারপুনের ডগা দিয়ে একটার গায়ে খোঁচা দিল রানা। চোখের পলকে ফুলে উঠে ফুটবলের আকৃতি নিল সেটা. বিপজ্জনক একগাদা সাদা দাঁড়া বেরিয়ে এল গা ফুঁড়ে। শ্যাওলার চওড়া চাদর স্রোতের সাথে পতাকার মত নড়ছে. একবার একটার ঘন সবুজ ভাঁজে নিজেকে হারিয়ে ফেলল রানা। চাদর ছিঁড়ে যখন বেরিয়ে এল. দেখল সবুজ রঙে ঘোলা হয়ে গেছে আশপাশের পানি।

ভয় পেল রানা গাঢ় ছায়া দেখে। অন্ধকার. কিছুই দেখা যায় না. কিন্তু পানি আন্দোলিত হতে দেখে টের পাওয়া যায় ওখানে বড়সড় কিছু একটা নড়াচড়া করছে মাঝে মধ্যে মুরগির ডিম আকৃতির জোড়া চোখ অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল রানা. তাড়াতাড়ি সরে এল দূরে। বারবার পিছন ফিরে তাকাল ও. হারপুন গানের ট্রিগারে আঙুল। কিন্তু ট্রিগার একবারও টানতে হলো না. কারণ এখনও কেউ হামলা চালায়নি।

একশো গজ প্রবাল পেরোতে আধ ঘণ্টা লেগে গেল। ব্রেন-কোরালের গোল একটা স্তূপে এসে থামল রানা। প্রবালের সীমানা এখানেই শেষ. সামনের অন্তত একশো গজের মধ্যে ঘোলাটে সাদা পানি ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

ক্লান্তি এখনও স্পর্শ করেনি। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক। ক্ষুরের মত ধারাল প্রবাল জগৎ পিছনে ফেলে এসেছে ও. রাবার স্যুট কোথাও একটু ছেঁড়েনি।

সামনে অবশ্য অন্য ধরনের বিপদ থাকতে পারে। হাঙর আর ব্যারাকুডার বিচরণ ক্ষেত্র এখান থেকে শুরু। সারফেসে বুদ্বুদ দেখে কবীর চৌধুরীর পাহারাদাররা ডিনামাইটের একটা স্টিক ফেলতে পারে পানিতে।

হাঙর বা ব্যারাকুডা নয়. নয় ডিনামাইট. এমনকি বিষাক্ত কোন সাপও নয়. আক্রমণ করল স্বপ্নে দেখা সেই বিভীষিকা। সামনে তাকিয়ে বিপদের সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে রানা, অক্টোপাসটা জড়িয়ে ধরল ওকে। ওটার প্যাঁচের মধ্যে আটকা পড়ল দুটো গোড়ালি।

বালিতে পা রেখে বসেছিল রানা, হঠাৎ করে লোহার বেড়ি পরিয়ে কেউ যেন প্রবালের গোল স্তূপের সাথে চেপে ধরল ওগুলো। কি ঘটছে বুঝতে পারার আগেই, আরেকটা শুঁড় ওর পা বেয়ে ওপর দিকে উঠতে শুরু করে দিয়েছে, অন্য একটা নেমে যাচ্ছে বাঁ পায়ের রাবারের পাতা বেয়ে।

শিউরে উঠে এক লাফে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা. পা ছুঁড়ে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু লোহার মত শক্ত শুঁড়ের বেড়ি এমন কঠিনভাবে পেঁচিয়ে আছে পায়ে. এক ইঞ্চি নাড়া গেল না। বরং দাঁড়িয়ে পড়ে অক্টোপাসকে সুবিধে করে দিল ও. গোল পাথরের ঝুলে থাকা অংশের সাথে আরও শক্তভাবে আটকে গেল পা দুটো।

হিংস্র প্রাণীটার প্রচণ্ড শক্তি অনুভব করে আতঙ্কিত হয়ে উঠল রানা। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে ও. যে-কোন মুহূর্তে বালিতে মুখ থুবড়ে পড়বে। আর একবার যদি ধরাশায়ী হয়. পিঠে সিলিন্ডার এবং বুকে মাইন থাকায়. শত্রুর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না ও।

বেল্ট থেকে ড্যাগারটা ছোঁ দিয়ে নিয়ে দুই পায়ের ফাঁকে চালিয়ে দিল রানা। ঝুল পাথর থাকায়, এবং রাবার স্কিন কেটে যাবার ভয়ে, কোপটা মোটেও জোরে মারা গেল না। আচমকা হুমড়ি খেয়ে পড়ল ও, বালির ওপর লম্বা হয়ে থাকল। প্রায় সাথে সাথে টান পড়ল পায়ে, পাথরের গায়ে হাঁ করে থাকা চওড়া একটা গুহার ভেতর টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওকে। এলোপাতাড়ি বালি আঁচড়াতে লাগল রানা, শরীরটাকে কুণ্ডলী পাকাবার চেষ্টা করল, যাতে ছোরা ধরা হাতটা অক্টোপাসের নাগাল পায়। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল বুকে উঁচু হয়ে থাকা মাইনের বোঝাটা। আতঙ্কের মধ্যেও হারপুন গানের কথা মনে পড়ল রানার। এত কাছ থেকে ওটা কোন কাজে লাগবে না ভেবে ওটার কথা ভুলে ছিল ও। এখন মনে হলো, ওটাই একমাত্র আশা।

বালিতে যেখানে রেখেছে সেখানেই ওটা পড়ে রয়েছে। একটা গড়ান দিতে শুরু করে নাগালের মধ্যে পেয়ে গেল ওটাকে। এক ঝটকায় ওপরে তুলে দিল সেফটি-ক্যাচ। লক্ষ্যস্থির করতে গিয়ে আবারও বাধা হয়ে দাঁড়াল মাইন। দু'পায়ের মাঝখানে হারপুনটা লম্বা করে দিল ও, পায়ের আঙুলে ডগার স্পর্শ নিল, যাতে দুই পায়ের মাঝখানের ব্যবধান আন্দাজ করা যায়। পরমুহূর্তে একটা শুঁড় ইস্পাতের ডগা পেঁচিয়ে ধরে টানতে শুরু করল। শুঁড় পেঁচানো পায়ের ওপর দিয়ে পিছলে নেমে যেতে লাগল হারপুন গান। আতঙ্কে অস্থির হয়ে ট্রিগার টিপে দিল রানা।

পাথরের গা থেকে মোচড় খেতে খেতে ওর মুখের দিকে এগিয়ে এল আঠাল কালির একটা বিশাল মেঘ। একটা পা মুক্ত হয়েছে, সেটা টেনে নিতে গিয়ে রানা বুঝল দ্বিতীয় পা-টাও কিছুতে আটকাচ্ছে না। হাঁটু ভাঁজ করে পেটের নিচে নিয়ে এল পা দুটো। তিন ফুটি হারপুন পাথরের নিচে ঢুকে গেছে, হাতল ধরে টান দিল রানা। গুহার মুখে কালো কালি, মাংস ছেঁড়ার শব্দ সহ ভেতর থেকে বেরিয়ে এল হারপুন। হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়াল রানা, সতর্ক পায়ে পিছিয়ে এল পাথরের কাছ থেকে, মাস্কের ভেতর গাল বেয়ে ঝরঝর করে ঘাম ঝরছে।

রূপালি বুদ্বুদগুলো অবিরাম উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে, দেখতে পেয়ে কার ওপর কে জানে আক্রোশে দাঁত চাপল রানা।

আর সময় নষ্ট করা চলে না। হারপুন গান আবার লোড করল রানা। ডান কাঁধে চাঁদকে নিয়ে আবার এগোবার জন্যে তৈরি হলো।

নতুন পথে খুব সহজেই এগোতে পারল রানা, লম্বা আকৃতি নিয়ে প্রায় বালি ছুঁয়ে থাকল শরীরটা। বারবার পিছন ফিরে তাকাল, পাশ কাটিয়ে আসা গুহাগুলো থেকে কিছু বেরিয়ে এসেছে কিনা দেখার জন্যে। সামনে দিয়ে বৈদ্যুতিক আলোর এক ঝাঁক কণা সরে গেল, কোন এক ধরনের অচেনা মাছের লেজ থেকে বেরোচ্ছে। কুলো আকৃতির লতা-পাতা দেখা গেল সামনে, সেগুলোর ভেতর দিয়ে এগোতে সাহস হলো না। বালি ছেড়ে খানিকটা ওপরে উঠে জায়গাটা পেরোবার সময় লক্ষ করল, পাতাগুলো ঝাঁকি খেয়ে কাঁপতে শুরু করেছে। সন্দেহ নেই, ওগুলোর আড়ালে নিশ্চয়ই কিছু লুকিয়ে আছে। হাঙর আর ব্যারাকুডার কথা

একরকম ভুলেই গেছে ও. মন জুড়ে রয়েছে অক্টোপাস আতঙ্ক।

এদিকে সব বড়বড় মাছ, কোন কোনটা ওর চেয়েও বড়। দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল রানা, বিশেষ গুরুত্ব দিল না। প্রায় মিনিটখানেক ধরে ওর সাথে এগোল একটা মাছ, সারাক্ষণ ওর কাছ থেকে দশ গজ ওপরে থাকল। সন্দেহ হতে ভাল করে তাকাতেই দেখে, সাধারণ কোন মাছ নয়। সাদা পেট দেখেই বুঝল রানা, হাঙর।

রানার বুদ্বুদে ভোঁতা নাক লুকিয়ে রেখেছে হাঙরটা। চওড়া কাস্তে আকৃতির মুখ ঘন ঘন হাঁ করছে আর বন্ধ করছে। শরীরটা কাত করে নিচে, ওর দিকে একচোখে তাকাল একবার। অচেনা আগন্তুক সম্পর্কে কি ধারণা করল কে জানে, ধীরে ধীরে দূরে সরে গেল, নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল ঘোলা পানিতে।

গোটা একটা স্কুইড পরিবারকে ভয় পাইয়ে দিল রানা। ছয় আউন্সের শিশু থেকে ছয় পাউন্ডের বয়স্ক পর্যন্ত এক লাইনে প্রায় খাড়াভাবে ঝুলছে, আধো অন্ধকারে ভঙ্গুর আর আলোকিত দেখাল। রানাকে এগোতে দেখে একযোগে শোয়ার ভঙ্গিতে লম্বা হলো, তারপর তীরবেগে দূরে সরে যেতে শুরু করল। একসময় মিলিয়ে গেল রেখাটা।

অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এসেছে রানা, খানিক বিশ্রাম নিয়ে আবার রওনা হলো। এতক্ষণে ব্যারাকুডার দেখা পাওয়া গেল, বড়গুলো বিশ পাউন্ডের কম নয়। ওর কল্পনায় যেরকম ভয়ঙ্কর, ঠিক সেরকমই দেখাল ওগুলোকে। ওর মাথার ওপরে এদিক থেকে ওদিকে সাবমেরিনের মত ঘোরাঘুরি করতে লাগল, খেপা বাঘের চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ওকে আর ওর বুদ্বুদ দেখে কৌতূহল জেগেছে, পিছু ছাড়ছে না। শুধু ওপরে নয়, এরপর ওরা রানার চারপাশেও ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত ঘুর ঘুর করতে শুরু করল। নতুন করে প্রথম দফা প্রবালের দেখা পেল রানা, তারমানে দ্বীপের কাছাকাছি চলে এসেছে ও। ইতোমধ্যে সংখ্যায় বাড়তে বাড়তে বিশ-বাইশে দাঁড়িয়ে গেছে ব্যারাকুডা। নিঃশব্দে নড়াচড়া করছে ওগুলো, তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করছে। কালো রাবারের ভেতর গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল রানার। ব্যারাকুডারা তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে ওকে।

কিছুই করার নেই। এখন থামা মানে ওগুলোর সহজ শিকারে পরিণত হওয়া। এতগুলো ব্যারাকুডার বিরুদ্ধে হারপুন গান বা ড্যাগার কোন কাজেই আসবে না। হঠাৎ করেই মাথার ওপর লম্বা একটা ধাতব আকৃতি ঝুলে থাকতে দেখল ও। ওটার পিছনে ক্ষতবিক্ষত পাথর ক্রমশ প্রায় খাড়াভাবে ওপর দিকে উঠে গেছে।

আল-আমিনের খোল, চিনতে অসুবিধে হলো না। রানার বুকের ভেতর অস্বাভাবিক শব্দ করছে হৃৎপিণ্ড। শেষ পর্যন্ত কাছে এসেও পৌঁছতে পারবে না?

মাস্কের সামনে কব্জি তুলে রোলেক্স ঘড়ি দেখল রানা। এগারোটা তিন। সাইড পকেটের চেইন খুলে কয়েকটা ফিউজ বের করল ও। বেছে নিল সাত ঘণ্টা মেয়াদে যেটা সেট করা রয়েছে।

ব্যারাকুডার দল আছে, ভাগ্য যে আরও কাছে আসার চেষ্টা করছে না। মাইন

বের করে সেটার পকেটে ফিউজটা ঢুকিয়ে দিল রানা। বাকি ফিউজগুলো বালিতে পুঁতে রাখল ও, কারও হাতে ধরা পড়লেও মাইনের ব্যাপারটা যাতে ফাঁস না হয়

সাঁতরে ওপরে উঠতে শুরু করল রানা, দু'হাতে ধরে আছে মাইনটা। পিছনের পানিতে কিসের যেন আলোড়ন। তীরবেগে পাশ কাটিয়ে গেল একটা ব্যারাকুডা রানাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে। হাঁ হয়ে আছে চোয়াল, তাকিয়ে আছে রানার পিছনে। কিন্তু রানার সমস্ত মনোযোগ ইয়টের দিকে। খোলের মাঝামাঝি একটা জায়গায় তাকিয়ে আছে ও।

শেষ কয়েক ফিট রানাকে প্রায় টেনে নিয়ে গেল মাইনটা, ধাতব খোল প্রচণ্ডবেগে টানল ম্যাগনেটকে। সংঘর্ষের ফলে আওয়াজ হবে, জোর খাটিয়ে হাতের ভেতর মাইনটাকে ধরে রাখল রানা। আস্তে আস্তে মুঠো আলগা করতে খোলের গায়ে নিঃশব্দে সেঁটে গেল সেটা। ভারমুক্ত হয়ে সারফেসের কাছ থেকে দ্রুত নিচে নেমে এল রানা।

খানিক নিচে নেমে ঘুরল ও, জোড়া প্রপেলারের দিকে এগোল। ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে দ্বীপের পাথুরে ভিতে আশ্রয় নেবে। ঘুরতেই চোখের কোণে ধরা পড়ল পিছনের ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা।

মনে হলো ব্যারাকুডার বিরাট দলটা উন্মাদ হয়ে গেছে। পাগলা কুকুরের মত ছুটোছুটি শুরু করেছে ওগুলো। কোনটা কোনদিকে কোথায় কেন ছুটছে কিছুই বোঝার উপায় নেই। হতভম্ব রানা বিপদটা ভাল করে টের পাবার আগেই দেখল, নিরাপদ জায়গায় সরে যাবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। হিংস্র প্রাণীগুলো ওর চারদিকে এলোপাতাড়ি লাফালাফি করছে। এই সময় তিনটে হাঙর এসে জুটল, খোলা চোয়াল নিয়ে ঝাঁক ঝাঁক ব্যারাকুডার মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওগুলো।

একটা লেজের বাড়ি খেলো রানা, ধাক্কাটা সামলে ওঠার আগেই তীরবেগে ছুটে যাওয়া একটা হাঙরের কর্কশ পেট ঘষা দিয়ে গেল পিঠে। হামলাটা ওর ওপর নয়, বুঝল রানা, কিন্তু ব্যারাকুডা আর হাঙরের উন্মত্ত লাফ-ঝাঁপের মাঝখানে পড়ে গেছে ও। সঙ্গত কারণেই মৃত্যুভয় জাগল মনে। যে-কোন মুহূর্তে মাংস সহ ছিঁড়ে ঝুলে পড়তে পারে রাবার স্যুট। তাহলে আর রক্ষে নেই, সাথে সাথে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে হিংস্র প্রাণীগুলো।

ঘন ঘন ঝাপটা আর ধাক্কায় কয়েক ফিটের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে রানা। এই পরিস্থিতিতে হারপুন গান কোন কাজে আসবে না। সাথে শার্ক রিপেলেন্ট থাকলে হয়তো বাঁচার একটা আশা ছিল।

মরিয়া হয়ে হারপুন গানের সেফটি-ক্যাচ অফ করল রানা। সুযোগের অপেক্ষায় থাকল, সম্ভব বলে মনে হলেই ইয়টের খোলের দিকে সরে যাবে। সুযোগ এল বটে, কিন্তু এরকম সুযোগ চায়নি ও।

ধাড়ী একটা হাঙর পাশ কাটাবার সময় বাড়ি দিল লেজ দিয়ে, শিরদাঁড়া যেন ভেঙে গেল রানার। ছিটকে ইয়টের খোলের ওপর পড়ল ও, পিঠের ব্যথায় অন্ধকার দেখল চারদিকে। এখন জ্ঞান হারানো মানে অবধারিত মৃত্যু। হাত-পা অসাড় হয়ে

এল ওর. মনে হলো তলিয়ে যাচ্ছে. কিছুই পরিষ্কারভাবে চিন্তা করতে পারছে না।

সমস্ত চেতনা এক করে হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে হাতড়াতে লাগল রানা। দম আটকে গিয়েছিল. আবার নিঃশ্বাস পড়ল। কি যেন ঠেকল হাতে। ধীরে ধীরে চোখ মেলল ও। মাস্কের ভেতর হাঁপাচ্ছে। দাঁতের ওপর থেকে সরে গেছে ঠোঁট—ভয়ে। বড়সড় তামার একজোড়া স্ক্রু ধরে রয়েছে ও। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। উন্মত্ত ছুটোছুটি আগের মতই চলছে।

পিঠ বাঁকা হয়ে আছে রানার. সিধে করতে গিয়ে ব্যথা পেয়ে গুঙিয়ে উঠল। তবু ভাগ্য ভাল. শিরদাঁড়াটা ভাঙেনি। শিরদাঁড়ার দু'পাশে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে তীব্র জ্বালা করছে। লেজের বাড়ি খেয়ে মাংস বোধহয় ফুলে উঠেছে ওখানে।

বিস্ফারিত চোখে সামনে তাকিয়ে থাকল রানা। প্রতিটি পিশাচের মুখ আধখোলা. খয়েরি একটা মেঘকে লক্ষ্য করে ছুটে যাচ্ছে ওগুলো। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর প্যাটার্নটা ধরা গেল। ছুটে এসে ওই মেঘের ভেতর ঢুকছে. বেরিয়ে গিয়ে ঘুরছে. ফিরে এসে আবার ঢুকছে।

খয়েরি মেঘের বিস্তৃতি লক্ষ্য করল রানা। ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে ওটা. নেমে আসছে সারফেস থেকে। রানার কাছাকাছি পলকের জন্যে থামল একটা ব্যারাকুডা. খয়েরি কি যেন একটা চকচক করছে তার চোয়ালের মাঝখানে। পরমুহূর্তে আবার ঘূর্ণির ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওটা।

প্রায় একই সময়ে রানা লক্ষ করল. চারদিক কালো হয়ে আসছে। চাঁদ কি মেঘের আড়ালে চলে গেছে? মুখ তুলতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। মাথার ওপর শামিয়ানাটা এখন আর রূপালি নয়. লাল দেখাচ্ছে।

রানার চারপাশে খয়েরি সুতো ভাসছে। হারপুন গানের ডগা দিয়ে কয়েকটা সুতো বাধিয়ে চোখের সামনে টেনে আনল ও। ভাল করে দেখল।

আর কোন সন্দেহ রইল না।

ওপর থেকে রক্ত আর রক্তাক্ত আবর্জনা ফেলছে কেউ!

সাত

সারপ্রাইজকে ঘিরে হাঙর আর ব্যারাকুডারা কেন ঘুরঘুর করে. বোঝা গেল। পানিতে রক্ত ফেলে রোজ রাতে ওগুলোকে পাগল করা হয়। তিনজন লোককে কেন খেয়ে ফেলেছিল হাঙর. কারণটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

রানার অনুমানই ঠিক। দ্বীপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে সাগরের শক্তিকে কাজে লাগাচ্ছে কবীর চৌধুরী। এতে তার কল্পনা আর উদ্ভাবনী ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। সহজ একটা কৌশল. কারিগরি দিক থেকে নিখুঁত. প্রয়োগে কোন জটিলতা নেই।

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে রানা. হঠাৎ কাঁধে প্রচণ্ড একটা বাড়ি খেলো। বিশ

সেরী একটা ব্যারাকুডা দ্রুত পিছিয়ে গেল, চোয়াল থেকে কালো রাবার আর মাংস ঝুলছে।

মরিয়া হয়ে উঠল রানা। রাবার স্যুট ছিঁড়ে যাওয়া মানে বারুদের সলতেতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে, এখন শুধু বিস্ফোরণের অপেক্ষা। এতগুলো হিংস্র প্রাণীর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হলে কোন মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এখনও কোন ব্যথা অনুভব করছে না ও। তামার স্ক্রু ছেড়ে দিল, উন্মাদের মত সাঁতরে পাথরের কাছে পৌছতে চেষ্টা করল।

কল্পনার চোখে দেখল হাজার হাজার ধারাল ক্ষুর ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে ওকে। গায়ের সাথে আঁটসাঁট হয়ে আছে রাবার স্যুট, তবু রাবার আর চামড়ার মাঝখানে পানি ঢুকছে।

অপ্রত্যাশিত, নতুন একটা বিপদ হয়ে দেখা দিল ব্যাপারটা। ধীরে ধীরে গলা পর্যন্ত উঠে আসবে পানি, তারপর মাস্কের ভেতর ঢুকবে।

আতঙ্কে দিশেহারা বোধ করল রানা। দ্বীপের পাথুরে ভিতের কাছে পৌছনো সম্ভব বলে মনে হলো না। হাল ছেড়ে দেবে কিনা ভাবল। বিশ ফিট ওপরে উঠলেই পানির বাইরে মাথা তোলা যায়। এই সময় ওর সামনের পাথরে চওড়া একটা ফাটল দেখল ও। ফাটলের পাশেই বড়সড় একটা বোল্ডার।

বোল্ডারের পিছনে কিভাবে এল বলতে পারবে না রানা। কোনরকম একটা আশ্রয় পেয়ে ঘুরল ও, দেখল সেই একই ব্যারাকুডা আবার ফিরে আসছে। সহজ শিকার মনে করে হাঁ করে আছে, প্রায় অন্ধকারেও ঝকঝক করছে সারি সারি দাঁত।

আন্দাজে, প্রায় অন্ধের মত, হারপুন গানের ট্রিগার টেনে দিল রানা। কাঁটা বসানো হারপুন ব্যারাকুডার ওপরের চোয়ালে গিয়ে বিঁধল। হাতলের অর্ধেক গেঁথে গেছে মাংসের ভেতর, লাইনটা রানার হাতে।

ওখানেই থেমে গেল ব্যারাকুডা, রানার পেট থেকে তিন ফিট দূরে। চোয়াল দুটো এক করার চেষ্টা করল, মাথা ঝাঁকাল প্রচণ্ডবেগে। একটা ডিগবাজি খেলো, এঁকেবেঁকে ছুটল উল্টোদিকে। একটা ঝাঁকি খেলো রানা, হাত থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল হারপুন গান আর লাইন।

এখুনি ওটাকে নিয়ে অন্যান্য মাছেরা মহোৎসব শুরু করে দেবে। একশো গজও যেতে পারবে না, ছিঁড়ে কয়েকশো টুকরো করে ফেলবে।

একটা ডাইভারশন তৈরি হয়েছে। অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিল রানা।

কাঁধটাকে এখন রক্তের একটা মেঘ ঘিরে আছে। আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড, তারপরই তাজা রক্তের গন্ধ পেয়ে যাবে মাছেরা। বোল্ডারটাকে মাঝখানে রেখে ঘুরতে শুরু করল রানা, আশা সারফেসের কাছাকাছি উঠে জেটির নিচে যদি আশ্রয় নিতে পারে। নিরাপদ একটা আশ্রয় এখন খুবই দরকার ওর। নতুন কোন প্ল্যান মাথায় না আসা পর্যন্ত সি-লেভেলের নিচে কোথাও নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়।

বোল্ডারের আড়ালে ছিল, হঠাৎ গুহাটা দেখতে পেল রানা। দ্বীপের ভিতের ভেতর ঢোকার প্রায় একটা দরজাই বলা চলে গুহা-মুখটাকে। প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে

রানা। তা না হলে হেঁটেই ভেতরে ঢুকত। তার বদলে, সোজাসুজি ফাঁকটা লক্ষ্য করে ডাইভ দিয়ে পড়ল ও। কয়েক গজ এগিয়ে থামল, ঘুরে তাকাল পেরিয়ে আসা প্রবেশ পথের দিকে।

গুহার ভেতর গাঢ় অন্ধকার, ক্ষীণ আলোকিত প্রবেশ পথটা কোন রকমে ঠাহর করা যায়। নরম বালিতে পা রেখে সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা, বেল্ট থেকে টর্চ নিয়ে বোতাম টিপল। পিছু নিয়ে একটা হাঙর আসতে পারে, কিন্তু এই গুহার ভেতর মুখ ঢুকিয়ে ওর নাগাল পাওয়া সহজ হবে না। তীরবেগে ভেতরে ঢুকে পড়বে, তা সম্ভব বলে মনে হয় না। হাঙরের চামড়া শক্ত হলেও কর্কশ পাথরের ঘষা খাওয়ার ঝুঁকি এড়িয়ে চলে ওরা। আর যদি ঢুকেই পড়ে, ভাবল রানা, ড্যাগার দিয়ে চোখে খোঁচা দেয়া যাবে।

টর্চের আলোয় সিলিং, আর দেয়ালগুলো পরীক্ষা করল রানা। দেখেই বোঝা যায়, মানুষের তৈরি গুহা। দ্বীপের মাঝামাঝি কোথাও থেকে সুড়ঙ্গ কাটতে শুরু করে সাগরের সাথে মেলানো হয়েছে।

জলদস্যু মরগ্যানের জন্যে এটা কোন সমস্যা ছিল না, আন্দাজ করল রানা। কয়েকশো ক্রীতদাস ছিল তার। কে জানে, এই সুড়ঙ্গ তৈরি করিয়ে নিয়ে লোকগুলোকে সে হয়তো জ্যান্ত কবর দেয়। এ-ধরনের কোন ব্যাপার গোপন রাখার জন্যে তখনকার দিনে অত্যাচারীরা রোমহর্ষক নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিত। হয়তো দ্বীপের মাঝখানে সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল মরগ্যান, ক্রীতদাসরা সবাই সুড়ঙ্গের পানিতে দম বন্ধ হয়ে মারা যায়।

কেউ জানে না সারপ্রাইজে এরকম একটা সুড়ঙ্গ আছে। তারমানে ব্যাপারটা এতদিন গোপন ছিল। হয়তো আকস্মিকভাবে কবীর চৌধুরী ব্যাপারটা জেনে ফেলে। কিংবা অন্য কেউ জেনেছিল, তথ্যটা বের করে নিয়ে তাকে মেরে ফেলা হয়েছে।

এই গুহার সাথে কি গুপ্তধনের সম্পর্ক আছে? মরগ্যান কি তার সোনার মোহর লুকিয়ে রাখার জন্যে এই গুহাপথ ব্যবহার করেছিল?

উত্তেজনা বোধ করল রানা।

গুহামুখের বাইরে, সাগরে, বোল্ডারটা কেন রাখা হয়েছে? নিশ্চয়ই প্রবেশ পথটা আড়াল করার জন্যে? রানার মনে পড়ল, ছ'মাস আগে শার্ক বে-র এক জেলে হঠাৎ করে নিখোঁজ হয়ে যায়। হয়তো কোন ঝড়ে বা ঝড়-পরবর্তী তীব্র স্রোতের ধাক্কায় সরে গেছে বোল্ডার, অভাগা জেলের চোখে ব্যাপারটা ধরা পড়ে। তারপর হয়তো গুপ্তধন দেখতে পায় সে, বুঝতে পারে উদ্ধার করতে হলে সাহায্য দরকার তার। শ্বেতাঙ্গদের বিশ্বাস করা যায় না, ওরা বড় বেশি লোভী। শক্তিশালী, প্রভাবশালী কোন অশ্বেতাঙ্গ ব্যক্তির সন্ধানে থাকল সে। এমন সময় ইয়ট নিয়ে জ্যামাইকায় হাওয়া বদল করতে এল মি. ওয়াইজ নামে এক নিগ্রো। খোঁজ-খবর নিয়ে তরুণ জেলে জানল, নিউ ইয়র্কে, বিশেষ করে হারলেমে দ্বিতীয় সরকার বলতে মি. ওয়াইজ আর তার দলবলকেই বোঝায়। মি. ওয়াইজের সাথে দেখা

করল সে। তার উদার, মিষ্টি আচরণে মুগ্ধ হয়ে গেল। তথ্যটা একদিন ফাঁস করল সে, বলল, আধাআধি বখরা পেলে গুপ্তধনের সন্ধান দিতে রাজি আছে সে। মি. ওয়াইজ নূরানি হাসি হেসে বলল, 'বেশ তো, তাই হবে। খবরটা যখন তুমি এনেছ, অর্ধেকের বেশি দিতেও আমার আপত্তি নেই।'

গুপ্তধন কোথায় আছে দেখে আসা হলো একদিন। তারপর যা হবার তাই হলো, তরুণ জেলেকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলা হলো মাটিতে।

সম্ভব?

কবীর চৌধুরীর পক্ষে সবই সম্ভব। কয়েকশো কোটি টাকার গুপ্তধন, কাউকে ভাগ দিতে তার ভাল লাগবে কেন?

এই সব ভাবছে রানা, আর টানেলের ভেতর হালকা স্রোতে দাঁড়িয়ে একটু একটু দোল খাচ্ছে। এই সময় ড্রামের আওয়াজ শুনতে পেল।

বড় মাছগুলোর মাঝখানে পড়ে ঘুরপাক খাওয়ার সময় ভারী একটা আওয়াজ পেয়েছিল রানা, কিন্তু সেটাকে তখন ড্রামের আওয়াজ বলে চিনতে পারেনি। ভেবেছিল দ্বীপের ভিতে ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ।

ভুলটা এবার ভাঙল। নির্দিষ্ট একটা ছন্দ আছে আওয়াজটার, আগের চেয়ে স্পষ্ট আর ভারী। রানা অনুভব করল, আওয়াজের সাথে সাথে কাঁপছে পানি। ড্রাম বাজানোর রহস্যটা এতক্ষণে পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে।

এ এক ধরনের সঙ্কেত, মাছগুলোকে দ্বীপের কাছে ডাকার জন্যে ব্যবহার করা হয়। বহু কালের পুরানো একটা কৌশল, জেলেরা নৌকোর গায়ে হাত চাপড়ে মাছদের আকৃষ্ট করে। সেই একই ধারণা থেকে ড্রাম বাজানোর ব্যবস্থা করেছে কবীর চৌধুরী।

তারমানে, ভাবল রানা, কবীর চৌধুরী জানে দ্বীপে কেউ আজ ওঠার চেষ্টা করছে। ড্রামের আওয়াজ শুনে লংফেলো আর মাধু কি ভাবছে কে জানে। আপনমনে তিক্ত একটু হাসল রানা, নিশ্চয়ই ঘামতে শুরু করেছে ওরা। কিন্তু ও বিপদে পড়েছে মনে করে সাহায্য করার কোন চেষ্টা করবে না। রানা আগেই ধারণা করেছিল, ড্রাম বাজানো আসলে কোন এক ধরনের কৌশল হবে, তাই ওদেরকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে যাই ঘটুক না কেন, কোন অবস্থাতেই ওরা যেন নাক না গলায়। নাক গলাবে তখনই, যদি দেখে নিরাপদে কেটে পড়তে যাচ্ছে আল-আমিন। ইয়ট চলে যাচ্ছে দেখলে মনে করতে হবে রানার সমস্ত প্ল্যান ব্যর্থ হয়েছে। সোনার মোহর কোথায় লুকানো আছে লংফেলোকে জানিয়ে এসেছে রানা। তাকে নির্দেশ দেয়া আছে, খোলা সাগরে আল-আমিনকে বাধা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

শত্রু সতর্ক হয়ে গেছে বটে, কিন্তু ওর পরিচয় ওরা জানে না, জানে না ও এখনও বেঁচে আছে কিনা। ইয়টে ওকে উঠতেই হবে, কারণ আল-আমিনের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে গেছে। জেনেশুনে শিরিনকে মরতে দিতে পারে না ও। যে-কোন মূল্যে তাকে উদ্ধার করতে হবে।

হাতঘড়ি দেখল রানা। সাড়ে এগারোটা। মাত্র দেড় ঘণ্টা পানিতে রয়েছে ও, অথচ মনে হচ্ছে একের পর এক বিপদের মধ্যে পুরো একটা হপ্তা কাটিয়ে দিয়েছে।

রাবার স্কিনের ভেতর ল্যাগারের অস্তিত্ব অনুভব করল ও। স্যুটের ভেতর পানি ঢুকছে, ল্যাগারের মেকানিজম অচল হয়ে যায়নি তো?

প্রতি মুহূর্তে ড্রামের আওয়াজ বাড়ছে। প্রবেশ পথের দিকে পিছন ফিরে সুড়ঙ্গ ধরে ভেতর দিকে এগোল রানা। পেন্সিল টর্চের সরু একটা আলো পথ দেখাল ওকে।

দশ গজের মত এগিয়েছে, সামনের পানিতে ক্ষীণ একটা আলোর অস্পষ্ট আভা দেখা গেল। টর্চ নিভিয়ে সাবধানে ওটার দিকে এগোল রানা। গুহার বালিময় মেঝে ক্রমশ ওপর দিকে উঠতে শুরু করেছে, প্রতি গজ সামনে বাড়ার সাথে সাথে আলোটা বাড়তে লাগল। ওর আশপাশে রানা এখন দশ পনেরোটা ছোট মাছকে খেলা করতে দেখল। যত এগোল ততই বাড়তে লাগল ওদের সংখ্যা, গুহার আলোয় আকৃষ্ট হয়ে সাগর থেকে উঠে এসেছে। পাথুরে দেয়ালের ফাঁক-ফোকর থেকে উঁকি দিল কাঁকড়া, শিশু অক্টোপাস পথ ছেড়ে দিয়ে সিলিঙের গায়ে সেঁটে থাকল। আরও কিছুদূর এগিয়ে গুহার শেষ মাথায় পৌঁছে গেল রানা, সামনে চওড়া চকচকে একটা পুকুর মত, সাদা চকচকে বালির মেঝে দিনের মত আলোকিত। ড্রামের দ্রিম দ্রিম আওয়াজে কান এখন ঝালাপালা হবার যোগাড়। প্রবেশ মুখের ছায়ায় থামল রানা, দেখল পানির সারফেস মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে, উজ্জ্বল আলোয় পুকুরের অনেকদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে।

দ্বিধায় পড়ে গেল রানা। সামনে যদি আর এক পা-ও বাড়ে, পুকুরের দিকে কেউ তাকিয়ে থাকলে, সাথে সাথে দেখে ফেলবে ওকে। আচমকা শিউরে উঠল ও। চমকে উঠে দেখল, ওর কাঁধের ক্ষত থেকে বেরিয়ে এসে সিঁদুর-মাখা মেঘের মত ছড়িয়ে পড়ছে রক্ত।

ক্ষতটার কথা এতক্ষণ ভুলে ছিল রানা, ব্যথা শুরু হওয়ায় মনে পড়ে গেছে। হাতটা নাড়লেই সুচ বেঁধার যন্ত্রণা অনুভব করছে ও। শুধু রক্ত নয়, সিলিন্ডার থেকে বুদ্বুদগুলো প্রবেশ পথ দিয়ে পুকুরের ভেতর ঢুকছে। কি মনে করে কে জানে, হঠাৎ-ই এক পা পিছিয়ে এল রানা। আর ঠিক সেই সময় ঝপাৎ ঝপাৎ শব্দ করে পুকুরে পড়ল দু'জন নিগ্রো।

পরনে আন্ডারওয়্যার আর ফেস মাস্ক ছাড়া আর কিছু নেই, আত্মরক্ষার জন্যে রানা তৈরি হবার আগেই তারা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'জনের বাঁ হাতে একটা করে লম্বা ড্যাগার। তবু, আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা করল রানা। বেল্ট থেকে নিজের ড্যাগারটা বের করে ফেলল ও, কিন্তু ব্যবহার করার সুযোগ হলো না। দু'পাশ থেকে একসাথে ওর হাত দুটো ধরে ফেলল শত্রুরা, গায়ের জোরে টেনে নিয়ে চলল সারফেসের দিকে।

হাত দুটো মুক্ত নয়, ধস্তাধস্তি করা বৃথা। অসহায় বোধ করল রানা। ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিল নিজেকে। পুকুর থেকে সমতল বালিতে নিয়ে আসা হলো ওকে।

নিগ্রো দু'জন ধরে দাঁড় করাল, টান দিয়ে ছিঁড়ে খুলে নেয়া হলো রাবার স্যুট। মাথা থেকে হেলমেট, কাঁধ থেকে ছোঁ দিয়ে কেড়ে নেয়া হলো হোলস্টার। ছাল তোলা সাপের মত নগ্ন দাঁড়িয়ে থাকল রানা, পরনে খুদে সুইমিং-ট্রাঙ্কস ছাড়া কিছু নেই।

হেলমেট খুলে নেয়ার সাথে সাথে ড্রামের আওয়াজে কানে তালা লাগার উপক্রম হলো। এমন বিকট শব্দ, মনে হলো ওর শরীরের ভেতর আর চারপাশ থেকে তৈরি হচ্ছে। শুধু শরীর নয়, প্রতিটি শিরার ভেতর রক্তও কাঁপতে লাগল। এই বিস্ফোরণে গোটা জ্যামাইকার ঘুম ভেঙে যাবার কথা। সহ্য করতে না পেরে দাঁতে দাঁত চাপল রানা।

একজন নিগ্রো কাঁধে চাপ দিয়ে ঘোরাল ওকে। সামনে এমন একটা দৃশ্য, দ্রিম দ্রিম বিকট আওয়াজের কথা প্রায় ভুলে গেল রানা। বালির পর পাথুরে চাতাল, সেখানে একটা ফোল্ডিং চেয়ারে বসে রয়েছে কবীর চৌধুরী, তার সামনে টেবিল। টেবিলের ওপর একগাদা কাগজ। কবীর চৌধুরীর হাতে একটা কলম। চোখে-মুখে রাজ্যের নির্লিপ্ততা নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সে। তার পরনে নিখুঁতভাবে কাটা ট্রপিক্যাল স্যুট, সাদা শার্ট, কালো টাই। বাঁ হাতের কনুই টেবিলে, চওড়া চিবুক তালুর ওপর, রানার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন অধস্তন কোন কর্মচারী বেতন বাড়াবার আবদার নিয়ে এসেছে। শান্ত দেখাল তাকে, একটু যেন একঘেয়েমির শিকার।

চোখ জোড়া যেন অগ্নিগোলক, রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত পরখ করল। ক্ষীণ একটু হাসির রেখা ফুটল লালচে-কালো পুরু ঠোঁটে। 'গুড মর্নিং, মি. মাসুদ রানা,' বলল সে, মুখ খুলতেই ড্রামের আওয়াজ কি এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে ঢিমে হয়ে এল। 'সত্যি কথা বলতে কি, মাকড়সার কাছে আসতে বড় বেশি সময় নিল পোকা। তা পথে কোন অসুবিধে হয়নি তো? বলো, তোমার জন্যে কি করতে পারি আমি। কফি?' টেবিলে রাখা ধূমায়িত কাপের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'আমি অতিথিবৎসল নই, এ অভিযোগ কেউ করতে পারবে না। এই কফি তোমার জন্যেই আনিয়ে রেখেছি। হেলপ ইওরসেলফ, প্লীজ।'

কিন্তু নিজের জায়গা থেকে নড়ল না রানা।

চেয়ারে হেলান দিল কবীর চৌধুরী। 'শত্রুকে আমি কখনও আন্ডার এস্টিমেট করি না। তোমাকে তো নয়ই,' আবার বলল সে। 'জানতাম, চেষ্টা করলে একমাত্র তুমিই সারপ্রাইজে চলে আসতে পারো। কিন্তু রীফ পেরোবার পর গাদা গাদা বুদ্বুদ ছাড়লে কেন? আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল না কি?'

তারমানে, ভাবল রানা, অক্টোপাসের সাথে লড়তে গিয়ে ওদের চোখে ধরা পড়ে গেছে ও। কবীর চৌধুরীকে ছাড়িয়ে আরও সামনে চলে গেল ওর দৃষ্টি।

প্রকাণ্ড একটা পাথুরে গুহার ভেতর রয়েছে রানা। মেঝের অর্ধেকটা জুড়ে কৃত্রিম পুকুর, স্বচ্ছ সাদা তার পানি, শুধু আন্ডারওয়াটার টানেলের মুখের কাছে পানির রঙ নীলচে। সরু একটা বালির বিস্তৃতির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, বাকি মেঝে সমতল পাথরের তৈরি।

কবীর চৌধুরীর কাছ থেকে খানিকটা পিছনে সিঁড়িটা, ধাপে ধাপে উঠে গেছে ভল্টেড সিলিঙের দিকে, সিলিঙের গা থেকে ঝুলছে লাইমস্টোনের অসংখ্য ঝুরি। ঝুরিগুলোর সাদা বোঁটা থেকে অনবরত ফোঁটায় ফোঁটায় পানি ঝরছে পুকুরে।

চারদিকের দেয়ালে বারোটা আর্ক লাইট জ্বলছে, দিনের মত আলোকিত হয়ে আছে গুহার ভেতরটা। পাথুরে চাতালের এক ধারে দাঁড়িয়ে বা বসে রয়েছে বিশ-বাইশ জন নিগ্রো—সবার পরনে শুধু আন্ডারওয়্যার। এতক্ষণ কাজ করছিল ওরা. এখন হাত গুটিয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। দু'একজনের দিকে তাকাল রানা, ওদের মুখে নিষ্ঠুর হাসি দেখে চোখ ফিরিয়ে নিল।

ওদের আশপাশে পচা বাঁশ, মরচে ধরা লোহার বাক্স, শ্যাওলা ধরা লেদার; ছেঁড়া ক্যানভাস, ইত্যাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এ-সবের মাঝখানে আর্ক লাইটের উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে সোনার মোহরগুলো। মোহরের কয়েকটা স্তূপ দেখল রানা।

আরেক জায়গায় আগুন জ্বলছে। তিনটে ব্লো-ল্যাম্পের ওপর ঝুলছে একটা ধাতব কড়াই, তাতে সোনা গলানোর কাজ চলছে। নেকলেস, আঙটি, ব্রেসলেট, মুকুট, ছোট বড় মূর্তি, ক্রুশ, প্লেট, চেইন, ইত্যাদির বিরাট একটা স্তূপ দেখা গেল আগুনের পাশে।

আরেক জায়গায় বৈদ্যুতিক ঝালাই মেশিন দেখা গেল। ইস্পাতের মত দেখতে, কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি ফাঁপা পাইপের ভেতর মোহর ভরার পর, মুখ দুটো ঝালাই করে বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে।

আরও একটা চমক লক্ষ করল রানা। গলানোর পর সোনা দিয়ে রড তৈরি করছে নিগ্রোরা, রডের গায়ে রুপালি রঙ মাখানো হচ্ছে।

কবীর চৌধুরীর কাছাকাছি মেঝেতে বসে রয়েছে দু'জন নিগ্রো, তাদের এক হাতে রত্নখচিত একটা করে দেবমূর্তি, অপর হাতে একটা করে ছুরি। ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মূর্তির চোখ আর গা থেকে দামী পাথর খুলছে তারা। দু'জনের মাঝখানে রয়েছে একটা ট্রে, পাথরগুলো জমা হচ্ছে তাতে। ট্রে-টা অর্ধেক ভরে গেছে এরইমধ্যে। এরকম মূর্তি আরও প্রায় বিশটার মত দেখল রানা, এখনও ওগুলোয় হাত লাগানো হয়নি।

'হ্যাঁ,' মিটিমিটি হাসল কবীর চৌধুরী, রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেবমূর্তিগুলো একবার দেখে নিল সে, 'আমাকে তুমি দুনিয়ার সেরা ধনীদের একজন বলতে পারো।' হঠাৎ পাশে দাঁড়ানো একজন নিগ্রোর দিকে ফিরল সে। 'ড্রাম থামাতে বলো, যেন মনে হচ্ছে মাসুদ রানা কিছু বলতে চায়।'

একজন নিগ্রো পকেট থেকে মিনি রেডিও বের করে নির্দেশ দিল, সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল ড্রামের আওয়াজ।

রানার চেহারা কঠিন হয়ে উঠল, কিন্তু হঠাৎ কিছু বলল না। চারদিকটা আরও একবার ভাল করে দেখে নিয়ে মুখ খুলল ও, 'এই তো চেয়েছিলে তুমি, অগাধ সম্পদ। তোমার সাথে অনেকবার কথা হয়েছে আমার। যতটুকু বুঝেছি, বিজ্ঞান-

সাধনার জন্যে প্রচুর টাকা দরকার ছিল তোমার, সেজন্যেই এ-পথে, মানে, চুরি-ডাকাতির পথে এসেছ। অভাব ঘুচেছে, তারমানে কি এবার তুমি বিজ্ঞান-সাধনার পথে ফিরে যাবে?'

মুহূর্তের জন্যে উদ্‌ভ্রান্ত দেখাল কবীর চৌধুরীকে। রানার মনে হলো, কি যেন একটা স্বীকার করতে গিয়েও অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিল পাগল বৈজ্ঞানিক। 'বিজ্ঞান-সাধনা—সে তো বন্ধ হয়ে নেই। আমার ল্যাবরেটরিগুলোয় দুনিয়ার সেরা বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন।'

'আর তুমি চুরি-ডাকাতি…?'

রানা আশা করেছিল বাঘের মত হুঙ্কার ছাড়বে কবীর চৌধুরী। কিন্তু আশ্চর্য, মৃদু একটু কাঁধ ঝাঁকাল শুধু, রানাকে বাধা দিয়ে বলল, 'পার্থক্যটা দৃষ্টিভঙ্গির। লুঠ করি আর ডাকাতি করি, সবই আমি মহৎ কাজে ব্যয় করছি।'

'মহৎ কাজ?' রানার কণ্ঠে ব্যঙ্গ।

'নয়?' পাল্টা প্রশ্ন করল কবীর চৌধুরী। 'উন্মাদ একটা ষাঁড় সবাইকে গুঁতো মারছে, এমন কেউ নেই যে সাহস করে তাকে বাধা দেয়।'

'ষাঁড়?' আশপাশে তাকাল রানা।

'ন্যাকামি কোরো না,' গম্ভীর গলায় বলল কবীর চৌধুরী, 'কার কথা বলছি তা তুমি ভাল করেই জানো। লিবিয়াকে দুর্বল পেয়ে কি করল এই ষাঁড়? এখন আবার সিরিয়াকে এক হাত দেখে নেবে বলে হুমকি দিচ্ছে। ব্যাপারটা কি? আসল কথা, ইসরায়েল যে তার জারজ সন্তান! তাকে গায়ে-গতরে বাড়তে দিতে হলে আশপাশের রাষ্ট্রগুলোকে মাথা তুলতে দেয়া চলবে না, সব সময় চাপের মধ্যে, হুমকির মধ্যে রাখতে হবে।'

'ও, তুমি তাহলে আজকাল রাজনীতি নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছ?'

'কেউ স্বীকার করুক বা না করুক, রাজনীতির সাথে প্রতিটি মানুষ জড়িত,' বলল কবীর চৌধুরী। 'রাজনীতিই প্রতিটি মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করছে।' হঠাৎ চোখ রাঙাল সে। 'তুমি আমাকে প্রসঙ্গ থেকে সরিয়ে দিচ্ছ। লিবিয়ার ওপর নির্লজ্জ হামলা চালাবার সময় অজুহাত দেখাল, লিবিয়া নাকি সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা চালাচ্ছে। বলি ষাঁড় মহাশয়, তোমার ইতিহাস কি বলে? ভিয়েৎনামে তুমি কি করেছ? ইসরায়েলকে দিয়ে এখনই বা তুমি কি করাচ্ছ? তোমার দুর্গন্ধময় লেজ, সি.আই.এ. সারা দুনিয়ায় কি করে বেড়াচ্ছে? এ-সব যদি টেরোরিজম না হয়…'

এক পা থেকে আরেক পায়ে দেহের ভার চাপাল রানা। 'বোঝা গেল, তুমি ষাঁড় দমনের ব্রত নিয়েছ। কিন্তু সাফল্যের আশা কতটুকু?'

'সফল হই বা ব্যর্থ হই, দুঃখিত,' শ্বাপদের মত ঠাণ্ডা চোখে রানার দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী, 'তা তোমার দেখার সুযোগ হবে না।'

কবীর চৌধুরীর দৃষ্টিতে এমন কিছু রয়েছে, কেন জানি ভয়ের একটা স্রোত বয়ে গেল রানার শিরদাঁড়ায়।

'তোমাদের আবার কি হলো?' নিজের লোকদের দিকে ফিরল কবীর চৌধুরী।

'কাজ বন্ধ রেখেছ কেন?' প্রতিটি নিগ্রো মাথা নিচু করে যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল রানা, রক্ত আর ঘামে ভিজছে।

টেবিলে একটা কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়ল কবীর চৌধুরী, কলম দিয়ে কি যেন লিখল তাতে।

নড়ে উঠল রানা, ওর কিডনির ওপর ড্যাগার চেপে ধরা হয়েছে।

কলম রেখে দিয়ে ধীরে ধীরে চেয়ার ছাড়ল কবীর চৌধুরী, টেবিলের কাছ থেকে সরে এল। 'লেখার কাজ যেন ঠিকমত হয়,' পাশে দাঁড়ানো একজন লোককে নির্দেশ দিল সে। লোকটা এগিয়ে এসে টেবিলের পাশে দাঁড়াল, তুলে নিল কলমটা।

'ওপরে আনো ওকে,' বলে সিঁড়ির দিকে এগোল কবীর চৌধুরী। ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করল সে।

পাঁজরের নিচে একটা খোঁচা খেলো রানা। ছেঁড়া রাবার স্যুট আর মাস্ক টপকে সিঁড়ির দিকে এগোল ও।

লোকগুলো কেউ কাজ থেকে মুখ তুলে তাকাল না। সিঁড়িতে চারজনের মাঝখানে থাকল রানা, দু'জন সামনে, দু'জন পিছনে। চারজনের কাছেই পিস্তল রয়েছে, প্রত্যেকের কোমরে একটা করে ড্যাগার।

না, চিন্তাটা বাতিল করে দিল রানা। এই মুহূর্তে কিছু করলে স্রেফ মারা পড়তে হবে।

আট

প্রায় খাড়া সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে উঠল ওরা। সিঁড়ির কাছে একটা দরজা গলে আরও চল্লিশ ফিট ওঠার পর চওড়া একটা পাথুরে ল্যান্ডিঙে এসে থামল। চারদিকে অনেকগুলো শূন্য খাঁচা দেখল রানা, মোহর আর পাথর ভরা রূপালি পাইপগুলো খাঁচার চারকোণে লাগানো হচ্ছে।

প্রহরীদের দু'জন সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল, বাকি দু'জন দাঁড়াল রানার দু'পাশে। ওর দিকে কোন খেয়াল নেই কবীর চৌধুরীর, নিজের লোকদের কাজকর্ম দেখছে সে।

নিচের গুহা থেকে মোহর ভরা কয়েকটা পাইপ নিয়ে উঠে এল দু'জন নিগ্রো। অন্য দু'জন লোক পাইপ ফিট করা কয়েকটা খাঁচা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে আরও ওপর দিকে উঠে গেল। সবাই ওরা যে-যার কাজে ব্যস্ত, অন্য কোন দিকে খেয়াল নেই।

একটু হাঁপাচ্ছিল কবীর চৌধুরী, ধীরে ধীরে তার নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল। বিশ্রাম নেয়া শেষ করে আবার সিঁড়ির দিকে এগোল। রানার কাঁধে মৃদু একটা ধাক্কা দিল একজন গার্ড।

নতুন আরেক প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে আরও বিশ ফিট উঠে এল ওরা, এখানে আরও একটা ল্যান্ডিং রয়েছে। নিচের ল্যান্ডিঙের চেয়ে আকারে ছোট এটা, দু'পাশে দুটো দরজা দেখা গেল। একটা দরজা মান্ধাতা আমলের, লোহার তৈরি, মরচে ধরে গেছে। কিন্তু পাঁচ সের ওজনের তালাটা নতুন, চকচক করছে। অপর দরজাটা কাঠের, বেশিদিনের পুরানো নয়। খোলা।

এখানে আবার থামল ওরা, ছোট পাথুরে প্ল্যাটফর্মে কবীর চৌধুরী আর রানা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। মুহূর্তের জন্যে একটা ঝুঁকি নেয়ার কথা ভাবল রানা। যেন ওর মনের কথা বুঝতে পেরেই গার্ড দু'জন ওকে ঠেলে দেয়ালের দিকে সরিয়ে আনল। চিন্তাটা বাতিল করে দিল রানা। জানে, ওর প্রথম দায়িত্ব নিজেকে রক্ষা করা, যতক্ষণ পারা যায় বেঁচে থাকা। ও-ই যদি মারা যায়, আল-আমিন থেকে শিরিনকে উদ্ধার করবে কে?

মনের ভেতর সারাক্ষণ টিক টিক ঘড়ির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে রানা। তামার তার খেয়ে ফেলছে টাইম-ফিউজের অ্যাসিড। এখনও অনেক দেরি আছে, কিন্তু ওকেও যদি ইয়টে তোলা হয়, সময় মত শিরিনকে নিয়ে পালাতে না পারলে কবীর চৌধুরীর সাথে বিস্ফোরিত হতে হবে ওদেরকেও।

প্ল্যাটফর্মের ওপর দিক থেকে হালকা ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগল চোখে-মুখে। গায়ের ঘাম শুকিয়ে যাচ্ছে। ডান হাতটা তুলে আহত বাঁ কাঁধে রাখল রানা, পাঁজরে গার্ডের ড্যাগার খোঁচা দিলেও গ্রাহ্য করল না। জমে শক্ত হয়ে গেছে রক্ত, কব্জি পর্যন্ত হাতটায় কোন সাড়া নেই। পিঠে, শিরদাঁড়ার দু'পাশে ব্যথাটা বাড়ছে।

কবীর চৌধুরী কথা বলল, 'বেশ ঠাণ্ডা বাতাস, তাই না? নাম জানো?' অর্থপূর্ণ হাসি দেখা গেল তার ঠোঁটে। 'আন্ডারটেকার'স উইন্ড!'

ডান কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকল রানা। কথা বলা মানেই শক্তি ক্ষয়।

লোহার দরজার দিকে ঘুরল কবীর চৌধুরী। পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুলল। তার পিছু পিছু গার্ডদের নিয়ে দরজা পেরোল রানা।

সরু, লম্বা একটা ঘর। দেয়ালের নিচের গা থেকে ঝুলছে আংটাসহ অনেকগুলো লোহার শিকল, প্রতি জোড়া শিকলের মাঝখানে এক গজ ব্যবধান। কবীর চৌধুরীর বন্দীশালা।

লম্বা ঘরের শেষ প্রান্তে, পাথুরে সিলিং থেকে ঝুলছে একটা কেরোসিন ল্যাম্প। মেঝেতে কম্বল ঢাকা, নিঃসাড় একটা দেহ দেখা গেল। দরজার কাছে, ওদের মাথার ওপর আরও একটা ল্যাম্প রয়েছে। ভাপসা একটা গন্ধ ঢুকল নাকে। মরচে ধরা লোহার শিকল, সন্দেহ নেই এখানেই ব্লাডি মরগ্যান তার বন্দীদের ওপর নির্যাতন চালাত। গুমোট ঘরের ভেতর মৃত্যুর গন্ধ।

কোমল সুরে নামটা উচ্চারণ করল কবীর চৌধুরী, 'শিরিন।'

রানার বুকের ভেতর লাফ দিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ড, নিজের অজান্তেই সামনে বাড়ল ও।

শক্ত দু'জোড়া বাহু পিছন থেকে ধরে ফেলল ওকে।

'শরীর ঢিল দাও, বাহাদুর,' ধমক লাগাল একজন গার্ড, রানার ডান হাতটা মুচড়ে ধরে শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে তুলে ফেলল সে।

ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখার আগেই পা চালাল রানা। একজন গার্ডের হাঁটুর নিচে লাগল লাথিটা, কিন্তু তার চেয়ে নিজেই বেশি ব্যথা পেল ও।

ওদের দিকে ফিরল কবীর চৌধুরী। তার হাতে ছোট্ট একটা পিস্তল, প্রকাণ্ড তালুর ভেতর প্রায় লুকিয়ে রয়েছে। 'যদি ইচ্ছে করো, রানা, অতিরিক্ত একটা নাভি পেতে পারো। আমার এই পিস্তলে মোট আটটা আছে।'

ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল রানা। ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে কবীর চৌধুরীর দিকে।

'পরোপকারী মানুষ,' মন্তব্য করল কবীর চৌধুরী। 'শরীরে বড় দয়া-মায়া। নাকি বয়স কম, সুন্দরী মেয়ে দেখে মাথাটা বিগড়ে গেছে?' গার্ডদের দিকে চোখ তুলল সে। 'ছেড়ে দাও ওকে।'

কবীর চৌধুরীকে পাশ কাটিয়ে হন হন করে এগোল রানা। নিজের পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে শিরিন, এগিয়ে আসছে রানার দিকে। রানার মুখ দেখতে পেয়ে ছুটতে শুরু করল সে, হাত দুটো সামনের দিকে বাড়ানো।

'রানা!' ফুঁপিয়ে উঠল শিরিন, 'রানা!'

রানার গায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে, দু'জনের হাত জড়িয়ে ধরল পরস্পরকে।

'রশি আনো,' গার্ডদের বলল কবীর চৌধুরী।

'সব ঠিক আছে, শিরিন,' মৃদু গলায় বলল রানা, জানে, কিছুই ঠিক নেই। 'আমি এসে গেছি, এখন আর তোমার চিন্তা নেই।'

কাঁপছে শিরিন, ফোঁপাচ্ছে। রানার বুক থেকে মুখ তুলে চোখের পানি মুছল সে। তার কপালে কাটা দাগ দেখল রানা, এলোমেলো হয়ে আছে নীলচে-কালো চুল। নোংরা একটা সালোয়ার আর কামিজ পরে রয়েছে সে, পায়ে স্যান্ডেল। রানার মনে হলো আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছে শিরিন। কবীর চৌধুরী বোধহয় না খাইয়ে রেখেছে ওকে।

'রানা, আমাকে বাঁচাও! আমাকে মেরে ফেলবে!' হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠে রানার বুকে আবার মুখ লুকাল শিরিন।

কাঁধে ব্যথা পেয়ে মুখ বিকৃত করল রানা, কাতর একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল গলা থেকে। ঝট্ করে ওর বুক থেকে মাথা তুলল শিরিন, রানার রক্তাক্ত কাঁধ দেখে শিউরে উঠল।

'রানা, একি অবস্থা...' আবার কেঁদে ফেলল সে, এতক্ষণে উপলব্ধি করল, দু'জনেই ওরা কত অসহায়। হিংস্র বাঘের খাঁচায় বন্দী দু'জনেই।

'ওদের বাঁধো,' মৃদু গলায় দরজার কাছ থেকে বলল কবীর চৌধুরী। 'এদিকে, আলোর নিচে টেনে নিয়ে এসো। ওদের সাথে আমার কথা আছে।'

একজন গার্ড এগিয়ে আসছে, পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘুরল রানা। এখনও কি

ঝুঁকিটা নেবে না সে? গার্ডের হাতে রশি ছাড়া আর কিছু নেই। পিস্তল হোলস্টারে, ড্যাগারটা বেল্টে। কিন্তু কবীর চৌধুরী একপাশে সরে দাঁড়িয়েছে, লক্ষ করছে রানাকে। তার হাতের পিস্তল মেঝের দিকে তাক করা। পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে দ্বিতীয় গার্ড, হাতে পিস্তল।

ঝুঁকিটা নেবে কিনা ঠিক করতে পারছে না রানা। একবার শুরু করলে থামার জো থাকবে না, হয় মারতে হবে ওদের, না হয় মরতে হবে নিজেদের।

'না, রানা,' নরম সুরে বলল কবীর চৌধুরী।

পাগল বিজ্ঞানীর দিকে তাকাল রানা। শিরিনের কথা ভাবল। ভাবল নিজের আহত হাতের কথা। অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ও।

এগিয়ে এল দশাসই গার্ড। পিছমোড়া করে রানার হাত দুটো বাঁধার সময় কোন বাধা পেল না সে। কব্জি জোড়া নেড়েচেড়ে রানা বুঝল, শক্ত গিট, কোনভাবেই একার চেষ্টায় খোলা সম্ভব নয়। হাত দুটো স্থির হয়ে গেল, নাড়লে ব্যথা করে।

শিরিনের চোখে চোখ রেখে হাসল রানা। একটা চোখ টিপে অভয় দিল। কিছু না, শুধু সাহস দেখাবার ভান করা। কিন্তু লক্ষ করল, ব্যাপারটাকে গোপন সঙ্কেত মনে করে উজ্জ্বল হয়ে উঠল শিরিনের ভেজা চেহারা।

ওদেরকে দরজার কাছে ফিরিয়ে আনল গার্ড।

'এবার ওটার সাথে,' হাত লম্বা করে দরজার সবচেয়ে কাছের শিকলটা দেখাল কবীর চৌধুরী।

হঠাৎ ল্যাং মেরে রানাকে ফেলে দিল গার্ড। মেঝেতে আহত কাঁধ দিয়ে পড়ল রানা। রশি ধরে টানতে টানতে ওকে শিকলের কাছে নিয়ে এল লোকটা। শিকলটা পরীক্ষা করল সে। আংটার ভেতর রানার কব্জি জোড়া ঢুকিয়ে, আংটার সাথে শক্ত করে বাঁধল রশিটা। পাথুরে দেয়ালের গায়ে একটা কার্নিসে ড্যাগারটা রেখেছিল, সেটা তুলে নিয়ে শিরিনের কাছে ফিরে গেল সে।

প্রাণহীন মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে শিরিন, চোখ বেয়ে নিঃশব্দে পানি ঝরছে।

মেঝেতে বসে আছে রানা, পা দুটো সোজা সামনের দিকে লম্বা করা, হাত দুটো পিঠের একটু ওপর দিকে শিকলের সাথে আটকানো। কাঁধের ক্ষত থেকে নতুন করে রক্ত ঝরছে। শুধু মনের জোর খাটিয়ে জ্ঞান হারানো থেকে বিরত রেখেছে নিজেকে।

একইভাবে শিরিনকেও বাঁধা হলো, রানার ঠিক উল্টো দিকে। দু'জনের মাঝখানে এক গজের মত ব্যবধান।

শিরিনকে বাঁধার কাজ শেষ হতেই হাতঘড়ি দেখল কবীর চৌধুরী।

'জানি না তোমাদের সম্পর্ক কতটা গভীর,' বলল সে, 'তবে তোমরা যে পরস্পরের প্রতি দুর্বল সেটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। প্রেম-ভালবাসার প্রতি আমার তেমন কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই, থাকলেও তোমাদের আমি পাশাপাশি রাখতাম না। তবে, হ্যাঁ, তোমরা যদি স্বামী-স্ত্রী হতে, শৃঙ্খলিত অবস্থায় হলেও,

তোমাদের আমি পাশাপাশি থাকতে দিতাম—শেষবারের জন্যে মিলিত হবার জন্যে।'

রানা আর শিরিন, দু'জনেই কবীর চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ কোন মন্তব্য করল না।

গার্ড দু'জনের দিকে ফিরল কবীর চৌধুরী। 'আউট।'

ঘুরে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল লোক দু'জন। দরজা বন্ধ করে ওদের দিকে ফিরল কবীর চৌধুরী। কবাটের গায়ে হেলান দিল।

চোখ নামিয়ে শিরিনের দিকে তাকাল রানা। শিরিন এখন আর কাঁদছে না। মনে হলো, নিয়তির বিধান মেনে নিয়েছে সে। নিষ্প্রভ, ভঙ্গুর, আর ঠাণ্ডা দেখাল তাকে।

নিঃশব্দে, অনেকক্ষণ ধরে ওদেরকে লক্ষ করল কবীর চৌধুরী। তারপর মুখ খুলল সে, 'মাসুদ রানা, এতক্ষণে নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পেরেছ, আজ সত্যিই তোমার প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হবে। জানতে ইচ্ছে করে, মৃত্যুর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কেমন লাগছে তোমার।'

'মৃত্যুকে আমার ভয় নেই,' বলল রানা। 'তবে দুঃখ এই, একটা উন্মাদের হাতে মরতে হচ্ছে।'

'আমি উন্মাদ?' পাথুরে কামরা গমগম করে উঠল। পরমুহূর্তে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল কবীর চৌধুরী। যেমন হঠাৎ শুরু হলো তেমনি হঠাৎ থামল সেই বীভৎস হাসি। 'ঠিক বলেছ, আমি উন্মাদই তো! আমি সেই দিন হব শান্ত, যেদিন উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না...!'

'তোমার মুখে কথাগুলো মানায় না,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'তুমি নিজেই তো উৎপীড়ক। হিসেব রাখো কত লোক তোমার হাতে মারা পড়েছে? চুরি করো, ডাকাতি করো, লুঠ করো, ব্ল্যাকমেইল করো, তারপরও নিজেকে তোমার মানবদরদী ভাবতে লজ্জা করে না?'

আশ্চর্য, হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল কবীর চৌধুরীর চেহারা।

বন্দীশালায় নিস্তব্ধতা জমাট বাঁধল। কবীর চৌধুরী যেন অনেক দূরে তাকিয়ে আছে, এই জগতেই নেই। তারপর ধীরে ধীরে মুখ তুলল সে, সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'কেউ আমাকে চিনল না। হ্যাঁ, আমি লুঠেরা, কোটি কোটি টাকা লুঠ করেছি। কিন্তু কোথায় সে টাকা? কয়েকটা ল্যাবরেটরি তৈরি করেছি, দুনিয়ার মেধাবী বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছে সেখানে—এ-সবের পিছনেই খরচ হয়ে যায় সব টাকা। পারতাম না? ইচ্ছে করলে কি পারতাম না। আরাম-আয়েশে গা ভাসিয়ে দিতে? কিন্তু কই, তা তো আমি করিনি। নিজের জন্যে তো কিছুই চাইনি আমি।

'মুখের ভালবাসায় আমি বিশ্বাস করি না। লোকে যাকে ভালবাসা বলে, ভাবাবেগে উথলে ওঠা, তার প্রতিও আমার কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই। মানুষকে সত্যি আমি ভালবাসি, কিন্তু আমার ভালবাসার প্রকাশ অন্য রকম, সাধারণ মানুষের মত নয়। সমগ্র মানবজাতির জন্যে আমি কিছু অবদান রেখে যেতে চাই, সভ্যতাকে

এমন কিছু দিয়ে যেতে চাই যাতে মানুষ আমাকে অনন্তকাল মনে রাখে। একজন, দু'জন বা দুশো পাঁচশো জন নয়, পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে ভালবাসি আমি। তাদের সবার মঙ্গল কামনা করি। আর সেজন্যেই, সমষ্টির স্বার্থে, ব্যষ্টির ক্ষতি করতে বাধ্য হই আমি। এটাই কি আমার অপরাধ? এটা কি সত্যিই কোন অপরাধ?'

'অপরাধ বৈকি, একশো বার অপরাধ,' বলল রানা। 'কারণ, বিজ্ঞান চর্চার নামে অকাতরে মানুষ খুন করছ তুমি। একটা প্রাণ তুমি সৃষ্টি করতে পারো না, অথচ কেড়ে নেয়ার সময় তোমার বুক কাঁপে না।'

'রানা, এই একই অভিযোগ কি আমি তোমার বিরুদ্ধেও করতে পারি না? মানুষ তো তুমিও কম মারোনি।'

'নিরীহ মানুষকে? নির্দোষ নিরপরাধ মানুষকে? একজনকেও না।'

'তর্কে তাহলে তুমি পারছ কোথায়?' জিজ্ঞেস করল কবীর চৌধুরী। 'আমি যাদের মেরেছি তারা কি কেউ ধোয়া তুলসী পাতা ছিল, প্রমাণ করতে পারবে? এক্সপেরিমেন্টের প্রয়োজনে যাদের মেরেছি, কারা তারা? সবাই ছিল এক একটা দুষ্ট ক্ষত, বেছে বেছে তাদেরই আমি ল্যাবরেটরিতে ধরে নিয়ে গেছি।'

'আমি আইনের লোক,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার অধিকার আমার আছে। আমার পেশাটাই এমন, শাস্তি দেয়ার অধিকার আমাকে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তুমি তো আমার পেশায় আসোনি। তুমি তো আইনের লোক নও। তোমাকে তো কাউকে শাস্তি দেয়ার অধিকার দেয়া হয়নি।'

হেসে উঠল কবীর চৌধুরী। 'কে কাকে অধিকার দেয়, রানা? গোটা সমাজটাই তো নষ্ট হয়ে গেছে, এখানে যারা বাস করে তারা সবাই তো অন্যায় করছে। কিছু নোংরা কৌশল আছে, সেগুলো ব্যবহার করে একদল লোক ক্ষমতা দখল করছে, বাকি সবাইকে শোষণ করছে তারা। এই যেখানে সমাজের চেহারা, সে সমাজ আমি মানব কেন? কেন মানব সরকারকে, কেন আইন মেনে চলব—যেখানে সরকারই বৈধ নয়, আইন নয় ন্যায্য? তোমাকে যারা অধিকার দেয় তাদের ক্ষমতার উৎসই বৈধ নয়, তাহলে তোমার অধিকার বৈধ হয় কি করে? উত্তর দাও।'

'সমাজ সম্পর্কে আমার নিজের ধারণা আমি তোমার কাছে ব্যাখ্যা করতে চাই না,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'তোমার কথা ধরেই তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করি, যদি বিশ্বাস করো সমাজ নষ্ট হয়ে গেছে, তাহলে সবার আগে নতুন একটা সমাজ গড়ার জন্যে কাজ করোনি কেন? বিজ্ঞান চর্চা বাদ দিয়ে একজন সংস্কারক হিসেবে কাজ করলেই তো পারতে!'

'আগের কাজ আগে,' কবীর চৌধুরী গম্ভীর সুরে বলল, 'আগে যুগান্তকারী কিছু আবিষ্কারের কাজ শেষ করি, তারপর এই ঘুণে ধরা সমাজটাকে ভেঙে ফেলে নতুন একটা সমাজ…'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'বিপথগামী লোককে দিয়ে কিছুই হয় না, যতই সে প্রতিভাবান হোক। তুমি যে কি ঘোড়ার ডিম আবিষ্কার করবে, জানা আছে।

টাকার পিছনে হন্যে হয়ে ছুটছ, বিজ্ঞান চর্চার সময় কোথায় তোমার!'

'মুখ সামলে কথা বলো!' হঠাৎ বাঘের মত গর্জে উঠল কবীর চৌধুরী। 'এত বড় স্পর্ধা, বলে কিনা ঘোড়ার ডিম আবিষ্কার করব! জানো, ওই মুখ আমি সেলাই করে দিতে পারি?'

ভয়ে ভয়ে রানার দিকে তাকাল শিরিন।

'তা পারো,' মৃদু হেসে বলল রানা, 'কিন্তু আমার কথার উত্তর দিতে পারো না। যদি বলি, তুমি এখন আর বিজ্ঞানী নও, স্রেফ একটা ডাকাত, কি জবাব দেবে তুমি?'

'তুমি একটা অর্বাচীন, ডেঁপো, বাচাল,' ঝেড়ে গাল দিল কবীর চৌধুরী। 'কবীর চৌধুরী তোমার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়। আর শোনো, এত কথা বলছি দেখে ভেবে বোসো না, তোমাদের শাস্তি মওকুফ বা হালকা হবে। তোমাদের যে দণ্ড দেব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তার আর রদ-বদল হবে না।'

'আমার অপরাধ?'

'আমার সব কাজে বাগড়া দাও, এটাই তোমার অপরাধ।' কবীর চৌধুরীর চেহারায় প্রশংসার ভাব ফুটে উঠল। 'সত্যি বটে, আমার পিছনে যারা লেগেছে তাদের মধ্যে তুমিই সেরা। আমার বহু সহকারী মারা পড়েছে তোমার হাতে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, তোমার পেশায় সত্যিই তুমি যোগ্য। এ-ও সত্যি, যোগ্যতার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। মুশকিল হলো দু'জনের পেশায় সংঘর্ষ বাধছে। আমার টাকা দরকার, কাজেই বেআইনী কাজ আমি করবই; আর তোমার দায়িত্ব তোমাকে পালন করতেই হবে, কাজেই আমাকে তুমি বাধা দিতে চাইবেই। সুতরাং দু'জনের বেঁচে থাকা চলে না। একজনকে বিদায় নিতে হবে।'

'কে বিদায় নেবে সেটাই হলো প্রশ্ন,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা।

মাথা নাড়ল কবীর চৌধুরী। 'না, ওটা এখন আর কোন প্রশ্ন নয়। প্রশ্নের উত্তর লেখা হয়ে গেছে। দুনিয়ার কোন শক্তি নেই আজ তোমার মৃত্যু ঠেকায়।'

'দুঃখিত,' মুচকি হেসে বলল রানা, 'তোমার সাথে আমি একমত হতে পারলাম না।' একটু থেমে আবার বলল ও, 'আমি যা জানি তুমি তা জানো না।'

কবীর চৌধুরীর প্রকাণ্ড কালো মুখে নিমেষের জন্যে চিন্তার রেখা ফুটল, কিন্তু তারপরই উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চেহারা। 'ও-সব কথার প্যাঁচে কোন লাভ হবে না, রানা। তোমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে।'

'এর মধ্যে শিরিনকে টানছ কেন? তার কি অপরাধ?'

এক কথায় জবাব দিল কবীর চৌধুরী, 'কেউ বেঈমানী করলে তাকে আমি ক্ষমা করি না।'

'ওর বাবা, প্রফেসর ফয়সল, তিনিও কি তোমার সাথে বেঈমানী করেছিলেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'সেজন্যেই কি ভদ্রলোককে মরতে হয়েছে?'

চমকে উঠল কবীর চৌধুরী। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল সে। 'প্রফেসর ফয়সল আমার সহকর্মী ছিল। সে কার-অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। তার মৃত্যু আমার

জন্যে একটা বিরাট আঘাত হয়ে দেখা দিয়েছিল...'

'তোমার অনেক অবনতি হয়েছে, কবীর চৌধুরী,' ঠাণ্ডা গলায় বলল রানা। 'কিভাবে মিথ্যে বলতে হয় তাও তুমি ভুলে গেছ। আমার কি ধারণা শুনবে? উদ্ভট কোন সায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেন্টে অংশ নিতে রাজি হননি প্রফেসর ফয়সল, তাঁর হয়তো বিবেকে বেধেছিল, তাই তাঁকে মরতে হয়েছে। তুমি চাও, একথা তোমার অন্যান্য সহকর্মী বিজ্ঞানীদের কাছে গোপন থাকুক। ঠিক কিনা?'

এ-প্রসঙ্গে আর কোন কথাই বলল না কবীর চৌধুরী। আবার একবার হাতঘড়ি দেখল সে। 'বাই দ্য ওয়ে, ঠিক হয়েছে, তোমাদের দু'জনকে একসাথে বিদায় দেয়া হবে। আর আড়াই ঘণ্টা পর। ছ'টায়—দু'এক মিনিট এদিক ওদিক হতে পারে।'

'এই আড়াই ঘণ্টা আমাদের একটু একা থাকতে দাও না? সময়টা আমরা গল্প করে কাটাই।'

'সেকি! কিভাবে মরবে তোমরা, জানতে ইচ্ছে করছে না?' বিস্মিত দেখাল পাগল বৈজ্ঞানিককে।

শিরিনের দিকে তাকিয়ে রানা বলল, 'না, আমরা জানতে চাই না।'

'কিন্তু আমার ধারণা শিরিন জানতে চায়,' শয়তানী হাসি দেখা গেল কবীর চৌধুরীর ঠোঁটে। 'স্যার হেনরি মরগ্যান, তাঁর আত্মা শান্তি পাক, এই পদ্ধতি ব্যবহার করতেন—আমারটা সেই একই পদ্ধতির উন্নত সংস্করণ। এর তুমি নাম দিতে পারো—কীলহলিং।'

শিরিনের দিকে তাকাচ্ছে না রানা, কিন্তু অনুভব করছে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে মেয়েটা ওর দিকেই তাকিয়ে আছে।

'আমার ইয়টে একটা প্যারাভন আছে,' বলল কবীর চৌধুরী। 'জিনিসটা কি তুমি জানো, কিন্তু শিরিন জানে না। ওটা টর্পেডো আকৃতির, পানির ওপর ভেসে থাকে, কেব্‌ল্‌-এর শেষ মাথায়। চলন্ত জাহাজের পিছু পিছু আসে ওটা। প্যারাভনের একাধিক ব্যবহার আছে। যুদ্ধের সময় ওটার সাথে কাটিং ডিভাইস লাগিয়ে দিলে পানির নিচে ডুবে থাকা মাইন তোলা যায়। মাছ ধরার জালের শেষ প্রান্তটাকে পানির ওপর ভাসিয়ে রাখার জন্যেও অনেক সময় ব্যবহার করা হয়। হাঙর বা বড় কোন মাছ টেনে আনার কাজ তো চলেই।

'আমার ইচ্ছে, এই প্যারাভন থেকে বেরিয়ে থাকা একটা লাইনের শেষ মাথায় বাঁধা থাকবে তোমরা, আল-আমিন তোমাদেরই খোলা সাগরে টেনে আনবে। সাগরে কি আছে তোমরা জানো। তোমাদের চারপাশে গিজগিজ করবে ওগুলো। দলবেঁধে গিলতে আসবে। খাবলা দিয়ে দিয়ে খাবে।'

থামল কবীর চৌধুরী, সকৌতুকে দু'জনের দিকে পালা করে তাকাল। আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেছে শিরিনের চোখ, এখনও রানার দিকে তাকিয়ে আছে সে। দ্রুত চিন্তা করছে রানা, কিন্তু চেহারা নির্লিপ্ত। অনুভব করল, কিছু একটা বলা দরকার।

'আমরা মরলে, তোমাকেও মরতে হবে,' বলল রানা। 'অনেক আগেই নির্ধারিত হয়ে আছে সেটা। বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছে।' কথা বলার

সময়ও দ্রুত কাজ করছে মাথা। জানে, কবীর চৌধুরীর মৃত্যুও এগিয়ে আসছে। কিন্তু মাইন বিস্ফোরিত হবার আগেই কি ওরা হাঙরের পেটে চলে যাবে? চিবুক থেকে ঘামের ধারাগুলো বুক বেয়ে নামছে। শিরিনের দিকে ফিরে হাসল ও। কিন্তু শিরিন যেন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে, কোন সাড়া দিল না।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল শিরিন, রানার বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। 'জানি না, আমি জানি না! এত কাছে অথচ কিছুই পরিষ্কার নয়!' ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ভবিষ্যৎ দেখার চেষ্টা করছে সে। 'হায় খোদা, এত মৃত্যু! জানি না কে মরবে কে বাঁচবে··· কিছুই পরিষ্কার নয়···।'

'শিরিন!' চড়া গলায় ধমকে উঠল রানা। ভয় পেয়ে গেছে ও। ভবিষ্যৎ দেখতে গিয়ে যদি মাইনটা দেখে ফেলে? যদি বেফাঁস কিছু বলে ফেলে? কবীর চৌধুরীর সন্দেহ হলে ইয়টের কীল পরীক্ষা করবে সে। 'শান্ত হও! চুপ করো!'

শিরিনের চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে এল। এইমাত্র কি ঘটে গেছে, কিছুই সে যেন জানে না, বোকার মত তাকিয়ে থাকল রানার দিকে।

'কি যেন বললে?' জিজ্ঞেস করল কবীর চৌধুরী। 'তোমাদের মারলে আমাকেও মরতে হবে? হাসালে দেখছি। না, রানা, এমন কিছুই তুমি করে আসোনি। করার কিছু থাকলে তো।' একটু থেমে আমার শুরু করল সে, 'পানিতে রক্ত না থাকলে হাঙর আর ব্যারাকুডারা হামলা করে না। তাই দ্বীপে থাকতেই প্যারাভনের পিছনে বাঁধা হবে তোমাদের। রীফের ওপর দিয়ে তোমাদের টেনে নিয়ে যাবে ওটা। রীফে ঘষা খেয়ে ছাল-চামড়া উঠবে, দু'একটা হাড়গোড় ভাঙতেও পারে, নাও ভাঙতে পারে। কিন্তু রক্ত যে ঝরবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। লক্ষ করেছ, অনেকক্ষণ হলো ড্রাম বাজছে না? আর বাজবেও না। তার কারণ, দ্বীপের চারপাশে রক্ত মেশানো আবর্জনা ফেলা বন্ধ হয়ে গেছে। রক্ত না থাকলে রীফের এপারে হাঙরও থাকবে না। হ্যাঁ, আমি চাই, তোমরা রীফের ওপারে চলে যাবার পর হাঙররা যেন তোমাদের খেতে শুরু করে।' হাত দুটো পিছনে নিয়ে গিয়ে দরজা খুলে ফেলল সে। 'আমি চাই, মানসিক কষ্ট পাও তোমরা, তাই এত কথা বললাম। ভেবে দেখো, এরচেয়ে নিখুঁত ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? কেউ তোমাদের লাশ, এমন কি, হাড়গোড়ও খুঁজে পাবে না। তোমাদের কপালে কি ঘটেছে পুলিস হয়তো তা আন্দাজ করে নেবে, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ করতে পারবে না তারা কিছুই। পুরো আড়াই ঘণ্টাও নেই আর। তোমার শেষ ইচ্ছে পূরণ হোক, রানা। শিরিনের সাথে সময়টা উপভোগ করো। দুঃখ এই যে তুমি ওকে বিয়ে করোনি, করলে আরও কিছু সুবিধে পেতে—পরস্পরের নাগালের মধ্যে থাকতে তোমরা। গুড নাইট।'

বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে লোহার দরজা বন্ধ করে দিল কবীর চৌধুরী।

নয়

ভোরের আলো ফোটেনি এমন সময় ওদেরকে নিতে এল গার্ডরা। আঙটা থেকে বের করা হলো হাত; কিন্তু পিছমোড়া করে বাঁধা থাকল। শেষ এক প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল ওরা।

চারদিকে গাছপালা, মাঝখানে দাঁড়িয়ে বুক ভরে ঠাণ্ডা বাতাস নিল রানা। ডালপালার ফাঁক দিয়ে পুব দিকে তাকাল ও, তারাগুলো ম্লান হয়ে আসছে, দিগন্তে ক্ষীণ আলোর আভা। রাতভর ডাকাডাকি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ঝিঁঝি পোকারা, চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম, মাঝে মধ্যে শুধু তাগাদার সুরে ডেকে উঠছে একটা কোকিল।

সাড়ে পাঁচটার মত বাজে, আন্দাজ করল রানা।

মিনিট কয়েক হলো এখানে দাঁড়িয়ে আছে ও, সুটকেস আর হোল্ডঅল নিয়ে দ্রুত পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে নিগ্রো লোকজন, ফিসফাস কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। গাছপালার ফাঁকে ঘরগুলোর দরজা খোলা, ওগুলো কেউ আর ব্যবহার করবে না। পাহাড়-প্রাচীরের মাথায়, কিনারা ঘেঁষে, দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকজন, রানা আর শিরিনের ডান দিকে। কিনারা থেকে সিঁড়ি বেয়ে এবার নামতে শুরু করল লোকগুলো। যারা গেল তারা আর ফিরল না। দ্বীপ থেকে শেষ বারের মত বিদায় নিচ্ছে ওরা।

শিরিনের কাঁধে নগ্ন কাঁধ ঘষল রানা, ওর আরও কাছে সরে এল শিরিন। বন্ধ সেল থেকে বেরিয়ে আসার পর ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে শীত করছে ওদের। থেকে থেকে কেঁপে উঠল শিরিন।

কি করতে হবে ওরা দু'জনেই তা জানে। ব্যাপারটা এখন প্রকৃতির সাথে জুয়া খেলার পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

কবীর চৌধুরী বন্দীশালা থেকে বিদায় নেয়ার পরপরই মাইনের কথা শিরিনকে জানিয়ে দিয়েছে রানা। ছ'টা বাজার কয়েক মিনিট পর বিস্ফোরিত হবে সেটা। কিন্তু কোন্টা আগে ঘটবে, কেউ বলতে পারে না। হয়তো রীফ পেরোবার আগেই বিস্ফোরিত হবে মাইন, কিংবা হাঙররা ওদেরকে খেয়ে ফেলার পর।

সবকিছু নির্ভর করছে সময়ের ওপর। সময়ই বলে দেবে কার ভাগ্যে কি আছে।

কবীর চৌধুরীর সময়-জ্ঞানের ওপর শ্রদ্ধা আছে রানার, ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ করে অভ্যস্ত সে। তারমানে ঠিক ছ'টায় নোঙর তুলবে আল-আমিন। তুলবে, কিন্তু কয়েকটা শর্ত আছে। আকাশে মেঘ থাকা চলবে না, আবহাওয়া অনুকূল থাকতে হবে। ভোরের আলো যথেষ্ট না হলে রীফ দেখা যাবে না।

এবং কোন কারণে যদি রওনা হবার সময় পিছিয়ে যায়, সর্বনাশ ঠেকানো যাবে

না। রানা আর শিরিন যদি ইয়টের পাশে জেটিতে থাকে, কবীর চৌধুরীর সাথে ওদেরকেও মরতে হবে।

ধরা যাক সময় মতই রওনা হলো আল-আমিন। অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যে ওদেরকে কতদূর টেনে নিয়ে যেতে পারবে ইয়ট? দ্বীপ থেকে সরে যাবার সময় ইয়টের পিছনে, পোর্ট সাইডে থাকবে প্যারাভন। ইয়ট আর প্যারাভনের মাঝখানে কেব্‌লটা, আন্দাজ করল রানা, পঞ্চাশ গজের মত হবে। প্যারাভনের পিছনের লাইনে বাঁধা থাকবে ওরা, ধরা যাক আরও বিশ গজ দূরে।

ইয়টের সরাসরি পিছনে থাকবে না প্যারাভন, তারমানে ইয়টটা প্যাসেজ থেকে বেরিয়ে যাবার পর পঞ্চাশ গজের মত পিছনে থেকে আউটার রীফ পেরোবে ওরা দু'জন। প্যাসেজ পেরোবার সময় আল-আমিনের স্পীড থাকবে, ধরা যাক, তিন নটের মত। তার বেশি স্পীড তুললে দুর্ঘটনার ভয় আছে। কিন্তু প্যাসেজ পেরোবার সাথে সাথে স্পীড বাড়িয়ে দেবে কবীর চৌধুরী—দশ কি বিশেও তুলতে পারে। প্রথম দিকে মন্থরগতি একটা বৃত্ত রচনা করে ওদের শরীর দ্বীপের কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাবে, লাইনের শেষ মাথায় মোচড় আর ঘুরপাক খাবে। ইয়ট প্যাসেজ পেরোবার সাথে সাথে দিক বদলাবে প্যারাভন, সোজা রীফের দিকে এগোবে, প্যাসেজের দিকে নয়। রীফ পেরিয়ে যাবে আল-আমিন, কিন্তু ওরা তখনও রীফের দিকে ছুটে চলছে। এরপর রীফ পেরোবে প্যারাভন, রীফ থেকে তখন ইয়ট চল্লিশ গজ এগিয়ে গেছে।

শিউরে উঠল রানা। চওড়ায় রীফটা দশ গজের মত, গায়ে ক্ষুরের মত ধারাল পাথুরে সুঁই গিজ গিজ করছে। ওদের সারা গায়ে চামড়া বলতে কিছু থাকবে না।

রীফ পেরোবার পর রক্তাক্ত জ্যান্ত টোপে পরিণত হবে ওরা। মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ছেঁকে ধরবে হাঙর আর ব্যারাকুডার দল।

আর কবীর চৌধুরী ইয়টের লেজের কাছে, একটা ডেক-চেয়ারে বসে রঙিন তামাশা দেখবে। নিশ্চয়ই বিনকিউলার থাকবে সাথে, ওদের শরীর যতই ছোট হয়ে আসবে ততই উল্লাস প্রকাশ করবে সে। তারপর, এক সময়, আর কিছু না পেয়ে, রক্তাক্ত লাইনে কামড় বসাবে হাঙররা। লাইন ছিঁড়ে যাবে। হাততালি দিয়ে উঠবে উন্মাদ লোকটা, চিৎকার করে বলবে, 'খেল খতম!'

কিন্তু ওরা পানিতে রয়েছে এই সময় যদি মাইন ফাটে? তখন যদি ইয়টের কাছ থেকে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে থাকে ওরা? শক-ওয়েভে কতটুকু ক্ষতি হবে ওদের? বলা যায় না, শক-ওয়েভের ধাক্কায় মারাও যেতে পারে। তবে, বেশিরভাগ ধাক্কা সামলাবে খোল। রীফও কিছুটা রক্ষা করবে ওদের।

রানা শুধু আন্দাজ আর আশা করতে পারে।

আসল কথা সম্ভাব্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে ওদের। লাইন যখন ওদেরকে টেনে নিয়ে যাবে, পানির চাপ যতই থাকুক, নিঃশ্বাস বন্ধ করা চলবে না। অনেক কিছু নির্ভর করছে ওদের দু'জনকে কিভাবে একসাথে বাঁধা হবে

তার ওপর। কবীর চৌধুরী চাইবে, ওরা যেন যত বেশিক্ষণ সম্ভব বেঁচে থাকে। মরা নয়, জ্যান্ত টোপ দরকার তার।

গোটা ব্যাপারটা দুঃস্বপ্নের মত লাগল। মুক্তির নানা পথ নিয়ে ভাবল রানা, কিন্তু আশার ক্ষীণ একটু আলোও চোখে পড়ল না। শুধু এটুকু জানে, শান্ত থাকতে হবে ওকে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করার জন্যে তৈরি রাখতে হবে মনকে। ক্ষীণ একটু সান্ত্বনা এইটুকুই যে শুধু ওরা নয়, কবীর চৌধুরী আর তার লোকেরাও বাঁচবে না কেউ। ওর আর শিরিনের তবু বেঁচে থাকার একটু আশা আছে, কিন্তু মাইন বিস্ফোরিত হলে শত্রুদের সে-টুকু আশাও নেই।

একটু একটু করে উজ্জ্বল হলো আকাশ। পাহাড়-প্রাচীরের নিচ থেকে জোড়া ডিজেল এঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে এল। সময় ঘনিয়ে আসছে।

সিঁড়ি বেয়ে পাতাল থেকে দ্বীপের ওপর উঠে এল কবীর চৌধুরী। তার হাতে একটা লেদার ব্রীফকেস। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দম নিল সে, চোখ বুলাল চারদিকে। গার্ড দু'জনের দিকে, বা রানা আর শিরিনের দিকে ভুলেও তাকাল না একবার। ওদের যেন কোন অস্তিত্বই নেই।

মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল সে। তারপর, হঠাৎ, ভারী গলায় বলে উঠল, 'ধন্যবাদ, স্যার হেনরি মরগ্যান। তোমার গুপ্তধন মহৎ কাজে ব্যয় করা হবে। তোমার কাছে একটাই আবেদন আমার, সুবাতাস দাও—ইয়ট নিয়ে আমরা যাতে নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারি।'

নিগ্রো গার্ড দু'জন বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল।

'আন্ডারটেকার'স উইন্ড, তাই না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

ওর দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। 'সবাই নেমেছে?' গার্ডদের জিজ্ঞেস করল সে।

'ইয়েস, স্যার, বস্,' উত্তর দিল একজন।

'ওদের নামাও,' নির্দেশ দিল কবীর চৌধুরী।

দ্বীপের কিনারায় এসে থামল ওরা। সামনে আর পিছনে একজন করে গার্ড নিয়ে নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে। সবার পিছনে থাকল কবীর চৌধুরী। গার্ডদের হাতে একটা করে পিস্তল।

জ্যান্ত এঞ্জিন নিয়ে অপেক্ষা করছে আল-আমিন। এঞ্জিন রূম থেকে বেরিয়ে এসে নীলচে একটু ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। ইয়টের পিছনে গাদা গাদা বুদ্বুদ দেখা গেল।

গাইড রোপ ধরে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে জেটিতে। ব্রিজে ক্যাপটেন আর নেভিগেটরকে দেখা গেল, তাদের সাথে আরও তিনজন লোক রয়েছে। ডেকে খালি জায়গা আর নেই বললেই চলে। বেশিরভাগটাই দখল করে রেখেছে সার সার সাজানো খাঁচাগুলো। শুধু পিছন দিকে একটা ফিশিং চেয়ার দেখা গেল।

ইয়টের কাছ থেকে কয়েক গজ দূরে টর্পেডো আকৃতির প্যারাভন রয়েছে। প্রায় ছ'ফিট লম্বা ওটা, ছোট ছোট ঢেউয়ের তালে দুলছে পানিতে। ইয়ট আর

প্যারাভনের মাঝখানে বেশ মোটা একটা কেব্‌ল, এক প্রান্ত রয়েছে ইয়টে, অপরটা প্যারাভনে। ইয়টের ডেকে কুণ্ডলী পাকানো শেষ প্রান্তটা দেখে একটু স্বস্তি অনুভব করল রানা। ওর আন্দাজই ঠিক, কেব্‌লটা পঞ্চাশ গজের কম নয়।

ইয়টকে ছাড়িয়ে আরও সামনে, দূরে তাকাল রানা। গাছপালা ঢাকা বিউ ডেজার্ট দেখা গেল। তবে বিউ ডেজার্ট থেকে দ্বীপের নিচের অংশ, ইয়ট, আর সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে বলে মনে হয় না। এদিকের ছায়া এখনও ঘন আর কালো। লংফেলো আর মাধু নিশ্চয়ই তাকিয়ে আছে এদিকে, ভাবল রানা। হয়তো নাইটগ্লাস নিয়ে এসেছে, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওদেরকে। কি ভাবছে ওরা?

জেটিতে উঠল কবীর চৌধুরী। দু'জনকে কিভাবে বাঁধা হয়েছে পরীক্ষা করে দেখল। 'মেয়েটার কাপড় খুলে নাও,' শিরিনের গার্ডকে নির্দেশ দিল সে।

নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল রানা। চোরা চোখে কবীর চৌধুরীর হাত ঘড়ির দিকে একবার তাকাল ও। ছ'টা বাজতে দশ মিনিট। মুখ বুজে থাকল রানা। কবীর চৌধুরীকে দেরি করিয়ে দেয়া চলবে না।

'কাপড়গুলো সব ইয়টে ছুঁড়ে দাও,' বলল কবীর চৌধুরী। 'রানার কাঁধে কাপড়ের পট্টি বাঁধো। পানিতে এখুনি আমি রক্ত চাই না।'

একটা ছুরি দিয়ে শিরিনের গা থেকে সমস্ত কাপড় কেটে নেয়া হলো। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় অসহায়, দিশেহারা দেখাল তাকে। ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মাথা নিচু হয়ে আছে, নীলচে কালো চুলে ঢাকা পড়েছে বুক। রানার দিকে ফিরল সে, নগ্নতা যাতে আর সবার চোখে না পড়ে। তারই সালোয়ার খানিকটা ছিঁড়ে রানার কাঁধে পট্টি বাঁধা হলো।

দাঁতে দাঁত চেপে আছে রানা, একবার শুধু হিসহিস করে উচ্চারণ করল, 'ইউ বাস্টার্ড!'

কবীর চৌধুরীর নির্দেশে ওদের হাতের বাঁধন খুলে দেয়া হলো। দু'জনের শরীর এক করা হলো, সামনাসামনি। তারপর দু'জনের কব্জি এক করে রশির শক্ত গিঁট দিয়ে বাঁধা হলো।

শিরিনের নরম বুক রানার বুকে সেঁটে আছে। ওর ডান কাঁধে চিবুক রেখে নিঃশব্দে কাঁদছে সে। রানার কানে ফিসফিস করে একবার বলল, 'আমি তোমার জন্যে কাঁদছি, রানা।'

'কথা দিয়েছি মরব না, তারপরও?' নিচু গলায় বলল রানা। পরমুহূর্তে শিরিনের কথা ভুলে গেল। এক, দুই করে সেকেন্ড গুনছে।

জেটির ওপর রশির একটা স্তূপ রয়েছে, একটা প্রান্ত প্যারাভনের সাথে বাঁধা। মুক্ত প্রান্তটা ওদের বগলের নিচে দিয়ে গলে বুক আর পিঠ পেঁচাল, তারপর দু'জনের গলার সামনে শক্ত গিঁটে পরিণত হলো। প্রতিটি কাজ এদের নিখুঁত। পালাবার কোন পথই খোলা রাখছে না।

সময়ের হিসেব রাখছে রানা। ছ'টা বাজতে আর পাঁচ মিনিট বাকি।

শেষ বারের মত ওদেরকে পরীক্ষা করল কবীর চৌধুরী। 'হ্যাঁ, ওদের পা খোলা

থাকা দরকার,' আপনমনে কথা বলল সে। 'পা নাড়া দেখেই তো আকৃষ্ট হবে হাঙররা।' জেটি থেকে ইয়টের ডেকে উঠে গেল সে। হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই ভেতর ভেতর চমকে উঠল রানা। এত নিশ্চিন্ত কেন কবীর চৌধুরী? মাইনটা কি খুলে নেয়া হয়েছে ইয়টের গা থেকে? রানার মিথ্যে আশার কথা ভেবে হাসছে মনে মনে?

গার্ড দু'জন উঠল। জেটির লোক দু'জনও গাইড লাইন নিয়ে উঠে যাচ্ছে। ইয়টের চারপাশে উথলে উঠল পানি, মন্থরবেগে সামনে বাড়ল আল-আমিন। দ্বীপের গা ছেড়ে ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে ওটা।

ফিশিং চেয়ারে আরাম করে বসেছে কবীর চৌধুরী। তার সকৌতুক দৃষ্টির গরম আঁচ লাগল রানার গায়ে। কিছুই বলল না লোকটা। কোন রকম অঙ্গভঙ্গিও করল না। শুধু একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল।

পানি কেটে রীফের দিকে এগিয়ে চলেছে আল-আমিন। রানা দেখল, প্যারাভনে বাঁধা কেবল্ ইয়টের ডেক থেকে সাপের মত এঁকেবেঁকে পানিতে নেমে আসছে। ইয়টের দিকে ধীর ভঙ্গিতে ঘুরে যাচ্ছে প্যারাভনের নাক। হঠাৎ করে নাকটা ডুব দিল পানিতে, সিধে হলো, তারপর দ্রুত গতিতে ছুটল।

ওদের পাশ থেকে লাফ দিয়ে জ্যান্ত হয়ে উঠল রশির স্তূপ।

'সাবধান!' শিরিনের উদ্দেশে চিৎকার করল রানা, বুকের সাথে আরও জোরে চেপে ধরল তাকে। 'দম নাও বড় করে।'

হ্যাঁচকা টানে মনে হলো কাঁধ থেকে ছিঁড়ে গেল হাত। জেটি থেকে এক টানে পানিতে পড়ল ওরা।

মুহূর্তের জন্যে পানির নিচে তলিয়ে গেল ওরা। তারপর মাথা তুলল পানির ওপর। দু'জনের এক করা শরীর পানি কেটে ছুটল।

ঢেউ আর পানির ছিটায় দম বন্ধ হয়ে এল রানার। শুনতে পেল দম নেয়ার জন্যে হাঁসফাঁস করছে শিরিন। 'নিঃশ্বাস ফেলো, নিঃশ্বাস ফেলো!' তাগাদা দিল রানা। 'আমার পায়ের ভেতর পা ঢুকিয়ে দাও।'

শুনতে পেল শিরিন, রানা অনুভব করল শিরিনের হাঁটু জোড়া ওর দুই উরুর মাঝখানে ঢুকে যাচ্ছে। ঝাঁকি খেতে লাগল শিরিন, অনবরত কাশছে। একটু পরই রানার কানের ওপর তার স্বাভাবিক, নিয়মিত নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। দু'জনের বুক পরস্পরের সাথে সেঁটে এক হয়ে আছে। রানার মনে হলো, ওদের গতি মন্থর হয়ে আসছে।

'একটু দম আটকে থাকো,' চেঁচিয়ে বলল রানা, 'কি ঘটছে দেখতে হবে আমাকে। রেডি?'

হাতের চাপ দিয়ে জবাব দিল শিরিন। রানা অনুভব করল, প্রচুর বাতাস টানায় শিরিনের বুক ফুলে উঠল।

শরীরের চাপ দিয়ে শিরিনকে ঘোরাল রানা, ফলে পানির ওপর মাথা তুলতে পারল ও।

প্রায় তিন নট স্পীডে এগোচ্ছে ওরা। ছোট ছোট বো-ওয়েভের ওপরে মাথা তুলল রানা। রীফের মাঝখানের প্যাসেজে ঢুকছে আল-আমিন. ওদের কাছ থেকে প্রায় আশি গজ সামনে রয়েছে ওটা। ইয়টের ডান দিকে রয়েছে প্যারাভন. ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। আর ত্রিশ গজ এগোলেই লাল টর্পেডো রীফের ওপরকার ভাঁজ ভাঁজ পানিতে পৌঁছে যাবে। প্যারাভন থেকে আরও প্রায় ত্রিশ ফিট পিছনে রয়েছে. ওরা।

রীফ আর ষাট গজ দূরে।

রানার শরীর মোচড় খেলো. ওপরে উঠে এল শিরিন. হাঁপাতে শুরু করল।

কিছুই ঘটল না. ধীরে ধীরে এখনও এগিয়ে-আসছে রীফ।

আরও পাঁচ গজ এগোল ওরা। দশ গজ। পনেরো গজ। বিশ গজ।

আর চল্লিশ গজ এগোলে শক্ত. ধারাল প্রবালের সাথে ধাক্কা খাবে ওরা।

আল-আমিন সম্ভবত প্যাসেজ পেরিয়ে গেছে। দম বন্ধ করল রানা। এখন নিশ্চয়ই ছ'টা বাজে। শালার মাইনের হলো কি! মরিয়া হয়ে এক সেকেন্ড প্রার্থনা করল রানা। মনে মনে বলল. 'বাঁচতে চাই! বাঁচতে চাই আমরা!'

হঠাৎ বগলের নিচে টান পড়ল রশিতে।

'নিঃশ্বাস ফেলো. শিরিন. নিঃশ্বাস ফেলো!' চিৎকার করল রানা. হিস হিস শব্দে তীব্রগতি পানি ওদেরকে পাশ কাটিয়ে পিছন দিকে ছুটছে। গতি মন্থর ছিল বলে পানির খানিকটা নিচে ছিল ওরা. কিন্তু এখন পানির ওপর দিয়ে প্রায় উড়ে চলেছে।

নিমেষের জন্যে একটু ঢিল পড়ল। রানা আন্দাজ করল. প্যারাভন বোধহয় কোন ডুবো-পাথর বা পানির ওপর মাথাচাড়া দিয়ে থাকা প্রবাল পিলারের সাথে ধাক্কা খেয়েছে। পরমুহূর্তে একটা ঝাঁকির সাথে আবার বেড়ে গেল গতি. পরস্পরকে মৃত্যু-আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে নিজেদেরকে ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিল ওরা।

রীফ আর ত্রিশ গজ দূরে। আর বিশ গজ। দশ গজ।

নিয়তির ওপর বিতৃষ্ণা আর আক্রোশে রানার সমগ্র অস্তিত্ব টান টান হয়ে উঠল। তীব্র, অসহনীয় ব্যথার জন্যে মনে মনে তৈরি করল ও নিজেকে। শিরিনকে নিজের ওপর তুলে আনল, যাতে সে যতটা সম্ভব কম ব্যথা পায়।

আচমকা হুস করে ফুসফুসের সমস্ত বাতাস বেরিয়ে এল, প্রচণ্ড এক ধাক্কায় শিরিনের সাথে বাড়ি খেলো ও। ধাক্কা খেয়ে পানি থেকে খানিকটা ওপরে উঠে পড়ল শিরিন. তারপর আবার পড়ল রানার ওপর। প্রায় একই সময়ে তীব্র আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল ম্লান আকাশ. বজ্রপাতের বিকট আওয়াজে তালা লেগে গেল কানে।

পানির ওপর স্থির হয়ে গেল ওরা, রানা অনুভব করল ঢিল হয়ে থাকা রশির টানে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে ও। অবশ শরীরের নিচে পা দুটো লম্বা হয়ে ঝুলে পড়ল. পানি ঢুকল খোলা মুখে। ডুবে যাচ্ছে ও।

গলায় পানি আটকে যাওয়ায় কাশতে লাগল রানা। এই কাশিই ওকে জ্ঞান

ডুবতে দিল না। পা দুটো বার কয়েক ছুঁড়ল ও, পানির ওপর উঠে এল মাথা। ওর ঘাড়ের সাথে বাঁধা শিরিনকে দশ মনি বোঝা বলে মনে হলো। ঘন ঘন মাথা নেড়ে সামনে থেকে পানি সরাবার চেষ্টা করল রানা, নিজের চারদিকে তাকাল। শিরিনের অচেতন মাথাটা পানির ওপর, নিজের কাঁধে ঠেকিয়ে রাখল।

সামনেই রানা পাঁচ ফিট দূরে রীফের ঘূর্ণিজল দেখতে পেল। রীফের জন্যেই এখনও বেঁচে আছে ওরা, তা না হলে শক-ওয়েভের ধাক্কায় দু'জনেই ভর্তা হয়ে যেত। রীফে ধাক্কা খেয়ে পানির নিচে পাল্টা স্রোত তৈরি হচ্ছে, পায়ের চারপাশে সেই টান অনুভব করল রানা। পিছন ফিরল ও, মরিয়া হয়ে চেষ্টা করল পাল্টা স্রোত ঠেলে রীফের দিকে এগোতে। প্রতিবার সুযোগ পেলেই বুক ভরে বাতাস টানল। দম আটকে ওঠা নামা করছে বুক, মনে হলো পাঁজরের খাঁচাটা যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হবে। লাল আবরণের ভেতর দিয়ে আকাশ দেখতে পেল ও। রশিটা নিচের দিকে টানছে ওকে, মুখের ভেতর ঢুকে গিয়ে দম বন্ধ করে মারার চেষ্টা করছে শিরিনের ভিজে চুল।

মনে হলো সামান্য এইটুকু দূরত্ব পেরিয়ে রীফে পৌঁছনো কোনদিন সম্ভব হবে না। বারবার তলিয়ে গেল রানা, বারবার পানির ওপর মাথা তুলল। রশি আর শিরিনের বোঝা ওকে সামনে এগোতে দিচ্ছে না। কিন্তু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, হাল ছাড়ল না রানা। কিভাবে এগোতে পারল বলতে পারবে না, হঠাৎ পায়ের নিচে প্রবালের কর্কশ স্পর্শ পেল ও। এলোপাতাড়ি পা ছুঁড়ে দাঁড়াবার একটা জায়গা খুঁজল, প্রতিটি নড়াচড়ার সাথে খানিকটা করে চামড়া হারাল পায়ের।

কোন ব্যথাই অনুভব করল না রানা।

তারপর শুধু পা নয়, ধারাল প্রবালে ঘষা খেয়ে পিঠ আর হাতের চামড়াও উঠতে শুরু করল। উঁচু-নিচু প্রবালের চারদিকে আনাড়ির মত ডিগবাজি খেলো রানা, বুকের ভেতর ফুসফুসে যেন আগুন ধরে গেছে। তারপর দাঁড়াবার মত খানিকটা জায়গা পেল ও, পায়ের ওপর শরীরের ভার চাপাতেই অনুভব করল, ঠিক যেন এক গাদা সুঁইয়ের ওপর দাঁড়িয়েছে।

সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল তীব্র ব্যথা, তবু শূলের বিছানা থেকে পা তুলল না রানা। নিজের জায়গায় অটল থাকার জন্যে স্রোতের গায়ে হেলান দিয়ে থাকল। স্পর্শ দিয়ে টের পেল, ওর ঠিক পিছনেই রয়েছে প্রবাল প্রাচীর। পাঁচিলে ঠেস দিয়ে হাঁপাতে লাগল ও। ওর চারপাশের পানি লাল হয়ে উঠেছে রক্তে। শিরিনের অসাড় শরীর নিজের পাঁজরের সাথে চেপে ধরে আছে ও।

সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরছে। চোখ বুজে হাঁপাচ্ছে আর কাশছে রানা। অনুভূতি, বোধ, সব ফিরে আসছে ধীরে ধীরে। প্রথম যে চিন্তাটা এল মাথায়, চারপাশের পানিতে রক্ত। তবে, বড় মাছ বোধহয় রীফের ভেতর উঠে আসবে না। আসলেই বা কি, এ-ব্যাপারে কিছুই করার নেই ওর।

তারপর রানা সাগরের দিকে তাকাল।

আর আদিলের কোন চিহ্ন নেই কোথাও।

আকাশের অনেক ওপরে ধোঁয়ার বিশাল একটা মেঘ দেখা গেল, সদ্য বইতে শুরু করা ডক্টর'স উইন্ডের সাথে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে।

চারদিকের পানিতে এটা-সেটা নানা জিনিস-পত্র ভাসছে, দু'একটা কালো মাথাও হাবুডুবু খাচ্ছে। সাগর জুড়ে, যতদূর দৃষ্টি গেল, খাঁচা দেখতে পেল রানা। সাপের ভয়ে আঁতকে উঠল ও। বিস্ফোরণের ফলে নিশ্চয়ই অনেক খাঁচা ভেঙে গেছে। নিজেকে অভয় দিল রানা, ওগুলোরও জান বাঁচানোর তাগিদ রয়েছে এখন, কোণঠাসা না হলে ছোবল দিতে আসবে না।

বাতাসে বারুদের তীব্র গন্ধ রয়েছে এখনও। ভাসমান আবর্জনার ভেতর মৃদু দুলছে লাল প্যারাভন। এক জায়গায় রয়েছে ওটা, ভেসে চলে যাচ্ছে না। কেব্লের একটা প্রান্ত সম্ভবত সাগরের তলায় গিয়ে ঠেকেছে। কাঁচ কাঁচ পানির গায়ে হাজার হাজার বুদ্বুদ দেখা যাচ্ছে।

মানুষের কালো মাথা যেখানে হাবুডুবু খাচ্ছে তার আশপাশে লম্বা আকৃতির কালো কয়েকটা রেখা দেখে রানা বুঝল, ওগুলো মরা সাপ। কালো মাথা আর সাপগুলোকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে কয়েকটা ত্রিভুজ আকৃতির ফিন। রানা তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওগুলোর সংখ্যা আরও বাড়ল। একবার দেখল, প্রকাণ্ড একটা ভোঁতা নাক মাথাচাড়া দিয়ে উঠল পানির ওপর, তারপর সবেগে কিসের ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। পানি কেটে ফিনগুলো এগোবার সময় ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল আবর্জনা। কালো দুটো হাত হঠাৎ করে খাড়া হলো আকাশের দিকে, পরমুহূর্তে খাড়াভাবেই দ্রুত নেমে গেল পানির নিচে। যন্ত্রণাকাতর চিৎকার কানে এল। দুই কি তিন জোড়া হাত অলসভঙ্গিতে আছাড় খাচ্ছে পানির ওপর, রীফের দিকে এগোবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে ওরা। ওদের একজন হঠাৎ স্থির হয়ে গেল, পরমুহূর্তে পানির ওপর ঘুসি মারতে শুরু করল। হঠাৎ দেখা গেল কনুই থেকে নিচের অংশটুকু তার অদৃশ্য হয়ে গেছে। লোকটার গলা থেকে ভোঁতা আর্তনাদ বেরিয়ে এল, ডিগবাজি খেতে শুরু করল সে। ঘোরের মধ্যে রানা ভাবল, ব্যারাকুডা খাবলা মারছে।

একটা মাথা এখনও ভেসে আছে পানিতে। ধীরে ধীরে কাছে চলে আসছে লোকটা। সরাসরি রানা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকেই আসছে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রানা। ওর বগলের তলায় ধাক্কা খেয়ে ভাঙছে ছোট ছোট ঢেউ। শিরিনের নীলচে-কালো ভিজে চুল ওর আহত কাঁধ ঢেকে ঝুলে পড়েছে পিঠ বেয়ে।

কামানো মাথাটা প্রকাণ্ড, চকচক করছে। চেহারা চেনার কোন উপায় নেই—থেঁতলানো, ক্ষত-বিক্ষত, চামড়া তোলা বীভৎস একটা মুখ।

চোখে আতঙ্ক নিয়ে ওটাকে এগিয়ে আসতে দেখল রানা।

বুক দিয়ে পানি ঠেলে, এলোপাতাড়ি পা ছুঁড়ে রানার দিকে এগিয়ে আসছে কবীর চৌধুরী। পানিতে অনেক লাশ, বড় মাছগুলো সে-সব নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু দু'একটা কি নেই আশপাশে, যারা লাশের ভাগ পায়নি এখনও?

রানা ভাবল, ও কি পৌঁছতে পারবে রীফে? চোখ দুটো সরু হয়ে উঠল ওর। কে জানে নিষ্ঠুর সাগর কি সিদ্ধান্ত নেবে।

রক্তাক্ত মুখ আরও কাছে চলে এল। হাঁ করে আছে কবীর চৌধুরী, খোলা মুখের ভেতর লাল টাকরা, জিভ, গলার ভেতর পিছনের দেয়াল সব দেখা যাচ্ছে। কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসা চোখ দুটো রক্তে প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। জ্যান্ত একটা টোপ। কোন মাছ গিলে ফেলার আগেই কি হাল ছেড়ে দেবে কবীর চৌধুরী?

নগ্ন বিশাল কাঁধ। বিস্ফোরণের ফলে বিবস্ত্র হয়ে পড়েছে। কিন্তু কালো সিল্ক টাইটা গলায় আটকে রয়েছে এখনও, শেষ প্রান্তটা কাঁধের পিছনে টিকির মত দেখাল।

পানির একটা ঝাপটা রক্ত ধুয়ে দিল চোখ থেকে। বিস্ফারিত হয়ে আছে ওগুলো, উন্মত্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। দৃষ্টিতে সাহায্যের আবেদন নেই, পরিশ্রমে বিধ্বস্তপ্রায় একজন লোকের শুধুই নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকা।

আর বোধহয় পারল না কবীর চৌধুরী। খোলা মুখ থেকে রক্ত আর পানি বেরিয়ে এল, আঁ আঁ করে আওয়াজ করল সে। রানার কাছ থেকে এখনও দশ গজ দূরে। হাত দুটো বাড়িয়ে সামনেটা হাতড়াল সে, যেন খড়কুটো যা পায় তাই ধরার চেষ্টা করছে। তারপরই ডুবে গেল।

আবার মাথা তুলল সে। তার মাথার চারপাশে লাল হয়ে উঠল পানি। ছয় ফুট চওড়া এক জোড়া ছায়া পিছিয়ে গেল লাল পানির ভেতর থেকে, পরমুহূর্তে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল। পানির নিচে শরীরটা ঝাঁকি খেলো, সরে গেল একপাশে। কবীর চৌধুরীর বাঁ হাতের অর্ধেকটা পানির ওপর উঠল, আঙুল থেকে কনুই পর্যন্ত নেই।

তবু বেঁচে আছে সে, এবং সম্পূর্ণ সচেতন। তার নিঃশ্বাসের আওয়াজ পেল রানা। আশ্চর্য! কামড়ে ছিঁড়ে নিয়ে গেল হাতটা, অথচ কোন চিৎকার নেই!

এরপর ঘন ঘন ঝাঁকি খেতে লাগল কবীর চৌধুরী। একটা ব্যারাকুডা তাকে পেয়ে বসেছে। ব্যথায়, আতঙ্কে, বেঁচে থাকার আকুতিতে বিকৃত হয়ে উঠল তার চেহারা। কিন্তু তবু মুখ ফুটে বা ইঙ্গিতে রানার সাহায্য চাইল না সে।

রানার পিছন থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল। সেদিকে মন দিল না রানা। ওর সমস্ত মনোযোগ স্থির হয়ে আছে সামনের বিভীষিকার ওপর।

পানি ফুঁড়ে উঠে এল একটা ফিন, স্থির হয়ে গেল।

পাঁয়তারা অনুভব করল রানা, লাফ দেয়ার আগে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে বাঘ যেভাবে তৈরি হয়, হাঙরটাও সেভাবে তৈরি হলো। হাঙর বেশিদূর দেখতে পায় না, লাল পানি ভেদ করে শিকারকে ভাল করে দেখে নিতে সময় লাগছে। অকস্মাৎ কবীর চৌধুরীর বুক লক্ষ্য করে লাফ দিল সেটা। তাকে নিয়ে পানির নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পানির ওপর লাল বুদ্বুদ উঠল।

বারবার পানির ওপর দেখা গেল লেপার্ড শার্কের ফিন। ঢোক গেলার জন্যে

পিছায় ওটা, তারপর আবার হামলা চালায়।

পানির ওপর আবার ভেসে উঠল মাথাটা। মুখ বন্ধ করে আছে কবীর চৌধুরী। এখনও রানার দিকে ফিরে আছে সে।

হঠাৎ রানা চমকে উঠে দেখল, রীফে প্রায় পৌছে গেছে মাথাটা। হাঙর আর ব্যারাকুডা ঢোক গিলে পেটে মাংস চালান করতে ব্যস্ত, এই ফাঁকে স্রোতের টানে রীফের ওপর উঠে এসেছে কবীর চৌধুরী। প্রবালের ওপর পা রেখে দাঁড়াল সে, পানি থেকে এক হাত জেগে থাকা শরীর টলছে। বুকে মাংস বলে কিছু নেই, সার সার সাদা হাড় দেখা গেল।

ব্যাপারটা ভৌতিক লাগল রানার কাছে। কবীর চৌধুরীর নাক নেই, একটা চোখ নেই, বাঁ হাতের বাকি অর্ধেকটাও অদৃশ্য হয়েছে। তবু বেঁচে থাকে কি করে! শুধু বেঁচে নেই, ধারাল প্রবালের ওপর পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসছে সে।

শিরিনকে নিজের শরীরের সাথে আরও জোরে চেপে ধরল রানা, এক পা পিছাল।

এবার বোধহয় কবীর চৌধুরীর পায়ে কোথাও কামড় দিল হাঙরটা। একটা ঝাঁকির সাথে পানির নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। তাকিয়ে থাকল রানা, নিজের অজান্তেই আশা করছে আবার মাথাটা ভেসে উঠবে।

কিন্তু না।

গুঙিয়ে উঠল শিরিন। সংবিৎ ফিরে পেয়ে নড়ে উঠল রানা।

পিছন থেকে আবার শোনা গেল চিৎকার। বে-র দিকে ফিরল রানা।

মাধু। ঘন ঘন বৈঠা চালিয়ে ছোট একটা নৌকো নিয়ে আসছে সে। আরও পিছনে সার সার অনেকগুলো নৌকো দেখা গেল, শার্ক বে-র জেলেরা সবাই তাদের নৌকো নিয়ে রওনা হয়ে গেছে।

হঠাৎ রানার মনে পড়ল, খাঁচাগুলো উদ্ধার করতে হবে। মাধুকে নির্দেশ দিলে জেলেদের সাহায্য নিয়ে সে-ই করতে পারবে কাজটা।

শিরিনের দিকে তাকাল। চোখ বুজে রয়েছে সে, কিন্তু নিয়মিত নিঃশ্বাস ফেলছে। ঝুঁকে তার ভেজা গালে আলতোভাবে চুমো খেলো। কৃতজ্ঞ বোধ করছে রানা—বেঁচে আছে বলে।

দশ

পান্না বসানো ঝুলন্ত হারের মত এক জোড়া হামিং-বার্ড, পাম গাছের ঝাঁকড়া মাথার ওপর দিনের শেষ চক্কর দিয়ে বাড়ি ফিরছে। ঘন ঝোপের নিবিড় ছায়ার ভেতর সান্ধ্যকালীন গান শুরু করেছে নিঃসঙ্গ এক হরবোলা, নাইটিঙ্গেলের চেয়েও মিষ্টি তার গলা।

লনের সবুজ বাহামা ঘাসের ওপর দিয়ে এবড়োখেবড়ো কিনারা সহ একটা

[illegible] পাখির ছায়া উড়ে গেল, উপকূলের বহু দূর কোথাও নিজ বাসভূমে [illegible] রয়েছে তার, গা ভাসিয়ে দিয়েছে টানা বাতাসে। ইস্পাত-নীল এক [illegible] বাগানে বসা লোকটাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, তারপর হঠাৎ দিক বদলে [illegible] দিয়ে খুদে দ্বীপটার দিকে ছুটল। রূপ ঝলমলে একটা প্রজাপতি মনের [illegible] ফুল-বাগিচায় নেচে বেড়াচ্ছে।

[illegible] পানি একেবারে শান্ত। দিগন্তরেখা ছুঁই ছুঁই করছে সূর্য, সারপ্রাইজ [illegible] শেষ মুহূর্তের রোদে গাঢ় লাল দেখাচ্ছে।

বাতাসে সাঁঝের গন্ধ, আর শীত শীত একটা ভাব। কিচেন থেকে সুগন্ধি [illegible] ভেসে আসছে। ডানদিকে দূরে জেলেদের ঘর-বাড়ি, ছাদ থেকে [illegible] উঠছে সাদাটে ধোঁয়া।

একটা চেয়ার নিয়ে বাগানে বসে আছে রানা, বিষণ্ণ আর একা। সূর্যাস্ত [illegible] নিমগ্ন করে দেয় কেন জানি।

কবীর চৌধুরী অনেক দিনের পুরানো শত্রু, বহু মানুষের বহু ক্ষতি করেছে, রানাকেও কম ভোগায়নি, কিন্তু তবু তার মৃত্যুতে উল্লসিত হতে পারেনি ও। আজকের এই সাফল্য ঠিক যেন সাফল্য নয়, রানার মনে হলো, একে এক ধরনের [illegible] বলা যায়।

কবীর চৌধুরী দুর্লভ প্রতিভা ছিল একটা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার [illegible] মূল্যায়ন করার স্পর্ধা রানা রাখে না। কিন্তু এটুকু উপলব্ধি করে, কোন [illegible] যখন বিপথগামী হয় তখন একা শুধু তাকে দায়ী করা চলে না, তাকে বিপথে [illegible] জন্যে সমাজেরও একটা ভূমিকা থাকে।

রানা যেন সমাজেরই একজন। এই সমাজ আজ বাসযোগ্য নয়, সেজন্যে আর [illegible] সে-ও তো খানিকটা দায়ী।

তাছাড়া, যোগ্য শত্রুর প্রতি একটা অদ্ভুত ধরনের ভালবাসা জন্মে যায়।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

বাড়ির বারান্দায় দেখা গেল শিরিনকে। খালি পায়ে সবুজ লনে নামল সে, এগিয়ে আসছে রানার দিকে। তার হাতে একটা ট্রে, তাতে ককটেল শেকার আর দুটো গ্লাস। গত পনেরো দিনে রানার নাড়ি-নক্ষত্র জেনে নিয়েছে মেয়েটা; নিজের [illegible] ক্ষমতার বলে কি করে যেন টের পেয়ে যায় কিসে রানা খুশি হয়, কিসে না।

ঢাকা থেকে বিশ দিনের ছুটি মঞ্জুর করে মেসেজ এসেছিল কবীর চৌধুরীর ইয়ট [illegible] ধ্বংস হওয়ার পরদিনই। পনেরো দিন পেরিয়ে গেছে ছুটির। কেমন [illegible] লাগছে। জীবনের ভাল সময়গুলো বড় সংক্ষিপ্ত।

ট্রে-টা টেবিলে নামিয়ে রেখে রানার চেয়ারের হাতলে বসল শিরিন। অনেকক্ষণ চুপচাপ দেখল ওরা সূর্যাস্ত। লাল হয়ে উঠল পশ্চিমের আকাশ, তারপর [illegible] মলিন হতে শুরু করল। ধীরে ধীরে কালচে হয়ে এল সাগরের জল। [illegible] খানিক পর আবছা হয়ে গেল সারপ্রাইজ দ্বীপ। একটা দুটো করে জ্বলে

উঠছে আকাশে হীরে চুনি পান্না।

রানার চুলে প্রবেশ করল শিরিনের একটা হাত। শিরিনের গায়ে কেমন যেন মৌ মৌ সুবাস।

রানার বাহু জড়িয়ে ধরল ওর ক্ষীণ কটি।

সৈকতে সাগরের উচ্ছ্বাস।

● ● ●

মাসুদ রানা

মরণ কামড়

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

সোনার মোহরে ছেয়ে গেছে বাজার।
কোত্থেকে আসছে কেউ বলতে পারে না।
কেসটা হাতে নিতেই একের পর এক
দুর্ঘটনার শিকার হতে লাগল
রানা এজেন্সির লোকজন।
ঠিক সময়টিতে ধূমকেতুর মত উদয় হলো
মাসুদ রানা।

মৌমাছির চাকে ঢিল পড়ল।
ওকে নিয়ে নির্দয় কৌতুক শুরু করে দিল
মিস্টার ওয়াইজ।
বিষাক্ত সাপ নিয়ে কিছু একটা চলছে
সেন্ট পিটার্সবার্গে।
কী সেটা?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০